সাধক কমলাকান্ত

চিত্র সূচী

সূচী

উৎসর্গ

ভূমিকা

(পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ লিখিত)

অকারাদি বর্ণানুক্রমে পদাবলীর সূচী

অ

পৃষ্ঠা

আ

ই

উ

ও

ক

গ

চ

জ

ত

দ

ন

প

ফ

ভ

ম

সাধক কমলাকান্ত



অনারেবল নাদয়াধিপতি

মহারাজা

শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষৌণিশচন্দ্র রায় বাহাদুর

উৎসর্গ

নদীয়া রাজবংশের সনাতন ধর্ম্মভাব ও সাহিত্যানুরাগ যাঁহার
উদার ও কোমল হৃদয়ে বিকসিত
যিনি
বঙ্গভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টির প্রধান নায়ক
নদীয়াধিপতি মহারাজেন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর
ও
শক্তিসাধক
রাজা গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের কৃতী বংশধর
সেই
বিদ্যোৎসাহী আশ্রিতবৎসল
মাতৃভক্ত মধুর চরিত্র
উদারধী
অনারেবল
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র
রায় বাহাদুর মহোদয়কে
'সাধক কমলাকান্ত'
শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উৎসর্গ করিলাম ।

নিবেদন

মা-জগদম্বার আশীর্ব্বাদে 'সাধক কমলাকান্ত' গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। বাংলাদেশে 'কমলাকান্ত' বলিলে বর্ত্তমানে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তকেই' বুঝায়,—তাই জনসাধারণের বুঝিতে ভুল না হয়, এই কারণে বাংলার সাধক শিরোমণি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নামের গোড়ায় 'সাধক' বাক্যটী ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

'রামপ্রসাদ' গ্রন্থের অনুসন্ধানের কাজ শেষ করিয়া আমি 'সাধক কমলাকান্ত' লিখিতে আরম্ভ করি; সে আজ দশ বৎসরের কথা। জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ জন্য আমি বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই,—এই ক্ষেত্রে মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি, চান্নার শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামী এবং রাধানগরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা আমাকে বিশেষ সাহায্য করেন। যতদূর সম্ভব আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি,—তবে বড় দুঃখ এই যে বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে ১২৬৪ সালে প্রকাশিত কমলাকান্ত রচিত মূল 'শ্যামাসঙ্গীত' গ্রন্থখানা আজ পর্য্যন্তও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। নকল বা নকলের নকল পাইয়াছি বটে, কিন্তু মূলগ্রন্থে পদাবলীগুলি কিভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা নিজ চক্ষে দেখিবার সুযোগ আর পাইলাম না। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে বর্দ্ধমানাধিপতির খাশ গ্রন্থাগারে একখানা মুদ্রিত গ্রন্থ যে আছে সে সংবাদ পাইয়াছি। বর্দ্ধমান শহর বা জেলার অন্য কোন স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা জমিদারের গৃহে বইখানা থাকিবার সম্ভাবনা। আমি মা-জগদম্বার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছি,—যদি আমি উহা দেখিবার অধিকারী হই তাহা হইলে একদিন মা-জগদম্বা আমার এই বাসনা পূর্ণ করিবেন,—এ বিশ্বাস আমার আছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, 'রামপ্রসাদ' ও 'সাধক কমলাকান্ত' গ্রন্থের অভিনব সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল কি না? আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই হইয়াছিল। প্রসাদ ও কমলাকান্ত বাংলার সিদ্ধভক্ত,—উভয়েই মা-জগদম্বার প্রিয় সন্তান। ইঁহাদের পদাবলীর অপরাপর বহুবিধ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না;—কিন্তু শাক্ত কবিদের জীবনীর উপকরণ ও প্রাচীন পদাবলীর উদ্ধারের জন্য যেরূপ উদ্‌যোগ বা আয়োজন আবশ্যক, এই ক্ষেত্রে তাহার কোনরূপ লক্ষণ বা পরিচয় পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং প্রসাদ ও কমলাকান্তের পদাবলী এবং তাঁহাদের

জীবনীর অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে লোপ হইতেছিল। যে মহারত্নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাংলাদেশে উদিত হইয়া, কতশত তাপদগ্ধের হৃদয় জ্বালা জুড়াইয়া আসিয়াছে, সেই মহারত্ন যে ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া অবশেষে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইবে, একথা মনে করিতে প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠে। এই সকল কারণে মা-জগদম্বার চরণধূলি মস্তকে লইয়া আমি সিদ্ধভক্তদের পদাবলী ও জীবনীর উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই,—এই পুণ্যকাজে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ভক্তগণই বলিতে পারেন। এ কর্ম্ম আমার নহে, যাঁহার কর্ম্ম তিনিই করিয়াছেন, তবে আর ইহার জন্য ভাবনা কি? ইচ্ছাময়ী জগজ্জননী মহামায়ার ইচ্ছা হইয়াছে, ভক্তমণ্ডলীর মনোভিলাষ পূর্ণ হউক। ইহার উপর আমার মত ক্ষুদ্র জীবের আর কোন কথাই বলিবার নাই। আমার কার্য্য উদ্‌যাপনের মূলমন্ত্র শ্রীশ্রীগীতার সেই মহাবাণী—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

যে সাধক কমলাকান্তের পবিত্র নামের জয়ঘোষণা করিয়া আমি এই পুণ্য কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আর যে শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালীর অপার করুণা প্রভাবে বিবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এতদিনের পর কার্য্য সমাপনে সমর্থ হইলাম, কার্য্যাবসানেও আজ সেই মহাশক্তিরূপিণী মহাকালীর পরমভক্ত 'কালীর বেটা' কমলাকান্তের নামের জয় ঘোষণা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম।

* * * * * *

এই গ্রন্থ প্রকাশের মূলে ছিল স্বর্গীয় ভক্ত কালীপ্রসন্ন নাথ। ছাপার কাজ কালী ভায়াই আরম্ভ করিয়া যায়,—দশ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইবার পর ৺কালীপ্রসন্ন অকালে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানিকে সাজাইবার ভার সে লইয়াছিল,—গভীর পরিতাপের বিষয় যে সে একমাটিয়া মাত্র গড়িয়া যায়,—বাকী কাজ তাহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ নাথের উপর ন্যস্ত হয়। অম্বিকা বাবু বিশেষ যত্ন সহকারে ছাপার কাজটী শেষ করিয়া দিয়াছেন,—এজন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

অগ্রজপ্রতিম পূজ্যপাদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (Superintending Engineer, North Bihar Circle) মহোদয় এই পুণ্যকাজে নানাদিক্ দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন,—যখনই উপদেশ ও অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তিনি আমাকে হাসিমুখে সাহায্য করিয়াছেন। সরল বিশ্বাস ও মা-জগদম্বার চরণে

অচলা ভক্তি তাঁহার কর্ম্মময় জীবনকে উজ্জ্বল ও মধুর করিয়া রাখিয়াছে। মা-দক্ষিণার শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার অমলা নির্ম্মলা অহৈতুকী ভক্তি স্থিরা হউক, এই আমার প্রার্থনা। কল্পতরু মা-জগদম্বা অবশ্যই আমার এই প্রাণের সাধ পূর্ণ করিবেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেড়তলা নিবাসী শক্তিসাধক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে আমি নিজে কখনও দেখি নাই। আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যগোপাল রায় মহাশয়ের পত্রে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের ঠিকানা মাত্র পাই। তিনি আমার 'সাধক কমলাকান্ত' গ্রন্থের মুদ্রিত ফাইলখানা পড়িয়া এবং আমার পরিচয় শুনিয়া ভূমিকাটী লিখিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমি তাঁহার চরণে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় মায়ের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করুন,—এই আমার প্রার্থনা। বর্দ্ধমান জেলার সুকবি শ্রীমান্ কালিদাস রায় বি-এ মহাশয় 'কমলাকান্তের প্রতি' কবিতাটী এই গ্রন্থের জন্য রচনা করেন। এই সুযোগে তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

সাধক কমলাকান্ত গান রচনা করিতেন মায়ের পূজার জন্য। ফুল চন্দন নৈবেদ্যের মত পদাবলীই ছিল তাঁহার মাতৃপূজার প্রধান উপকরণ। ভাবাবেসে তিনি যখন মা-জগদম্বার রাঙ্গা চরণতলে বসিয়া গাহিতেন,—তখন শাক্তকবির ভক্তিশতদলে ত্রিনয়নীর মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিত। নির্জ্জনে বসিয়া আপন মনে এই গান গাহিলে কমলাকান্তের ভাবের মূর্ত্তি ঠিক্ ঠিক্ বুঝা যায়। প্রাণে না অনুভব করিয়া কেবলমাত্র রাগরাগিণীর জমাট্ করিতে গেলে কমলাকান্তের গান মাটী। এই সকল গান কল্পনাকে অলৌকিকভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া এমন এক ভাব-রাজ্যে লইয়া যায় যাহা বীভৎস ও ভীষণকে সুন্দর করিয়া দেখায় এবং সমগ্র সংসারের প্রতিবিম্ব কবিত্ব মণ্ডিত হইয়া ভৈরব, মহান্ ও সুন্দরকে এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলে। সাধকের এই অনুপম পদাবলীর দেবতা হইলেন মুক্তকেশী স্মিতাননা দক্ষিণাকালী,—হিন্দুর যুগযুগান্তরের সাধনা মাকে এমনই ধ্যানের মূর্ত্তি দিয়াছে যে ইনি একাধারে 'করালবদনাং ঘোরাং' হইয়াও 'অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধ্বপাণিকাং',—ভয় ও বরাভয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বাংলার প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। এই মূর্ত্তি না হইলে বাঙ্গালীর চলে না,—বাঙ্গালী জানে মায়ের ঐ রাঙ্গা চরণপদ্মে তাঁহার প্রাণবায়ু সুপ্রতিষ্ঠিত।

কোটালহাটের ধূলি শাক্তের বড় গৌরবের,—আসুন আমরা এই ধূলি মস্তকে ছোঁয়াইয়া উত্তরীয়াগ্রে বাঁধিয়া রাখি। কমলাকান্তের লীলাস্থল এই কোটালহাটকে শত শত নমস্কার।

হে বাংলার তরুণ যুবক, শক্তি সাধকদের সাধনার ভিতর দিয়া তোমাদের জীবনের পথ দেখিয়া লও। তাঁহাদের নিকট অনুপ্রাণনা চাও, শক্তি চাও, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে তোমাদের অসাড় ও জড়তাপূর্ণ জীবনে কর্ম্মের শক্তি ফিরিয়া আসুক,—নিরাশার সময় আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া তাঁহাদের নিকট করজোড়ে সে দীপ না নিবিয়া যায় এই বর প্রার্থনা কর। আর ধ্যানযোগে ভাবিয়া দেখিবে সেই মহান্ তত্ত্ব,—যে তত্ত্বের সাধনায় সাধক কমলাকান্ত পাগল হইয়া গাহিয়াছিলেন,—

‘কমলাকান্তের কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি অন্ত মধ্য নাই, সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥’

এই কালীতত্ত্ব তোমাদের সাধনা হউক, এই তত্ত্বসাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া তোমরা বাংলার মুখোজ্জ্বল কর। অলমিতি।

গ্রাম দেবভোগ, বিদ্যাবিনোদ-কুটীর, পোঃ মুন্সীগঞ্জ, জেলা ঢাকা। ১০ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৩১ সাল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সাধক কমলাকান্ত



শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ

Harinath Press. Dacca.

ভূমিকা

"আমি" ও "আমার" এই যে অনাদি-সিদ্ধ প্রতীতি ও লোক-ব্যবহার, ইহা পরমার্থতত্ত্ব-পরায়ণের পক্ষে যতই হেয় হউক, সংসারীদিগের পক্ষে একান্ত উপাদেয় ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সৃষ্টিকর্ত্তার এই সুবিশাল সৃষ্টি উক্তরূপ প্রতীতি ও তদনুগত ব্যবহারের ফলেই বোধ হয় পরম সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে স্বরাজ্য, স্বাধিকার, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ, এ সকলই উহার পরিণত অমৃত ফল বলিয়া বিবেচনা করি। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" মহাকবির এই মহতী উক্তি এই জন্যই শ্রুতি-সূক্তের ন্যায় আমাদিগের শিরোধার্য্য। সহৃদয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল দেশাত্মবোধের মাহাত্ম্য-মর্য্যাদায় স্ফীত-বক্ষে "আমার দেশ" "আমার জন্ম-ভূমি" বলিয়া দেশ-মাতৃকার ও তাঁহার ক্রোড়স্থ উজ্জ্বল রত্নগুলির যে গৌরবময় স্তুতি-গাথা গান করিয়া গিয়াছেন, এই জন্যই তাহা সমগ্র দেশ-বাসীর এত প্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

দেশ-মাতৃকা ও তাঁহার উজ্জ্বল অপত্যরত্নগুলি, এই উভয়ের প্রতি মমত্ব সম্বন্ধে অভেদভাবে যদিও আমাদের তুল্য আদর-যত্ন, তুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তি, তুল্য আগ্রহ-আকিঞ্চন, তথাপি রক্তমাংসের প্রত্যক্ষসম্বন্ধে ও আসন্নতর উত্তরাধিকারিতাসূত্রে ঐ রত্নাদির প্রতিই যেন যত্নাদির ঘনিষ্ঠতা আমাদের অনুভব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। অপিচ, ঐ সকল সুকৃতী পুরুষ-রত্ন যতকাল ব্যাপিয়াই চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর হউন, তাঁহাদের ভাব, ভাষা, হৃদ্‌বৃত্তি, সংস্কার-ধারা ও কর্ম্ম-পরম্পরা অক্ষয় প্রস্রবণের ন্যায় আমাদিগের মধ্য দিয়া আজিও সমভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে। ইহাও তো নিত্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

এই সকল কারণে তাঁহাদিগের কৃতি ও কীর্ত্তি কালের করাল গহ্বর হইতে রক্ষা করিতে, কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যতার হিসাবে, জাতীয় জীবনের সংস্কার ও জাতীয় সাহিত্যের সংপ্রসারকল্পে আমরা অবশ্যবাধ্য।

বহুকষ্টসাধ্য এই লুপ্তরত্নোদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়া যাঁহারা কৃতকার্য্য হয়েন, তাঁহারা আমাদের কতই কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমি উপস্থিত “সাধক কমলাকান্ত” গ্রন্থের লেখক শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রকেই লক্ষ্য করিয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। শ্রীমান্ রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় এই সঙ্গীত-সংগ্রহের দিকে দীর্ঘকাল স্থিরলক্ষ্য রাখিয়াছিল। অবসর পাইলেই শ্রীমান্ কমলাকান্তের সাধনাস্থান প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও তাঁহার জীবনী এবং সঙ্গীত-সঙ্কলনে প্রাণপণ করিয়া ক্রমে দীর্ঘ ১০ বৎসরে যথাসাধ্য আপন অভীষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছে।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চন্দ্ বাহাদুরের অসাধারণ গুণগ্রাহিতার ফলেই সাধক কমলাকান্তের পদাবলী সংগৃহীত ও প্রথম মুদ্রিত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এজন্য বঙ্গবাসীমাত্রেই উক্ত স্বর্গীয় মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার অবধি নাই বলিয়া উক্ত সংগ্রহের তৎকালীন সুপ্রচারসত্ত্বেও এখন আমরা তাহার উপরও এই বলিয়া দুরাকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া থাকি যে, উক্ত পদাবলী সংগ্রহকালে মহারাজবাহাদুর সাধক-প্রবরের আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবন-চরিত সংগ্রহে চেষ্টা করিলে, কি অপ্রাপ্ত আরও অধিক পদ পাইবার জন্য ইতস্ততঃ প্রয়াস স্বীকার করিলে, না জানি তিনি আরও কতই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন এবং আমরাও সাধকেন্দ্রের প্রকৃত ও পর্য্যাপ্ত জীবন-চরিত প্রাপ্ত হইয়া কতই লাভবান্ হইতে পারিতাম। বর্ত্তমানে শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের ন্যায় উদ্‌যোগী পুরুষ যাহার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও চেষ্টানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি আমরা

শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের বর্ত্তমান চেষ্টার ফলে এইজন্য এত লাভ ও এত তৃপ্তি মনে করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত বর্দ্ধমান-রাজবাটীর প্রথম-সংগৃহীত ও মুদ্রিত পদাবলী, যাহা সুদীর্ঘকালে দৃষ্টির অগোচর, এমন কি কালগ্রাসেই গত হইয়াছিল, আজি আমরা হারা-নিধির ন্যায় সেইগুলি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। অধিকন্তু সেই আকারেই প্রাপ্ত হই নাই, তাহা অপেক্ষা পরিস্কৃত, পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উত্তরোত্তর আরও গৌরবিত আকারে প্রাপ্ত হইব বলিয়া আশান্বিত হইতেছি।

আমাদের যৌবনাবস্থায় আমরা দেখিয়াছি, ৺শারদীয়া মহাপূজার বিজয়ার সময় রাঢ় অঞ্চল হইতে একটী প্রবীণ লোক আসিয়া আমাদিগের বাটীতে কমলাকান্তের কারুণ্য ও মাধুর্য্যময় হৃদয়দ্রাবী বিজয়াসঙ্গীত শুনাইয়া যাইতেন। অন্য সময়েও ২।৩ টী ওস্তাদ কমলাকান্ত ও অন্য সাধকদিগের কতকগুলি ভক্তিভাবপূর্ণ সুমধুর পদ গাহিয়া বার্ষিক লইয়া যাইতেন। বহুকাল হইতে তাঁহাদিগের বা তদনুগামী গায়কদিগের গতায়াত নাই। বর্ত্তমানে সে প্রথা লুপ্তই হইয়াছে। অধুনা যে গায়ক কমলাকান্তের পদ খুব জানেন, তিনিও উহা ৪।৫ টীর অধিক জানেন না। বর্ত্তমানে উক্ত পদাবলীর অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। রাজবাটীর প্রথম সংস্করণ হইতে ক্রমে সঙ্ক্ষিপ্ত, অতি সঙ্ক্ষিপ্ত সংস্করণ আরম্ভ হইয়া শেষে কতকগুলি পুস্তক-বিক্রয় ব্যবসায়ীর পুস্তক, যাহাতে কমলাকান্তের ঐরূপ স্বল্পতর পদ, রামপ্রসাদ, দেওয়ান মহাশয়, মহারাজ রামকৃষ্ণ, মহারাজ শিবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির ফুল-তোলাগোচ ২।৪টী করিয়া সঙ্গীত সহ একত্র মুদ্রিত হইয়া মহাজন-পদাবলী বলিয়া বাজারে পরিচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইদানীং তাহাই দেখিতে পাইতেছিলাম। সেইস্থলে আজি অতুলচন্দ্রের কল্যাণে কমলাকান্তের জীবনবৃত্তান্ত সহ তাঁহার সমগ্র পদাবলী, পদাবলীর সুন্দর সমালোচনা, নূতন সংগৃহীত কতকগুলি পদ ও

সাধকেন্দ্রের এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত "সাধক-রঞ্জন" নামক যোগ-পদাবলী উৎকৃষ্ট মুদ্রণে উৎকৃষ্ট বেশে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা যে কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছি, সহৃদয় পাঠক এই গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র ইতঃপূর্ব্বে ছেলেদের চণ্ডী, সর্ব্বানন্দ, শাক্যসিংহ, ভগীরথ, অরুন্ধতী, নচিকেতা, গয়া-কাহিনী, রামপ্রসাদ প্রভৃতি বহু পুস্তক লিখিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছে। তাহার গ্রন্থরাশির মধ্যে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত তাহার বঙ্গসাহিত্য-সংসারে সুমহৎ দান। উক্ত উভয়ের মধ্যেও এই কমলাকান্ত তাহার অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। কারণ ঐ গ্রন্থমধ্যে সাধকেন্দ্র কমলাকান্ত-রচিত 'সাধকরঞ্জন' নামে অপূর্ব্ব যোগপ্রবন্ধ এই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় কমলাকান্তের ললিত পদাবলী রচনার প্রবীণতাসহ জগন্মাতার কামিনীভাব কল্পনার কমনীয়তা যে বিবৃত হইয়াছে, কবিত্ব-হিসাবে সমালোচকের চক্ষে তাহা সবিশেষ প্রশংসাস্পদ হইবে, বিবেচনা করি।

আমি বলিয়াছি ঐ যোগ-পদাবলী সহৃদয় সমালোচকের চক্ষে সবিশেষ রমণীয় বলিয়া বোধ হইবে, পরন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধনাপন্থীর পক্ষে উহা ততোঽধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশেষতঃ যাঁহারা তন্ত্রমার্গাবলম্বী সাধক, এই যোগপ্রক্রিয়াই তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ সোপান। এই যোগপ্রক্রিয়া বা তাহার প্রধান অঙ্গ ভূতশুদ্ধি দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও পরব্রহ্মে তাঁহার সম্মিলনই উক্ত সাধকদিগের পরমার্থ। এই কুণ্ডলিনী পরমা শক্তি, পরমা প্রকৃতি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডভূত এই জীব-দেহেও উক্ত পরমা শক্তির অধিষ্ঠান আছে। নহিলে জড়-জগতের ন্যায় এই সুবিশাল জীব-জগৎ এমন সুশৃঙ্খলায় চলিবে কেন ?

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইহাই তো শ্রুতি-বাক্য। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। মহাদেব উক্ত শ্রুতি-সূত্রেরই ভাষ্যরূপে তন্ত্রের বিস্তার করিয়াছেন। করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সুবৃহৎ বহির্ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব-দেহেও সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ, চন্দ্র-সূর্য্য, নদ-নদী, সমুদ্র-সুমেরু, সুরাসুরবর্গের সন্নিবেশ ও স্বয়ং বিশ্বপ্রসূতি পরমাশক্তি কুণ্ডলিনীর তাহাতে অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় এই স্থূলদেহেও তাঁহার সবিশেষ অভিব্যক্তি নাই। পূর্ব্বে যে ভূতশুদ্ধির কথা বলিয়াছি, তাহাও জীবের শরীরারম্ভক স্থূল পঞ্চভূতের শুদ্ধি নহে। স্থূলের অভ্যন্তরে অপঞ্চীকৃত পঞ্চতত্ত্বাদিঘটিত যে সূক্ষ্মদেহ আছে, ভূতশুদ্ধিতে তাহারই শোধন বুঝিতে হইবে। এবং সেইরূপ সেই শোধিত সূক্ষ্ম-শরীরেই পরমাশক্তি বা কুলকুণ্ডলিনীর সুস্পষ্ট আবির্ভাব ও অধিষ্ঠান অনুভব করিতে হইবে। এই নিমিত্তই ভূতশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। সুনির্ম্মল স্ফাটিকাদিভাজন ভিন্ন যত্র তত্র কি তেজোরাশির প্রতিভাস হয়? আরও যোগ-গম্য উক্ত বিশুদ্ধ আধারের অনুভব করিতে না পারিলে ঐ আধারের অধিষ্ঠাত্রীকে কিরূপে জ্ঞান-গম্য করা যাইতে পারে? তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া অহংবুদ্ধিবিচলিত জীব, তাঁহাকে ভুলিয়া, এ সংসারে একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। ত্রিতাপ-সন্তপ্ত জীব যখন অহংবুদ্ধি ভ্রমাত্মক জানিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র কর্ত্রী বুঝিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইবে, জানিতে হইবে যে তখনি সে যোগ-পথের পথিক হইয়াছে। ক্রমে ধ্যান, ধারণা, সমাধিবলে সে জানিতে পারিবে, এই পরমা প্রকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি ও পরমপুরুষ পরমাত্মা বা পরমশিব, ইঁহারাই সর্ব্বস্ব, ইঁহারা আর ভিন্ন-আকারে বা ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত নহেন। তখন জীব অনুভব করিবে, তাঁহারা অন্যত্র কোথাও নাই, আমিও তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন নহি, তাঁহারা আমারই আত্মস্থ, অথবা আমারই

পরমাত্মা।* ফলতঃ জীবের অজ্ঞানই কুণ্ডলিনীর নিদ্রা, জীবের জ্ঞান-উন্মেষই তাঁহার জাগরণ। প্রাক্তন কর্ম্মফলে ও ঐহিক অভ্যাস-বলে জ্ঞান-যোগ পরিপক হইলে জীব উক্ত শিব-শক্তির সম্মিলন বা একাত্মতা অনুভব করে ও তৎকালে সাংসারিক সুখ-দুঃখ-বেদনা বিস্মৃত হইয়া অতুল আনন্দ-ধারায় নিমগ্ন হয় এবং পরমকাম্য চরম কৃতার্থতা লাভ করে।

এই যোগ-প্রক্রিয়া বা ষট্‌চক্রভেদ মহাত্মা পূর্ণানন্দ পরমহংস তাঁহার শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি নামক তন্ত্র-নিবন্ধের ষষ্ঠ উল্লাসে সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। ঐ উল্লাসের শেষভাগে সহস্রার-পদ্মে শিব-শক্তির সামরস্য-বশে আনন্দময় অমৃতধারাক্ষরণ বর্ণন করিয়া তিনি ঐ স্থানের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দ-রসিকা
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলং॥

শৈবগণ এই সহস্রদল-কমলকে শিবস্থান, বৈষ্ণবগণ ইহাকে পুরুষোত্তমের স্থান, অদ্বৈতবাদিগণ ইহাকে হরিহর-স্থান বলেন। অপিচ দেবীপাদপদ্ম-মধুপেরা ইহাকে দেবীর পরমপদ ও অপর মুনীন্দ্রগণ ইহাকে সুপবিত্র প্রকৃতি-পুরুষের আস্পদ বলিয়া থাকেন।

আমাদের সাধকেন্দ্র কমলাকান্ত তাঁহার 'সাধকরঞ্জন' প্রবন্ধে ঐ সকল স্থান কবিত্ব ও কল্পনাযোগে যেরূপ রমণীয়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উক্ত যোগপদাবলী যে সাধকসম্প্রদায়ের পরমপ্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

---

* যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মত্বেনৈব ভাবনা। (গৌতমীয়তন্ত্রে)। অর্থা আপন ইষ্টদেবতাকে আপন আত্মা স্বরূপে চিন্তা করার নামই যোগ

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাধকগণ সগুণব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। সম্মিলিত বা অব্যক্ত মাতাপিতৃভাব অভিব্যক্ত হইলে তাহাই ব্রহ্মের সগুণাবস্থা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। জগন্মাতাই পরমাশক্তি বা পরমা প্রকৃতি এবং জগৎপিতাই পরমশিব বা পরমপুরুষ। উভয়ে নিত্যসম্বন্ধে বা অবিনাভাব সম্বন্ধে সম্বন্ধ।* সে মূর্ত্তি "চণকাকৃতি-রূপিণী" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চণক চানা বা ছোলা দেখিতে একটী-মাত্র বীজ, কিন্তু তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখ, ভিতরে দুইটী দল আছে। কিন্তু

মায়াবল্কল মুৎসৃজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী।
শিব-শক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা। (নির্ব্বাণতন্ত্র)।

মায়ারূপ বল্কল পরিত্যাগ করিয়া, যখন বিশ্ব-বিস্তারে উন্মুখী হয়েন, তখন শিবশক্তিরূপে দ্বিধা ভেদ হয়।

এই বিশাল সৃষ্টি-পালনাদি ব্যাপারে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তার প্রয়োজন, তাহা কোথা হইতে হয়?

আদ্যাশক্তির্মহাকালী দেবনির্ম্মাণকারিণী।
জলদেতড়িদুৎপন্না লীয়তে জলদে যথা।
একাংশেনভবেদ্ব্রহ্মা একাংশেন জনার্দ্দনঃ।

* তন্ত্রে পরমব্রহ্মের উক্ত ভাবই উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর একত্বেও তিনি শিব-শক্তিযুক্ত। কুলার্ণবোক্ত পরমব্রহ্মের ধ্যান ও পরমব্রহ্ম মন্ত্র এস্থলে দ্রষ্টব্য। পূজ্য-পূজক ভাব লইয়া পরমব্রহ্মের অর্চ্চনা, উপাসনাদি করিতে হইলে উক্তরূপ ধ্যান-মন্ত্রাদিই সুসঙ্গত। কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশে প্রাচীন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে বা কোন তন্ত্রনিবন্ধে মহানির্ব্বাণোক্ত, বেদান্তানুগত "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম"—প্রভৃতি পরমব্রহ্ম মন্ত্র কখনও প্রচলিত ছিল না। সম্প্রদায়ানুগামী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু সুধীগণ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারেন।

একাংশেন ভবেচ্ছম্ভুঃ কালিকায়াঃ সুলোচনে। (নিরুত্তরতন্ত্র)
আদ্যাশক্তি মহাকালী হইতেই উক্ত সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা দেবত্রয়ের আবির্ভাব হয়। কিন্তু যেমন জলদে তড়িৎপুঞ্জ প্রকট হইয়া আবার জলদেই প্রলীন হয়, তেমনি তাঁহারাও সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রলয়কালে তাঁহাতেই তিরোভূত হইয়া থাকেন।

কিন্তু পরমব্রহ্মের যখন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তখন তাঁহাতে কি আনন্দের অভাব আছে যে তাহার নিমিত্ত বিশ্ব-বিস্তারের এ মহাব্যাপারে তাঁহার প্রয়োজন হয়? ইহার উত্তর, তাঁহাতে যে অব্যক্তভাবে মাতাপিতৃভাব সমবেত আছে, কালবশে ও জীবের অদৃষ্টবশে তন্মধ্যে মাতৃ-শক্তির প্রবলতা উপস্থিত হয়। সেই বিশ্বমাতা বিশ্বের প্রসূতি, একবার নহে, অনন্তবার; উৎপৎস্যমান জীব-জগতে তাঁহার অপার করুণা, সেই অবিচ্ছিন্ন করুণা-ধারাই তাঁহার সৃষ্টির প্রতি প্রধান কারণ। "একোঽহং বহুঃ স্যাম্" এক আমি অনন্ত হই, এই যে সঙ্কল্প, ইহাই তাঁহার করুণা। এইজন্য মাতৃ-শক্তিরই প্রাধান্য। নির্ব্বাণতন্ত্রে—"মায়া-বল্কলমুৎসৃজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী" অর্থাৎ মায়ারূপ বল্কল পরিত্যাগ করিয়া যখন বিশ্ব-বিস্তারে উন্মুখী হয়েন, এইবাক্যে "উন্মুখী" এইস্থলে মহাদেব তাঁহার স্ত্রীত্বনির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর উন্মুখত্ব এখানে উৎসুকত্ব। নিরুত্তরতন্ত্রেও—"আদ্যাশক্তির্মহাকালী দেবনির্ম্মাণকারিণী" এই স্থলে আদ্যাশক্তিরই কর্ত্তৃত্ব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই পরমাশক্তিরই প্রাধান্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ আনন্দ-লহরী স্তোত্রের প্রথম শ্লোকেই সুব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
নচেদেবং দেবো নখলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি। ইত্যাদি।

অর্থাৎ শিব শক্তিযুক্ত হইলেই বিশ্বব্যাপারে প্রভুত্ব করিতে পারেন,

শক্তিশূন্য হইলে শবরূপে বা শুদ্ধকূটস্থচৈতন্যরূপে তিনি স্পন্দিত হইতেও সমর্থ নহেন। এইজন্য সেই মহাশক্তি হরি-হর-বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও আরাধনীয়া।

এই পরমাপ্রকৃতি মহাশক্তি সাঙ্খ্যোক্ত জড়াপ্রকৃতি নহেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্যে ইঁহারই লীলা সবিস্তার প্রকটিত হইয়াছে। ইনিই তথায় "মহাবিদ্যা মহামায়া" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মায়া কি না অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। তাহার উপরও মহত্ত্ব আছে। তাহাতে এই বুঝিতে হইবে যে তিনি সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতির ন্যায় নিত্য-পরিণামিনী অথচ অপরিণামা, শুদ্ধা অথচ সবিকারা, জড়রূপা অথচ চৈতন্যময়ী। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ এক তাঁহাতেই সম্ভব। ফলতঃ যেখানে যেরূপে যাহা কিছু আছে, সকলই তিনি। এই নিমিত্ত তিনি মহামায়া। এই নিত্য-চৈতন্যময়ী মহাশক্তি মহামায়াই ব্রহ্ম। কারুণ্যাদি গুণযোগেই তিনি সগুণ-ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এমন করুণাময়ী মাতাকে ছাড়িয়া সাধকের প্রাণ আর কোথায় প্রধাবিত হইবে?

সৃষ্টির অভিধ্যানে বা উপক্রমে উক্ত মহাশক্তির প্রথম বিকাশ, তন্ত্রে তাহাই আদ্যাশক্তি কালিকা-নামে এবং প্রয়োজনবশে তাঁহারই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ, তাহা তারা, ত্রিপুরেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আদ্যাশক্তিই জীব-দেহে কুণ্ডলিনী শক্তি। সাকার ও নিরাকারভেদে স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যানসহকারে তাঁহার সাধনার যথাসম্ভব বিবিধ সুসাধ্য উপায় তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। সাধকেন্দ্র রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ঐ সকল পথের পথিক হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কমলাকান্ত শুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, ঐ পথের পান্থগণের পথপ্রদর্শনের জন্য "সাধকরঞ্জন" নামে যোগ-পদাবলীও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ভুক্তভোগী শিষ্ট সাধক

যে স্বপথগামী ও সুপথগামী সম্প্রদায়ের হিতকামী হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি ?

কি যোগপদাবলী, কি সঙ্গীত-পদাবলী সর্ব্বত্রই ভক্ত কমলাকান্ত আদ্যাশক্তিকে ব্রহ্মময়ী জানিয়া একান্তচিত্তে, অনন্যজ্ঞানে তাঁহার স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন। যে শিব-বাক্যে তিনি অনুশাসিত, তাহাতেও নানাস্থানে জগন্মাতা কালিকা সম্বন্ধে উক্ত মত সুব্যক্ত আছে। যথা নিরুত্তর তন্ত্রে—

শিব-শক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।
সা শক্তির্দক্ষিণা কালী সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূপিণী।
অবিনাভাবসম্বন্ধস্তয়োরেব পরস্পরং।
তয়োর্যোগময়ং তত্ত্বং তয়োর্যোগেন চিন্তনং।

অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু শিব-শক্তিময়। সেই শক্তি দক্ষিণাকালী। তাঁহাদের অবিনাভাব সম্বন্ধ। অর্থাৎ ঐ দুয়ের মধ্যে একবিনা অন্যের সত্তা নাই। ইহারই নাম নিত্যসম্বন্ধ। সেই নিত্যমিলিত পদার্থই তত্ত্ব বা ব্রহ্মবস্তু। এবং তাঁহাদিগের উভয়কে ঐরূপ নিত্যসম্মিলিত ভাবেই চিন্তা করিতে হয়।

এই আদ্যাশক্তির ব্রহ্মময়ীত্বের অধিক প্রমাণ পরিচয় আর কি দিব। এই আদ্যা যে ষড়ঙ্গ-যুবতীময়ী তাহার প্রত্যেক অঙ্গের ন্যাসের আদিতে ব্রহ্মবীজ উচ্চারণ করিতে হয়, প্রত্যেক অঙ্গের পূজায়ও তাহাই করিতে হয়। মায়ের সর্ব্বাঙ্গই ব্রহ্মময়। *।

মাতার স্তুতি-প্রসঙ্গে মহাকাল তাঁহার আদ্যবীজের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই বীজমধ্যে প্রথম সম্বোধনই কালী-ব্রহ্মময়ি! যথা একাক্ষরী বীজের বিশ্লেষণপূর্ব্বক ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে বরদাতন্ত্র—

* প্রমাণ কালীতন্ত্রে—ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ।

কঃ কালী, ব্রহ্ম রঃ প্রোক্তং, মহামায়ার্থকশ্চ ঈঃ।

বিশ্বমাত্রর্থকো নাদো, বিন্দু র্দুঃখহরার্থকঃ।

তাহা হইলে আদ্যাশক্তির একাক্ষরী বীজের অর্থ—হে কালী-ব্রহ্মময়ি, হে মহামায়ে, হে বিশ্বমাতঃ, তুমি বিশ্বের দুঃখ দূর কর। এ সম্বন্ধে অধিক প্রমাণ উদ্ধার অনাবশ্যক। †

এস্থলে পাঠক আরও একটু বিবেচনা করিবেন যে, মন্ত্র ও দেবতায় ভেদ নাই এবং এই বিশ্বজননী, যিনি বিশ্বের দুঃখ দূর করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত, সেই ব্রহ্মময়ীকে ছাড়িয়া মর্ম্মজ্ঞ সাধক আর কাহার উপাসনায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবেন ?

সাধক কমলাকান্তের উপাস্যদেবতা জগন্মাতা কালিকা, যাহা তাঁহার সঙ্গীতগুলিতে পদে পদে প্রকাশিত, তাঁহার তত্ত্ব সম্বন্ধে আর অধিক লেখা আমি উচিত বিবেচনা করিতেছি না। কেননা বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা এই সকল মুদ্রিত পুস্তকের পাঠক, তাঁহাদের অধিকাংশই নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাঁহাদের প্রথমাবধি স্বধর্ম্মে শিক্ষা নাই, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শিক্ষকের সাহচর্য্য নাই, বরং পর-ধর্ম্মে শিক্ষা ও উপদেশাদি আছে। তাহার ফলে তাঁহারা নিজধর্ম্মে ও নিজ ধর্ম্মানুগত সমাজ, সংস্কার, ব্যবহার ও আদর্শে অনুরাগের পরিবর্ত্তে বিরাগেরই পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এইরূপে যখন তাঁহারা নিজেদের যাবতীয় শাস্ত্রানুশাসনে শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদাবুদ্ধি হারাইয়া ভিন্নপথের অনুকরণে ও অনুসরণে উন্মুখ হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট এ সকল প্রসঙ্গের বাহুল্য কখনই প্রিয় হইতে পারে না। অপিচ, যাঁহারা যে বিষয়ে শুশ্রূষু নহেন, তাঁহাদিগের নিকট সে প্রসঙ্গ করিতেও শাস্ত্রের নিষেধ আছে। আর ঐ প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র-আমার কত

† মায়াবীজও জগদম্বার অন্যতর একাক্ষরী বীজ এবং ঐ বীজেও ষড়ঙ্গন্যাসের বিধান আছে। কিন্তু মায়াবীজের নামান্তরই দেবী-প্রণব। উক্ত বীজেরও ষড়ঙ্গন্যাসে আদিতে ব্রহ্মবীজের যোজনা করিতে হয়।

টুকুই বা জ্ঞান, যে আমি তাঁহাদিগকে উহা মনোজ্ঞরূপে বুঝাইতে পারিব ? অতএব উহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বরং সাধকের কবিত্বাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে ভক্ত সাধক শ্রেণীর মধ্যে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত বিষয়ভেদে এই উভয়ই বড় কবি। রামপ্রসাদের ভাবুকতা অধিক, পদ-লালিত্য অধিক, পদনির্ব্বাচন শক্তি অধিক, সুতরাং কবিত্বও তাঁহার অধিক। তাঁহার পদাবলীতে ভাবুকতার উদাহরণ যত্র-তত্র। নূতন নূতন ভাব আকাশে নক্ষত্রের মত যেখানে-সেখানে ছড়ান রহিয়াছে। নিজের সংসার-জড়িত, নিতান্ত পরাধীন, যন্ত্র-চালিতের ন্যায় ভাব দেখাইতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—

মা, আমায় ঘুরাবি কত। ভবে, চোখ-ঢাকা বলদের মত। ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, ঘুরাতেছ অবিরত ; আমায় কি দোষে করিলি গো মা, ছটা কলুর অনুগত। ইত্যাদি।

কখনো ব্রহ্মবস্তুর সন্ধানের উদ্দেশে দেশে দেশে না ঘুরিয়া আত্ম নিমগ্ন হইবার পরামর্শ দিয়া, সেই সঙ্গে আত্মাকে রত্ন-গর্ভ সমুদ্রের সহিত তুলনা করিতেছেন। যথা—

ডুব দেরে মন কালী ব'লে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে ;
তুমি, দম্-সামর্থ্যে যাওনা চ'লে, কুল-কুণ্ডলিনীর মূলে। ইত্যাদি।

কখনো হৃৎ-কমলে জগদম্বার আবির্ভাব-অনুভবে আনন্দ-হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া নিজ চঞ্চলতা তাঁহাতে আরোপিত করিয়া দোল-উৎসবের সহিত তাহার তুলনা করিয়াছেন। যথা—

হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা।
মন-পবনে দোলাইছে দিবস-রজনী ওমা। ইত্যাদি।

এইরূপ লোকসিদ্ধ ব্যাপারগুলির কথায়-কথায় যেখানে-সেখানে দৃষ্টান্ত-মুখে আবির্ভাবে শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণ বিস্ময়ে আনন্দে হঠাৎ অভিভূত হইয়া যায়। তরল-বুদ্ধি লোক হয় তো দৃষ্টান্তের তরলভাবে সদ্য আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়। আর গভীর জ্ঞানী ধীরভাবে গূঢ় ভাব-সম্পদের মর্ম্মবোধে অগাধ আনন্দে নিমগ্ন হয়েন।

পদ-লালিত্যও রামপ্রসাদে প্রচুর। যেমন সমর-সঙ্গীতে—

"ঐ কেরে হর-মোহিনী ঐ।

ঢল ঢল ঢল তড়িত-ঘটা, মণিমরকতকান্তি ছটা, বামা, চিত্ত-ছলনা রে—বামা, চিত্ত-ছলনা, দৈত্য-দলনা, নলিনী-ললনা-বিড়ম্বিনী * ঐ।" ইত্যাদি।

এই সকল গুণ-বাহুল্যে রামপ্রসাদ একজন শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পী। কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে এরূপ শিল্প-সম্পদ না থাকিলেও কবিত্বের নিরাভরণ সুন্দর বা সহজ-সুন্দর আর একমূর্ত্তি আছে। তাহাতে স্বভাবোক্তি, সরলতা, ঐকান্তিকতা ও মর্ম্মকথা প্রভৃতির আধিক্য থাকে। সে বিষয়ে কমলাকান্ত কাহারও অপেক্ষা কম নহেন। পদাবলী হইতে ২।৪টী পদ উদ্ধৃত করিয়া আমার অভিমত সুব্যক্ত করিতে চাহি।

(১) "সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মন-মোহিনী।
তুমি, আপন-সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা কর-তালি।"

এখানে জগদম্বার সৃষ্টিলীলার চঞ্চলতার সহিত সতত-আনন্দময়ী বালিকার খেলা-ধূলা ভাবের আভাস কি সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে!

আবার ঐ গানের অন্তরায়,

"আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশি-ভালী;
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না গো মা, মুণ্ডমালা কোথা পেলি।"

---

* নলিনী ললনা = পদ্মিনী স্ত্রী।

এই স্থলের অলক্ষ্য উপমাটী কি সুন্দর! তিনি "শূন্যরূপা," সুতরাং তাঁহার ভালে বা ললাটে শশীই থাকিবার কথা। "আদিভূতা সনাতনী" এটীও উপেক্ষার কথা নহে। যিনি সনাতনী নিত্যসিদ্ধা, তাঁহার আবার আদি-অন্ত কোথায়? আদি-অন্ত আছে। তিনি নিত্যসিদ্ধা হইলেও প্রতি প্রলয়ান্তে তিনি আদিভূতা না হইলে তো সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। এজন্য উক্ত বিশেষণদ্বয়ে বিরোধ নাই। বিরোধের আভাস মাত্র। আবার "যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না গো মা, মুণ্ডমালা কোথা পেলি।" এই পঙ্‌ক্তিটীতে কি উদাত্ত ও বিচিত্রভাব! আমি সরল সৌন্দর্য্যেরই উদাহরণ দিতেছিলাম, কিন্তু যদি বৈচিত্রের নামই অলঙ্কার হয়, তাহা হইলে অলঙ্কারাংশেও এ সঙ্গীতটী শ্রেষ্ঠ। তবে এ সকল অলঙ্কার সহজাত অলঙ্কার, ও গুলি কুড়াইয়া আনা বা কৃত্রিম অলঙ্কার নহে।

ইহা অপেক্ষাও সরল, অথচ সরলে সুন্দর, প্রসাদগুণপূর্ণ আর একটী উদাহরণ দিতেছি।

(২) "এই কথাটি আমায় বল।
তোমার, কেবা মন্দ, কেবা ভাল।
বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারে কর পরিত্রাণ,
কারে, অবিদ্যা-আবৃত ক'রে, মোহ-গর্ত্তে টেনে ফেল।
জীব-মাত্র শিব বটে, এ কথা অনেকে রটে,
যে, সদানন্দ তারে কেন, নিরানন্দ হ'তে হ'ল।
কমলাকান্তের কালি, মনের কথা মায়ে বলি,
কারো সুখের উপর সুখ, কারো, দুখে দুখে জনম গেল।"

মনঃশিক্ষা সম্বন্ধে ২।১টী পদের উল্লেখ করিতে হয়। যেমন—

(৩) "শিখেছ যতনে যত চাতুরী,
মন, হয়েছ আপনি রিপু আপনার।
ধরেছ ভকত-বেশ, না দেখি ভকতি-লেশ,
কদাচ কপট-রীত, গেলনা তোমার।" ইত্যাদি।

নিম্ন-লিখিত পদটী মনের শিক্ষা নহে, মনের প্রতি সানুনয় অনুরোধ।

(৪) "মন রে মরম-দুখ, কোয়ো শ্যামা মারে।
অঘটন ঘটনা কেন, ঘটে বারে বারে।
আমি ভাবি নিজ-হিত, ঘটে কেন বিপরীত,
পুরাকৃত-কর্ম্ম-ফল, বুঝি গেলনা রে।
মন, তুমিতো সুকৃতী বট, কোন কার্য্যে নহ খাটো,
সে কারণে শ্রীচরণে, সঁপেছি তোমারে;
কমলাকান্তের আর, গতায়াত কতবার,
সাধিয়ে শুধায়ে সুখী, করনা আমারে॥"

পাঠক দেখিবেন, কমলাকান্তের পদে সর্ব্বত্রই সারল্য জনিত সৌন্দর্য্যের ও প্রসাদগুণের স্বাভাবিক সমাবেশ আছে। অতঃপর জগদম্বার প্রতি দৃঢ়-নির্ভরতার একটু কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে হয়।

(৫) "তথাচ জননি তব তারা-নামে তরিব।
ওমা, যখন যেরূপে রাখ, সেইরূপে রহিব।
অঘটন ঘটনা যদি, ঘটেত কি করিব;
আমি, পাপকরি পুণ্য করি, ঐনামে সম্বরিব।
এবার, কমলাকান্তেরে বঞ্চ, কেমনে তা দেখিব,
তুমিতো ত্যজিবে গো মা, আমি যে না ত্যজিব।"

ঐকান্তিক তন্ময়তার নিদর্শনস্বরূপ একটী মাত্র পদ প্রদর্শন করিতেছি—

(৬) "আর কিছু নাই সংসারে, শুধু কালীমা মোর সার রে।
আমার মনকালী, ধনকালী, প্রাণকালী আমার রে।
এ তনু-ধারণে এ তিন ভুবনে, যাতনা নাহি কাররে;
কিন্তু, হেরিলে ওমুখ, দূরে যায় দুখ, এইগুণ শ্যামামার রে।

কেহ, সংসারে এসেছে, কতসুখে আছে, পেয়েছে রাজ্যভার রে ;
আমার, দরিদ্রের ধন, ও রাঙ্গা চরণ, হৃদয়ে করেছি হার রে।" *

তত্ত্বনির্ণয় সম্বন্ধে সাধক অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এক আধটীর উল্লেখ না করিলে সঙ্গত হয় না। পাঠককে একটু ধৈর্য্য ধরিতে বলি।

(৭) "মন ভ্রমে ভুলেছ ক্যানে, তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।
ওমন, শ্রীনাথ-দত্ত, পরমতত্ত্ব, দার্ঢ্য কর সেই চরণে।
তন্ন তন্ন করি মোলে, কি পেলে ছয় দরশনে ;
তুমি, বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্যা আরাধনে।
যখন যারে ব্রহ্ম বলে, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে ;
তোমার, দ্বৈতভাবে দিবস গেল; চিদানন্দ রয় কেমনে।" ইত্যাদি

নিজের প্রতি সাধকের কি সার উপদেশ! বিশেষতঃ, "যখন যারে ব্রহ্ম বলে সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে" ইহা অতি মহামূল্য সুমীমাংসার কথা। আর, দ্বৈতভাবে দিবস গেল, এপংক্তিটী সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতন্মন্যের প্রতিই প্রযোজ্য।

মায়ের স্বরূপ বর্ণন সম্বন্ধে অন্ততঃ আর ২টী গান অপরিহার্য্য। প্রথমটী—"জান না রে মন, পরম-কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।" ইত্যাদি। দ্বিতীয়টী "তারিণী আমার কেমন, আমার, যেমন তারা তেমনি ভাল।" ইত্যাদি। সাধনার উপায় সম্বন্ধে—"সুগম সাধন বলি তোরে, আমার মূঢ় মন ভাব রে। যখন যাতে সুখে থাকে, মন, তাতেই ভাব মারে।" এ গান অমূল্য।

আগমনীতে "বারে বারে কহ রাণী গৌরী আনিবারে" এই গানটী সাধকপ্রবরের একটী অত্যুৎকৃষ্ট গান। ঐ গানের মধ্যে "রাখি অমরের মান, হরের গরল পান, দারুণ বিষের জ্বালা, না সহে শরীরে ; উমার

* যে গানের যতটুকু মনে আছে, তাহাই লিখিত হইল। ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্কর-কায়া, সে অবধি শিব জায়া, বিচ্ছেদ না করে" এই অংশে কি সুন্দর ও সুসঙ্গত কল্পনার উদ্ভাবন হইয়াছে। আবার শেষ অংশটুকুতে—অবলা অল্প-মতি, না জান কার্য্যের গতি, যাব, কিছু না কহিব দেব-দিগম্বরে; কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ, তার মা বটে মানায়ে যদি, আনিবারে পারে। ইহার "যাব, কিছু না কহিব দেব-দিগম্বরে" এই স্থলে শিষ্টতার সহ অভিজ্ঞতা ও আত্ম-মর্য্যাদারক্ষা, বিশেষতঃ "তার মা বটে মানায়ে যদি আনিবারে পারে" এই স্থলে চমৎকার ভঙ্গি সহ ভাবুকতা প্রকাশ পাইয়াছে!

আমি আর পদগুলি সমগ্র উদ্ধৃত করিতেছি না। কেন না, আমি দুই চারিটী উদাহরণ দিব বলিয়া সমগ্র ৮টী গানের উল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছি। আরও করিতে হইলে অত্যন্ত প্রশ্রয়-প্রাপ্তের মত কাজ করা হয় এবং ক্রমে ক্রমে পদাবলী সমস্ত এই ভূমিকাতেই উদ্ধৃত করিতে হয়। তাহা কি অসঙ্গত! নতুবা, "নয়ন কি দেখ রে বাহিরে" "এখন,চল শ্যামা মার নিকটে" "এই সময় ভজ রে মন তারা" "আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মারে" ইত্যাদি সংগীত-রত্ন অযত্ন করিয়া সু-সংগীত-প্রসঙ্গে প্রবন্ধের বাহিরে রাখিতে পারে? কিন্তু প্রসঙ্গ-সঙ্গতির জন্য তাহাও করিতে হইয়াছে।

সাধক-শিরোমণির সাধনোদ্যমে তদীয় পূর্ণ-প্রসন্ন, স্থির-গম্ভীর চিত্তের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সঙ্গীতগুলি, যেমন—"নিশি জাগিয়ে পোহাই জননীর গুণ গেয়ে", "মা কত জাগিয়ে ঘুমাও গো" এই সকল উৎকৃষ্ট সংগীতের নাম-গন্ধও করা হয় নাই। মর্ম্মজ্ঞ পাঠক সকলই স্বয়ং দেখিয়া লইতে পারিবেন। আমি দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিলাম।

পাঠক আরও দেখিতে পাইবেন যে তন্ত্রোক্ত দ্বৈত-গর্ভ অদ্বৈতভাবে ও তাহার সাধনা-মার্গে তিনি যে অনন্যসাধারণ, তাহা তাঁহার বহু সংগীতে পরিস্ফুট। এজন্য তাঁহার সংগীতে অন্যরূপ ভাবুকতা আসে নাই, মূলকথা

ছাড়া বাহ্য অলঙ্কারের অবসর হয় নাই। সরল ও স্বাভাবিক মর্ম্মকথাই তাহার যাহা-কিছু অলঙ্কার হইয়াছে। এজন্য তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে প্রসাদী সংগীতের অনেক স্থলে ক্রীড়াশীল, সুমধুর ও সমুজ্জ্বল বাল-চাপল্যের সহিত গাম্ভীর্য্য যেমন গুপ্তভাবে নিহিত, তেমনি কমলাকান্তী পদাবলীতে আন্তরিক সরলতার সহিত শুদ্ধ প্রৌঢ়োচিত প্রশান্ত-গাম্ভীর্য্যই পরিব্যক্ত বোধ হয়। ফলতঃ কবিত্ব সম্বন্ধে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে যেরূপ পার্থক্য, রাম-প্রসাদ ও কমলাকান্তে সেইরূপ পার্থক্যের ছায়া আমাদিগের অনুভবে আইসে।

শেষকথা, আমরা সঙ্গীত-পদাবলীকে কবিতাবলীর সহিত সমভাবে সমালোচনা করি, ইহা অন্যায়। কেননা, কবিতা ও সঙ্গীত এক বস্তু নহে। কবিতা যেমন আবৃত্তি দ্বারা আবৃত্তি সমকালেই পরিতৃপ্তি লাভ হয়, সঙ্গীতের সেইরূপ আবৃত্তি মাত্রে পরিতৃপ্তি লাভ হইবে মনে করিলে, অবিচার করা হয়। নব্য শিক্ষিতেরা কি ভাবিয়া খণ্ডকাব্যমাত্রেরই গীতি-কাব্য নাম দিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। যাহাহউক, সঙ্গীতে কবিত্ব থাকিলেও কবিতায় যেমন কবিত্বই জীবন, সংগীতে সুরই তাহার তেমনি জীবন বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবশ্য তাহাতে সংগীতের ভাষা চাই। কবিতার ন্যায় সঙ্গীতেরও স্বতন্ত্র ভাষা আছে। ইহা না বুঝিয়া আমরা অনেক উৎকৃষ্ট হিন্দী সংগীতের উপর, উৎকৃষ্ট কবিত্বের অভাবরূপ হেতুবাদে, অবজ্ঞা প্রদর্শন-পূর্ব্বক শোচনীয় স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছি।

উপসংহারে পাঠক, আমার এই ভূমিকার অতিবাদ মার্জ্জনা করিয়া এই গ্রন্থের লেখক শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি।

গ্রাম ও পোষ্টাফিস মেড়তলা,
জেলা বর্দ্ধমান।
শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ।

কমলাকান্তের লীলাক্ষেত্রে

কমলাকান্তের প্রতি

১

শ্যামার চরণ কমলভৃঙ্গ কমলাকান্ত তুমি !
তোমার জন্মভূমিতে তোমার চরণ-চিহ্ন চুমি,
তব আশ্রম-রেণুতে জনমি জীবন ধন্য গণি,
শক্তির বরনন্দন ওগো ভক্তের শিরোমণি !

২

সাধনা শিখায় উজল করেছ দীপান্বিতার রাতি,
নিজ চিতানলে জ্বেলে গেছ তুমি স্বর্গপথের বাতি ।
শ্মশানে শ্মশানে বিষাণে বিষাণে তব আহ্বান-ধ্বনি ।
শক্তির বরনন্দন ওগো ভক্তের শিরোমণি !

৩

প্রমথ পিশাচে ভক্তিমন্ত্রে দানিলে দীক্ষা নব
লালসা বিলাস ভোগের মৃত্যুযোগের ত্রিশূলে তব ।
দস্যু দানব চরণে লুটিল, লুটিল সিংহ ফণী ।
শক্তির বরনন্দন ওগো ভক্তের শিরোমণি !

৪

লক্ষপতির বক্ষে জাগালে পরা-মোক্ষের তৃষা,
তোমার পঞ্চমুণ্ডীর তলে যাপিল কত নিশা।
মিলালে শ্মশান-ভস্মের তলে অপবর্গের খনি।
শক্তির বরনন্দন ওগো ভক্তের চূড়ামণি !

৫

তোমার উগ্র সাধনার তেজ জবায় জবায় জ্বলে,
তোমার ভক্তি-অমৃত সাধুর নয়নে নয়নে গলে।
বঙ্গের মঠ-মন্দিরে বাজে তব বাণী সনাতনী।
শক্তির বরনন্দন ওগো ভক্তের চূড়ামণি !

সাধক কমলাকান্ত

কমলাকান্তের লীলাক্ষেত্রে

'ভক্তিপাগল কমলাকান্ত নৃত্যে মাতিল শ্যামার সঙ্গে।' *

বর্দ্ধমান বীরসাধক কমলাকান্তের জন্ম ও সাধনার পুণ্যক্ষেত্র। এই পুণ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত কোটালহাটে পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি-সংযোগে কমলাকান্ত ললিতনীলকাদম্বিনী জগদম্বার শক্তিলীলার বিরাট তত্ত্ব দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষীণ, হীন, দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বমাতৃত্বের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সবল, সক্ষম ও শক্তিমান্ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সন্তানের শিক্ষার জন্য যেরূপ মাতাপিতার চিরদায়িত্ব, সেইরূপ কোন্‌টি জীবনের পথ, কোন্‌টি মরণের পথ, সাধক তাহা দেখাইয়া দিয়া জীবকে সাবধান করিয়া না দিলে বদ্ধজীব কি উপায়ে রক্ষা পাইবে? এখানেই কমলাকান্তের গুরুগিরির বিশেষত্ব। আমরা সাধকের সাধনালব্ধ তন্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিক অমূল্য ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী। দুঃখের বিষয় কাল-ধর্ম্মে আজ আমরা সেই পুণ্য পবিত্র ভাবসম্পদ মোহবশে ভবের বাজারে বিকাইয়া দিয়া অধঃপতনের পথে উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়াছি। এই গতিকে রোধ করিতে হইবে,—তাহা হইলে সত্য ধর্ম্মের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা বাঁচিব।

সূচনা।

* সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ।

সাধক ও ভক্ত সমগ্র মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা যে জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে বীরসাধক কমলাকান্তের জীবনের একটা প্রামাণিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা কেহই জানি না,—বর্দ্ধমানের জনসাধারণও কতকগুলি প্রবাদ ভিন্ন তাঁহার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস বড় একটা জানেন না। আমি সবিশেষ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, সাধকের জীবনীর ইতিহাসের অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্রও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। জীবনী-কথার উপাদান অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তাহা আর পাওয়া যাইবে না। যাহা অবশিষ্ট আছে, গ্রহণযোগ্য প্রমাণের অভাবে তাহার সকল কথা বিশ্বাস করাও যায় না। এইরূপ একটা অন্ধকারের মধ্যে আজ ছয় বৎসর যাবৎ আমি কমলা-কান্তের জীবনীর উপকরণ-সংগ্রহ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। সাধকের লীলাক্ষেত্র দর্শন করিতে বিগত ১৩২৬ সালের ২০শে চৈত্র শুক্রবার (ইংরাজী ১৯২০, ২রা এপ্রিল) আমি রাঁচি হইতে বর্দ্ধমান যাত্রা করি।

রাঢ়ভূমির হৃদয়স্বরূপ বর্দ্ধমান যে শক্তিসাধনার পুণ্যক্ষেত্র এই সংবাদই বা বাঙ্গালীর ভিতর কয়জন রাখেন? এই শক্তিসাধনার প্রধান ঋত্বিক্ বীরসাধক কমলাকান্ত,—তাঁহার বিপুল সাধনা ও সুকৃতির প্রভাবে সমগ্র বাংলার সমুজ্জ্বল ললাট-মণিরূপে পরিগণিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আমরা তাঁহাকে ভুলিয়াছি। এই যে ভুলিয়া যাওয়া ইহার কোন কৈফিয়ৎ নাই। বিশ্বকবি ডাক্তার শ্রীরবীন্দ্রনাথ আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (১২৯১ সাল, ৫ই মাঘ) রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন,—'আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা প্রত্যেকেই নিজে নিজেকে

বাঙ্গালীর বীরপূজা।

মস্তলোক মনে করিয়া নিজের পায়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেছি, বাষ্পের প্রভাবে স্ফীত হইয়া লঘু হৃদয়কে লঘুতর করিয়া তুলিতেছি। প্রতিদিনকার ছোট ছোট মস্তলোকদিগকে, বঙ্গসমাজের বড় বড় যশ-বুদ্‌বুদদিগকে, বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মত পুষ্প চন্দন দিয়া মহত্ত্ব পূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্ব-পূজার একটা ভাণ ও আড়ম্বর কবিতেছি! এজলায হইতে জোন্স্ সাহেব চলিয়া গেলে হাটে তাহার ছবি টাঙ্গাইয়া রাখি, জেমস্ সাহেব আসিলে তাহার পায়ে পুষ্পমাল্য দিই। অর্থের বিনয়ের উদারতার অভাব দেখিতে পাই না। কেবল আমাদের যথার্থ স্বদেশীয় মহাপুরুষকেই হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া, তাঁহাকে সম্মান করিবার ভার বিদেশীদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিয়াছি।' এত দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর বায়ুর গতি সামান্য ফিরিয়াছে, বাঙ্গালী বহুকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীর্ত্তিরক্ষার আয়োজন করিতেছেন। এ জন্য বাংলার বিভিন্ন শহরে অনুসন্ধানসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে শক্তি-সাধকদের লুপ্ত ইতিহাস ষোল আনা সংরক্ষিত হইবে কিনা আজও ঠিক করিয়া বলা যায় না। এ কাজ ব্যয়সাপেক্ষ, চেষ্টাসাপেক্ষ,—সাধনা-সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত সাধনা এবং সেই সঙ্গে রাজামহারাজদিগের অনুগ্রহ ও সাহায্য ভিন্ন শক্তিসাধকদের জীবনীর উপকরণের উদ্ধার সাধন একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই উভয় সম্প্রদায়ের নিকট বঙ্গভাষা ঋণী। শাক্ত হইতে বাংলা বর্ণমালা ও বাংলা পদ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৈষ্ণব হইতে বাংলা পদ সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। শাক্তধর্ম্মে ধ্যানের প্রাধান্য। শাক্তদিগেরও ধর্ম্মসঙ্গীত ছিল, কিন্তু উহা বৈষ্ণব পদাবলী অপেক্ষা অল্পসংখ্যক। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য পাঠে বৈষ্ণব মহাজনদিগের অনেক

কথাই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু তান্ত্রিক সাধকদের বিষয় অতি অল্পই জানা যায়। বৈষ্ণবেরা আপনাদের সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, শাক্তেরা সেরূপ কিছুই করেন নাই। বর্ত্তমানেও ইতিহাস লেখকেরা বাংলার বৈষ্ণবদের সমাজ, সাহিত্য ও আচার-ব্যবহারের আলোচনা করেন, কিন্তু শাক্তদের বিষয় পরিত্যাগ করিলে যে তাঁহাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখেন না। শাক্তদের রচিত বহু পুথী আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রসাদ ও কমলাকান্তের অনেক গান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—সেই লুপ্ত পদাবলী আর পাওয়া যাইবে না। শুনিয়াছি হালিশহরে একটী অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমিতির সভ্যগণ আজ পর্য্যন্ত প্রসাদের একটী নূতন গানও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কমলাকান্তের লীলাক্ষেত্র কোটালহাট বা চান্নায় এরূপ কোন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই; বর্দ্ধমানাধিপতি 'কমলাকান্ত নাটিকা' লিখিবার সময় বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই কাজটী হাতে লইলে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইত। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, কমলাকান্ত তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি এই ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শকের কাজ করিলে বাঙ্গালী বীরসাধকের জীবনীর ইতিহাস জানিতে পারিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস! কিন্তু তাঁহার নাটিকা কয়েকটী প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঐ প্রবাদের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা তিনি আলোচনা করেন নাই। এই ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবাই মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সাহায্যে লীলাস্থানগুলি নিজ চক্ষে দেখিয়া চান্নার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কাহিনী তিনি ভাব ও ভাষার মুখে অনেকটা পল্লবিত করিয়াছেন, একথা আমি স্থানীয় লোকদের মুখে শুনিয়াছি। যাহাহউক

শক্তিসাধকদের জীবনী আলোচনা।

তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও যে এই কাজে হাত দিয়াছিলেন ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট বিশিষ্টভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রসাদ-প্রসঙ্গের অনুসন্ধান শেষ করিয়া আমি কমলাকান্তের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। আমার মত লোকের পক্ষে এই কাজে ব্রতী হওয়া যে খুব সঙ্গত হয় নাই তাহা এখন আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। দশের সাহায্য ভিন্ন এ কার্য্যোদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা নাই। দৈববাধাবিপত্তি ও সময়াভাবে আমার এই সংগ্রহ ব্যাপারে নানা অসুবিধা হইয়াছে। আর একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছি বলিয়া আমি সুবিধামত চারিদিকে ছুটাছুটি করিবার অবসরও পাই নাই। এই অনুসন্ধান ব্যাপারে আমি দুই একটী ভদ্রলোকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের কোনই সাড়াশব্দ পাই নাই। আবার কেহ কেহ উত্তরে ইংরাজী 'regret' বাক্যে আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ফুলিয়ায়, চণ্ডীদাসের নান্নুরে, জয়দেবের কেন্দুবিল্ব গ্রামে বড় বড় সাহিত্যিকদের শুভাগমন উপলক্ষে পরিষদের তরফ হইতে বিশেষ উৎসব ও সমারোহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বাংলার শ্রেষ্ঠ সাধক প্রসাদ বা কমলাকান্তের স্মৃতি-সংরক্ষণে পরিষদ্ এ পর্য্যন্ত কোন আয়োজন করেন নাই। আমি একাকী ক্যামেরা লইয়া প্রসাদ ও কমলাকান্তের বাস্তুভিটা ও সিদ্ধাসন দেখিয়া আসিয়াছি, এই ক্ষেত্রে কলিকাতার দুই একজন বন্ধুকে আমার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা রাজী হন নাই। শক্তি-সাধকদের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় আমি নানা দিক্ দিয়া কেবলই বাধা পাইয়াছি, এই বাধাবিঘ্ন এখন আমার সহিয়া গিয়াছে। আমার দেশবাসীকে অনুযোগ দিবার কিছুই নাই, কারণ যাহা যুগধর্ম্ম তাহাই হইবে। এ বিষয়ে অদৃষ্ট শক্তিই প্রবল, ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের দোষ খুঁজিয়া লাভ কিছুই নাই, বরং লোকসানেরই সম্ভাবনা।

* * * *

* * * *

বর্দ্ধমানে কোথায় গিয়া উঠিব, সেখানে কমলাকান্তের আসন ও বাস্তুভিটার ফটো তুলিতে পারিব কি না, এইরূপ নানা চিন্তা মাথায় লইয়া বিগত ২০শে চৈত্র, শুক্রবার, অপরাহ্নে শিশুগুলিকে কোন প্রকারে শান্ত করিয়া ষ্টেশনের দিকে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিলাম। যাত্রার দুই চারি মিনিট পূর্ব্বে পাথেয়ের টাকাগুলি বাঁধিবার জন্য একখানা রুমালের প্রয়োজন হইয়াছিল; অনুসন্ধানে দেখা গেল 'শান্ত' শিশু-সমাজের অদ্ভুত কারিগরিতে গৃহের দুই একখানা রুমাল যাহা ছিল তাহা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। কি করি, রুমালের পরিবর্ত্তে একখানা ছেঁড়া নেকড়ায় টাকা কয়টী বাঁধিয়া লইলাম। ট্রেন ছাড়িবার ১৫ মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। পৌণে চারিটার সময় গাড়ী রাঁচি ষ্টেশন ছাড়িয়া পুরুলিয়ার দিকে চলিল। আমি কোন অনুসন্ধান-সমিতির তরফ হইতে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করি নাই, সেইরূপ একটা বিরাট ব্যাপারের বর্ণনায় কালিকাগজের খরচও কম হয় না। তখন বন্ধুবান্ধবের হাসির গান, হাসির কথা, চা-পান কত বিষয়ই কলমের অগ্রভাগে ফুটিয়া উঠে। আমি নীরবে সাধকের লীলাক্ষেত্র দেখিতে চলিয়াছি, এই ক্ষেত্রে পথের কথা ফেনিল ভাষায় বর্ণনা করিবার কিছুই নাই। পুরুলিয়া ও আদ্রায় গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি ১২টার সময় আসানসোলে পৌঁছি। পূর্ণিমা রজনী, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠ-ঘাট বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। পূর্ণিমা রজনী অথবা জ্যোৎস্নাবিধৌত মাঠ-ঘাটের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট আছে, কাজেই আমি নৈশ প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধটী দীর্ঘ করিতে চাই না।

পথের কথা।

কিছুক্ষণ পর 'দিল্লী একস্‌প্রেস' গাড়ীতে চড়িয়া রাত্রি তিনটার সময় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামি। তিনটী পুল (overbridge) পার হইয়া

দক্ষিণ দিকে ষ্টেশনের প্লাটফরমে ঘুরিতে লাগিলাম। সংসারে যাহারা নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, মাকড়সার মত নিজের ভিতর হইতে টানিয়া টানিয়া যাহারা চারিদিকে স্বার্থের জাল নির্ম্মাণ করে ও স্ফীত হইয়া তাহারই মাঝখানটিতে ঝুলিতে থাকে, তাহাদের নিকট প্রসাদ বা কমলাকান্তের কথা ভাল লাগিবে কেন? কমলাকান্তের সাধনা,—তাঁহার পদাবলী,—তাঁহার বাস্তুভিটা ও পঞ্চমুণ্ডী আসনের শেষ চিহ্নটুকু যদি আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিমুষ্টির মত উড়িয়া যায়,—তবে তাহাতে কাহার কি আসে যায়? শক্তিসাধকদের সাধনার প্রতি বাঙ্গালীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আজ কোথায়! এইরূপ একটা দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমলাকান্তের জীবনীর উপকরণ খুঁজিতেছি। বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে পূর্ণিমার চাঁদ আলো দিতেছিল বটে, কিন্তু সেই চাঁদ আমাকে কোটালহাট বা চান্নার দিক্ নির্ণয় করিয়া দিতে পারিল না। আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া তীব্র শীতে অজানা শহরের এক প্রান্তে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতে লাগিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম কক্ষে (?) দুই চারিটী লোক দেখিলাম, তাহারা রজনীর শেষভাগে 'মোকদ্দমায় জ্ঞাতিবন্ধুর সর্ব্বনাশ সাধন করিবে' এইরূপ কল্পনা ও জল্পনায় বেশ আমোদ উপভোগ করিতেছিল। এই সময়ে একটী ফিরিঙ্গী আমাদের পাশ কাটিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। চাঁদ পশ্চিমে অস্ত গেল,—পূর্ব্বদিকে ঊষার রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিতেই আমি শহরের রাস্তা ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। বর্দ্ধমান শহরে আমার পরিচিত কেহই নাই, চিঠিপত্রে দুই একটী ভদ্রলোকের পরিচয় জানিতাম। সমস্ত বর্দ্ধমান আমার অপরিচিত, রাস্তাঘাট জানি না, আমার মত নগণ্য পথিকের ভার লইবার সেখানে কেহই নাই। তখন সাধকের একটী পদাবলীর ভণিতা আমার মনে পড়িল; কমলাকান্ত একদিন গাহিয়াছিলেন—

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে।

'কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর, ভাবিয়া চরণাম্বুজে শরণ লইলাম।' আমিও আজ সেই বিশ্বজননী মহাকালীর চরণে শরণ লইয়া প্রাণের ভিতরে শান্তি পাইলাম।

শহরের দিকে যে রাস্তাটী গিয়াছে তাহার দুই ধারে গাছপালা ও জঙ্গল। পূর্ব্বদিন বর্দ্ধমানে বেশ জল হইয়াছিল, তাই রাস্তার স্থানে স্থানে কর্দ্দম—আটাল মাটির কাদা যেন পাদুকা আটকাইয়া ধরে। মোড় ঘুরিয়া আমি পূর্ব্বদিকে চলিলাম, পথের ডানদিক্ হইতে পল্লবঘন তরুশ্রেণী সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দুই একখানা অশ্বশকট কর্কশ ঘর্ঘর শব্দে আমার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। আমি তখনও জানিনা কোথায় চলিয়াছি। রাস্তার বাম পার্শ্বে প্রসিদ্ধ উকীল ৺ তারাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য বাড়ী দেখিতে পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটু উত্তরে সরিয়া মাথায় পাগড়ীবাঁধা একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি পরিচিত গলায় বলিলেন, 'মহাশয়, আমাকে চিনিতে পারিলেন কি?' আমি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমার নাম পার্ব্বতীচরণ ঘোষ, ঢাকা কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে আপনার সঙ্গে একত্র পড়িতাম।' আজ বিশ বৎসর পর একজন বন্ধুকে এই অপরিচিত স্থানে পাইয়া প্রাণের ভিতর বড়ই আনন্দ হইল। পার্ব্বতী বাবু কলিকাতায় শিক্ষকতা করেন, তিনি কয়েকটী ছাত্র সঙ্গে করিয়া কোন এক ধনীর আহ্বানে বর্দ্ধমানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইনি আমাকে শহরের রাস্তাঘাটের কোন সংবাদই দিতে পারিলেন না, কারণ তিনিও সেখানে নূতন অতিথি। বন্ধুবর তাঁহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন, আমি কাছারীর পথ ধরিয়া রাধানগরের অনুসন্ধানে চলিলাম। সম্মুখেই একটী বিশাল 'সিংহদ্বার'

শহরের পথে।

দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সিংহদ্বারটা দেখিলাম। ইহাই পূর্ব্বশ্রুত 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' সিংহদ্বার। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর বর্দ্ধমানে পদার্পণ করেন। তাঁহার শুভাগমনের স্মৃতিরক্ষার জন্য বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয় চন্দ্ মহ্তাব বাহাদুর কর্ত্তৃক পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এই সিংহদ্বার নির্ম্মিত হয়। সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। বেলা সাতটা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী খুঁজিলাম, কিন্তু কেহই আমাকে বাড়ীখানা দেখাইয়া দিতে পারিলেন না। তখন ডাক্তার শ্রীযুক্ত মানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর ঠিকানা একখানা চলন্ত গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে গাড়ী থামাইল, আমাকে সে ডাক্তার বাবুর গৃহে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। আমি গাড়ীতে বসিলাম। পাঁচ মিনিটের ভিতর গাড়োয়ান দুই একটা গলি ঘুরিয়া আমাকে একটা ডোবার কাছে আনিয়া বলিল, 'বাবু, নামুন, ঐ ডাক্তার বাবুর বাড়ী।' আমি গাড়োয়ানকে তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ডাক্তার বাবুর বাড়ীর ফটকে গিয়া দাড়াইলাম। একটী ভৃত্যকে ডাক্তার বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে অতি ভাল মানুষের মত বাড়ীর ভিতরে গিয়া আমার আগমন সংবাদ দিল। আমি এই অবসরে ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানার বারান্দায় একখানি আরামকেদারায় ক্লান্ত দেহখানি স্থাপন করিলাম।

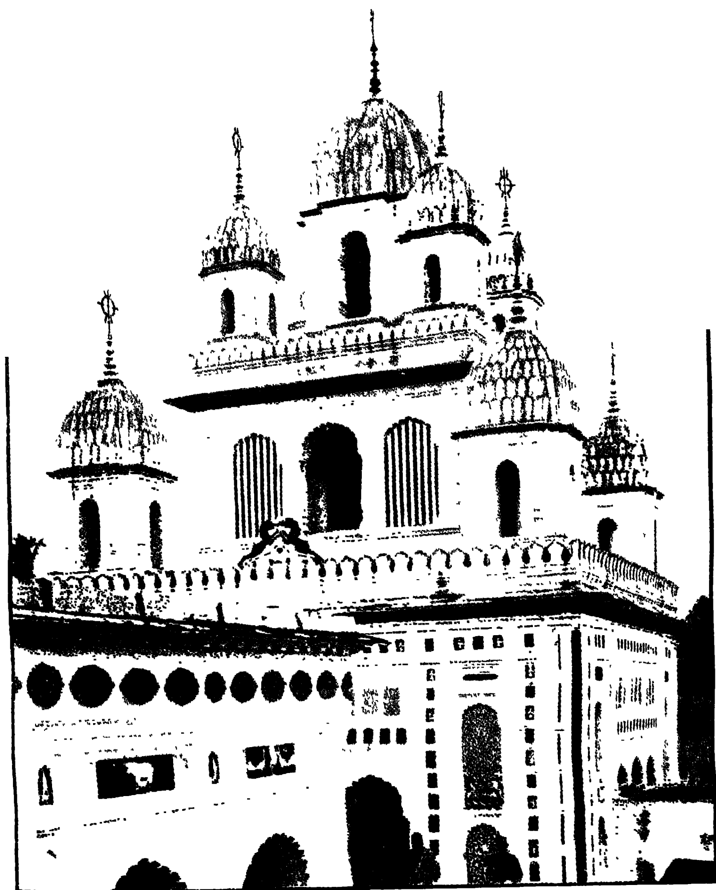
মানদা বাবুর গৃহে।

মানদা বাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা দিলেন। তাঁহাকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, পত্রসংযোগে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি আমাকে অতি পরিচিত আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিলেন। যাই-কি, না-যাই, এই সন্দেহে মানদা বাবুকে পূর্ব্বে কোন সংবাদ দেই নাই। তিনি আমাকে

পাইয়া বড়ই খুসী হইলেন,—অপরিচিত হইলেও কুলীন সন্তান বলিয়া রক্তের একটা স্বাভাবিক টান নিশ্চয়ই আছে, এই আকর্ষণেই আজ মানদা বাবুর গৃহে 'অতিথি' হইয়াও পরমাত্মীয়রূপে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছি। ধনীর গৃহে অতিথি বিশেষের জমকাল অভ্যর্থনা হইতে পারে, জলযোগের সময় পর্ব্বত প্রমাণ লুচি সন্দেশ ও মিহিদানার ব্যবস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রাণের শ্রদ্ধা ও প্রেম সেখানে আছে কিনা সন্দেহ, সেই জীবন্ত করুণ ভাব একমাত্র মধ্যবিৎ গৃহস্থ ও দরিদ্রের কুটীরেই সুলভ। মানদা বাবু ধর্ম্মনিষ্ঠ খাঁটি ব্রাহ্মণ, বর্দ্ধমানের জনসাধারণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ—পীড়া ও যন্ত্রণার সময় তিনি যখন রোগীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সেই ধন্বন্তরিকল্প মধুর মূর্ত্তি রোগীর যন্ত্রণাপূর্ণ জীবনকে তৃপ্ত ও শীতল করিয়া দেয়। ধনীর প্রাসাদে ও দরিদ্রের কুটীরে সর্ব্বত্রই তাঁহার মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও সন্ন্যাসীর মত নির্লোভ ও নিস্পৃহ, আর্ত্ত জীবকে প্রেম করাই ইঁহার ধর্ম্ম, এমন লোক বর্ত্তমানে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমার প্রাতঃকৃত্যের যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মানদা বাবু বাড়ীর ভিতরে গেলেন। অল্পক্ষণ পর তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'সাড়ে নয়টার গাড়ীতে আপনি খানা জংশন হইয়া চান্নায় যাবেন। আমি আহারের ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম। চলুন গাড়ী প্রস্তুত, একবার সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির দেখিয়া আসিবেন।' বর্দ্ধমান রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি; মাতৃভক্ত কমলাকান্তের বাস্তুভিটা, আসন প্রভৃতি দর্শনের পূর্ব্বে মাতৃমূর্ত্তি দর্শন মাঙ্গলিক মনে করিয়া আমি তখনই তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলাম। মানদা বাবু, তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুরুদেব শ্রীমৎ জনার্দ্দন

৺সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে।



পৃঃ ১৪

শ্রীশ্রী৺ সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির

(বৰ্দ্ধমান)

ব্রহ্মচারী*, গিরিধির উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ও আমি এই চারিজন গাড়ীতে উঠিলাম। পাঁচ মিনিটের ভিতর গাড়ী দুই একটা গলি ঘুরিয়া আমাদিগকে বাঁকা নদীর পারে ৺ সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সুবৃহৎ মন্দিরের ফটকে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। মানদা বাবু অল্পক্ষণের পর স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। আমরা তিনজন ৺ সর্ব্বমঙ্গলার রত্নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলাম। প্রতি কক্ষের দেওয়ালে অতি সুন্দর সুন্দর হিন্দু দেবদেবীর মূল্যবান্ চিত্রাবলী টাঙ্গান রহিয়াছে।

শ্রীশ্রী৺ সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর কোন প্রামাণিক ইতিহাস নাই। জনশ্রুতি এই যে, একবার বন্যার পর বাঁকা নদীর গর্ভে কোনও চূণারী অথবা সন্ন্যাসী দেবী মূর্ত্তিখানা বালুকার মধ্যে কুড়াইয়া পান এবং তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপতিকে তাহা অর্পণ করেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা বর্দ্ধমানাধিপতি জগৎরাম রায়ের পুত্র বিখ্যাত যোদ্ধা রায় কীর্ত্তিচন্দ্রের সময় ঘটে। কথিত আছে ইনিই প্রথমে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর রত্নমন্দিরের সম্মুখে যে শিবলিঙ্গ আছে তাহা কীর্ত্তিচন্দ্রের ভ্রাতা মিত্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই লিঙ্গমূর্ত্তি 'মিত্রেশ্বর' নামে খ্যাত। মন্দিরের বহির্বাটীর দক্ষিণভাগে যে দুইটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা রায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র রাজা চিত্র সেনের দুই পত্নী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; এই সকল এবং অন্যান্য কারণ হইতে মনে হয় যে রায় কীর্ত্তিচন্দ্রের আমলে ৺ সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান রত্নমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত দেবীর ইতিহাস আর বিশেষ কিছু জানা যায় না:

* ধানবাদ হইতে ৬ ক্রোশ দূরে বিরাজপুর (যোশীমঠের অন্তর্ভুক্ত) মঠে ইহাঁরা বাস করেন। ইহাঁরা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। ব্রহ্মচারীর বয়স ২৩।২৪ হইবে। পূর্ব্বে ইঁহার বাড়ী পাবনা জেলায় ছিল, আজ ৭।৮ বৎসর হইল ইনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন।

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুরেরা আমাদিগকে মায়ের পাদোদক দিলেন। রত্নবেদীতে অষ্টাদশভুজা শ্রীশ্রীদুর্গার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, গাত্রাভরণ সুবর্ণ নির্ম্মিত। জগদম্বা সর্ব্বমঙ্গলার শ্রীমূর্ত্তি ও বিভিন্ন মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া নিকটবর্ত্তী বাঁকা নদীর পুলের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। ইহাকে নদী বলা চলে না, ইহা বর্দ্ধমান শহরের ময়লা ও আবর্জ্জনা বাহির হইয়া যাইবার পয়ঃপ্রণালীস্বরূপ। অনেকেই মনে করেন স্রোতোহীন বাঁকার পুঞ্জীভূত ময়লা রাশি হইতেই বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বাঁকা দেখিয়া নিকটবর্ত্তী কামানটীও দেখিলাম। তারপর ফটকে ফিরিয়া একটু দাড়াইতেই মানদা বাবু আসিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিলাম মানদা বাবু ঠিক ঘড়ীর মত কাজ করিয়া যাইতেছেন। সামান্য দুই একটা কথা বলেন, যেখানে যেই কাজটী করিতে হইবে ঠিক সময় তিনি সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। তিনি দিবানিশি হাসিমুখে কাজের ভিতর ডুবিয়া থাকেন। ইনি সংযত বাক্ ও যথালাভে সন্তুষ্ট, এইভাব দেখিয়া ইঁহাকে গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে উল্লিখিত ঠাকুরের প্রিয়ভক্তের নিখুঁত আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

* * * *

* * * *

চান্নায় পথে।

২১ শে চৈত্র। শনিবার। বেলা ৯-১৫ মিনিটের সময় রাধানগরের বাসা হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত মানদা বাবুর গাড়ীতে বর্দ্ধমান ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হই। সাতটী পয়সায় খানা-জংশনের একখানা টিকিট লই। গাড়ীতে সতীশ বাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হয়। ইনিঁও ব্রহ্মচারীর একজন ভক্ত শিষ্য। বালিয়া

জেলায় রেওয়াতী আশ্রমের শ্রীমৎ যোগানন্দ সরস্বতীর অদ্ভুত বৈরাগ্যের কাহিনী ইঁহারই মুখে শুনি।

রায় মহাশয় বলিলেন, 'যোগানন্দ স্বামী বাংলা লিখিতে ও বলিতে বেশ পারেন। ইনি এক সময়ে কলিকাতা বড়বাজার থানার দারোগা ছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত হইয়া ইনি কোন ভদ্রলোকের গৃহে আহার করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে একটী চুরির সংবাদ থানায় আসে। তখন থানায় হেড কনেষ্টবল সংবাদটি ডায়েরীতে লিখিয়া লন। এই বিষয়টী যথা সময়ে পুলিশ কমিশনার জানিতে পারিয়া স্বামীজীকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমারা কাম্‌মে বহুৎ গল্‌তি হ্যায়, হাম তোমারা সুরাৎ দেখ্‌নে নেহি মাংতা হ্যায়।' সাহেবের কথা স্বামীজীর প্রাণে বড় লাগিল, ২৫ বৎসর ৩ মাস চাকরীর পর তাঁহাকে শুনিতে হইল 'সুরাৎ দেখ্‌নে নেহি মাংতা হ্যায়।' তিনি তৎক্ষণাৎ চাকরী ইস্তাফা দিয়া সাহেবকে বলিলেন, 'বহুৎ আচ্ছা। হাম আজ্‌ছে এছা মালিকো পাছ কাম করেঙ্গে যো কভি নেহি বোলেঙ্গে তোমারা সুরাৎ নেহি দেখ্‌না চাতে হ্যায়।' স্বামীজী এই ধাক্কা খাইয়া পরম পুরুষের অনুসন্ধানে চাকরী ছাড়িলেন, সংসার ছাড়িলেন, সমস্ত ছাড়িয়া তাঁহারই পায়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়া জীবজগতের মঙ্গলের জন্য ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে আজ কোন ব্যবধান নাই, এই রাজ্যে ভক্তের মুখ দেখিয়া ভগবান্‌ও ধন্য এবং ভগবানের মুখ দেখিয়া ভক্তও নিয়ত ধন্য হইতেছেন। এ সম্বন্ধ সংসারের অনিত্য সম্বন্ধ নয়, ইহা আধ্যাত্মিক জগতের নিত্য সম্বন্ধ, এখানে কোন ভয় নাই, ভয় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।' এই মন্ত্র ইষ্টকবচস্বরূপ গ্রহণ করিয়া শ্রীমৎ যোগানন্দ সরস্বতী পরব্রহ্মের ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন।' এই ভাবের নানা সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে

গাড়ী থানা-জংশনে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি সতীশ বাবুকে নমস্কার করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম।

* * * *

* * * *

থানা জংশন ষ্টেশনে নামিয়া দুই একটী ভদ্রলোককে চান্নার রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বাজারে গিয়া সংবাদ লইতে বলিলেন। আমি ফটক পার হইয়া উত্তর দিকে বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাজারটী অতি ক্ষুদ্র, পাঁচ সাতখানা দোকান আছে; দুইটী ঔষধালয়ও দেখিতে পাইলাম। শুনিয়াছি জংশনের ঔষধালয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্যাটেণ্ট ঔষধ দৈনিক তিন চারি শত টাকার বিক্রয় হয়। ইহা হইতেই বৰ্দ্ধমান জেলার পল্লীস্বাস্থ্যের একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। আমি জনৈক দোকানদারকে চান্নার কথা বলিলে তিনি বলিলেন, 'আপনি কি চান্নার আশ্রমে সাধু বাবার নিকট যাবেন?' উত্তরে বলিলাম, 'হঁ। সাধু বাবাকে সঙ্গে করিয়া আমি কমলাকান্তের বিশালাক্ষী মন্দির, আসন, টোল-বাড়ী, খড়ি নদী প্রভৃতি দেখিব। আমার সঙ্গে একজন "সেথো" দিলে ভাল হয়।' কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম দোকানদার সাধু বাবার শিষ্য, নাম শ্রীদুর্গাদাস রায়। ইনি আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিলেন এবং মাগুনী নামে একটা খোট্টা বালককে আমার সঙ্গে দিয়া দিলেন।

বালকের সঙ্গে কাচা রাস্তা ধরিয়া আমি উত্তরে চান্নার দিকে চলিলাম। সেথো বালকটা একটু অগ্রসর হইয়াই ডান দিকে মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। বড় একটা মাঠ বা ডাঙ্গার উপর দিয়া আমরা নানা কথা বলিতে বলিতে পুণ্যতীর্থ চান্নার দিকে চলিয়াছি। তখন সাড়ে দশটা বাজিয়াছে, রোদ তাতিয়া উঠিয়াছে, একটু বাতাস নাই, এমন কি একটী গাছের পাতাও নড়িতেছে না। এখানে মাঠের ভিতর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত

অসংখ্য ঋজু তাল ও খেজুর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে আম গাছও আছে। চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত ধূসর মাঠ, তাহার কোন জায়গায় সবুজ রঙ্গের আভাস মাত্র নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় কোন বাধা নাই। এখানে কিছুই দেখিবার নাই; শুধু দূর দিক্ চক্রবালে দুই একখানি পল্লীর ধূসর ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশাল প্রান্তরের চারিদিকে এক সময়ে জনশূন্য ছিল। ডাকাতেরা এই চান্নার মাঠে কত লোককে যে খুন করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। আজ পর্য্যন্ত কথাপ্রসঙ্গে জনসাধারণ বলিয়া থাকে 'যদি গেল চান্না ঘরে উঠলো কান্না।' ইংরাজরাজের সুশাসনে বর্ত্তমানে সে সকল ডাকাতের বংশ প্রায় লোপ পাইয়াছে। অনুমান আধ ঘণ্টায় প্রথম মাঠটী পার হইয়া হিট্টি গোয়ালপাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রামের ভিতর একটী সরু গলির মতন রাস্তা আছে। এখানে বাড়ীর পাশে ঝোপ ঝোপ কলাগাছ, স্থানে স্থানে অসংখ্য ডোবা; এই সকল ডোবার অতি অপরিষ্কার জল গ্রামবাসীরা পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। স্থানীয় জেলাবোর্ড এই সকল পল্লীর পানীয় জলের কোন সুব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। দেশের ধনীরা পল্লীর বাসভবন ছাড়িয়া শহরে আশ্রয় লইয়াছেন, কাজেই পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করিবে কে? এই গ্রাম ছাড়িয়া আমরা অপর একটী মাঠে গিয়া পড়িলাম। এই মাঠটী প্রথমটীর মত তত বড় নয়। প্রায় দশ মিনিটে এই মাঠ পার হইয়া আমরা চান্না গ্রামের পশ্চিম দিকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রাম প্রবেশের পথে বাম দিকে অসংখ্য তালবৃক্ষবেষ্টিত একটী জলশূন্য ডোবা আছে। ডোবাটী দেখিয়া বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত 'তালপুকুরের' কথা মনে পড়িল। ডোবার পশ্চিম পারের বাঁশবনের নীচ দিয়া একটী সরু গলির মত রাস্তা আছে। এই রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই চান্না গ্রাম। এইবার আমরা চান্না গ্রামের ভিতর দিয়া দুই চারি মিনিট

হাঁটিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। পথের ধারে বেড়ার তলায় তলায় কচু কালকাসন্দা দোপাটি লজ্জাবতীর ভিড়করা ঘাসবন। পল্লীবাসীর খড়ে ছাওয়া মেটে ঘরগুলি নিকান পোতান দিব্য ঝরঝরে। একখানা গৃহের বারান্দায় ডাকপিয়ন একতোড়া চিঠি ও কাগজ আমার সেথোর হাতে দিয়া বলিল, 'এইগুলি সাধু বাবাকে দিও। কাল ইষ্টারের ছুটী ছিল বলিয়া এদিকে আসি নাই।' পল্লীগ্রামে এ ভাবেই চিঠি বিলি হইয়া থাকে। অনেক সময় জরুরী চিঠি বেগারের হাতে পড়িয়া ডোবা বা নালাতেও নিক্ষিপ্ত হয়। ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কোন প্রকারে সংবাদ পাইলে শাস্তি যে অতি কঠিন হয় তাহা সকলেই জানেন। তথাপি ডাকপিয়নরা এইভাবে বিলি-ব্যবস্থার প্রলোভন ছাড়াইতে পারে না। সেথো চিঠিগুলি হাতে করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের পথে হাঁটিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ হাঁটিয়া গ্রাম ছাড়িয়া উত্তর দিকে আর একটা ক্ষুদ্র মাঠে গিয়া পড়িলাম। এই মাঠটা ১০।১২ মিনিটে পার হইয়া আমরা আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন প্রায় সাড়ে এগারটা বাজিয়াছিল।

আশ্রমে।

শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামী এই আশ্রমে সস্ত্রীক বাস করেন। ইনি মুণ্ডরী পাহাড়ের ৺ সোহহং স্বামীর শিষ্য। চান্না ইঁহার জন্মস্থান। পূর্ব্বে ইঁহাদের বাড়ী যশোহরে ছিল। আজ সাত বৎসর হইল ইনি এই সুন্দর আশ্রমটী মহাশ্মশানের উপর রচনা করিয়াছেন। আশ্রমটী খড়ি নদীর দক্ষিণে,—এখানে তিনখানা ঘর আছে। প্রথম গৃহখানিতে দুইটী কক্ষ, এই গৃহে স্বামীজী বাস করেন। পশ্চিমদিকের গৃহে রান্না ও ভাঁড়ার রক্ষিত হয়। পিছনের দিকে বড় একখানা ঘর আছে। ইহা অতিথিদের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানই সাধনার সহায়।

আমি যখন আশ্রমে প্রবেশ করি তখন স্বামীজী আহারাদি শেষ করিয়া

একখানি আরামকেদারায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমার আগমন-সংবাদ পাইয়াই ইনি বারান্দায় আসিয়া আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার সহিত একঘণ্টা কাল কমলাকান্ত সম্বন্ধে আলাপ হইল। সন্ন্যাসধর্ম্ম স্বামীজীর ললাটে গাম্ভীর্য্যের ছবি অঙ্কিত করিলেও তাঁহার আলাপ ও হাসিতে এত সরলতা ও আন্তরিকতা মাখান যে তাহা শিশুর ন্যায় শান্ত ও মধুর বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজীর মুখে কমলাকান্ত কথা।

স্বামীজী বলিলেন,—'আপনাকে বিশালাক্ষী পূজার বিবরণ সম্প্রতি পত্রে জানাইয়াছি। এখান হইতে ৫ মিনিট দূরে মন্দিরটী অবস্থিত। আমি ওখানে আশ্রম রচনার পূর্ব্বে এক বৎসর কাল ছিলাম। জোর শিমূল গাছের নীচে একখানা আসন আছে। জনসাধারণের বিশ্বাস উহা সাধক কমলাকান্তের আসন। আমি নিজে ঐ আসনে বসিয়া শান্তি পাইতাম। এই কারণে মনে হয় ইহা কমলাকান্তের সিদ্ধাসন। ইহার অধিক প্রমাণ আমি দিতে পারিব না। ভুলুয়া সন্ন্যাসী ও 'পল্লীবাসী' সম্পাদক একদিন ভাদ্রমাসের অপরাহ্ণে এই আশ্রমে বিশালাক্ষী দর্শনে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ স্থানে লইয়া যাই। তাঁহারা বিশালাক্ষী দর্শন করিয়া চান্না গ্রামে গিয়া আমার মাতৃদেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তারপর রাত্রি ১১টায় তাঁহারা বর্দ্ধমানে ফিরিয়া যান। প্রবোধ বাবু আমার আত্মীয়। ইনি "সাধক রঞ্জন" পুথীখানা লইয়া যান। কথা ছিল বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের তরফ হইতে উহা ছাপাইয়া আমাকে মূল পুথীখানা ফেরৎ দেওয়া যাইবে। ৺ত্রিবেদী মহাশয়ও পুথীখানা ফেরৎ দিবেন বলিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠিখানা হারাইয়া গিয়াছে।

দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত পুথীখানা আমি ফেরৎ পাই নাই। ইহা ব্যক্তিবিশেষের খাসদখলে থাকা আমি ভাল মনে করি না। বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর ঐ পুথীখানার জন্য আমার নিকট একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন। তখন পুথীখানা প্রবোধ বাবু লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুরের খাস পুথীশালায় উহা সমর্পণ করিতে আমি রাজী হই নাই। তবে মূল পুথীর নকল যে কেহ লইতে পারেন। পুথীখানা আমি মাত্র ৫।৭ মিনিট উল্টাইয়া দেখিয়াছিলাম। ইহা তালপাতার পুথী, বাংলা পয়ারে রচনা। মনে হয় ইহাতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া তান্ত্রিক সাধনার বিচার লিখিয়া পরিশেষে অদ্বৈতবাদের আলোচনায় পুথীখানা শেষ হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত পাঁচটী সাধনপ্রণালীও উহাতে থাকিতে পারে, আমি বিষয়গুলি ঠিক ঠিক বলিতে পারি না।'

'চান্না গ্রামের ব্রাহ্মণেরা চাষী, লেখাপড়ার দিকে তাঁহাদের কোনই উৎসাহ নাই। এখানে ২৫।৩০ ঘর ব্রাহ্মণ ও ২৫।৩০ ঘর উগ্র ক্ষত্রিয় বা আগুরী আছে। এখানে আশেপাশে ৪টী ডাঙ্গা। এই ডাঙ্গার মাঝে সাঁওতালেরা কুটীর বাঁধিয়া অস্থায়ীভাবে বাস করে। এই ৪টী ডাঙ্গায় ২৫ ঘর সাঁওতাল আছে। ডাঙ্গাগুলির নাম,—সাঁওতাল ডাঙ্গা, চড়কডাঙ্গা, শিকের ডাঙ্গা ও বাবুর ডাঙ্গা। পূর্ব্বে এই ডাঙ্গাতে ডাকাতী ও নরহত্যা হইত। বিশালাক্ষী মন্দিরের সম্মুখে বাবুর ডাঙ্গা ; কথিত আছে এখানে বর্দ্ধমান রাজবংশের কোন ধনী আত্মীয় বাস করিতেন। মাটী খুঁড়িলে ইটকাঠ এখনও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই বাবুরা বিশালাক্ষী মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। খড়ি নদী দামোদরের শাখা বিশেষ ; ইহা নাদনঘাটে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। নদীতে বোয়াল, খরসুল, গলদা-চিংড়ী,

মাগুর ও আড়মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি নিকটবর্ত্তী একটী ঝরণার জল পানের জন্য ব্যবহার করি।'

'বিশালাক্ষী মন্দিরটী শত বৎসরের হইলেও, ঐ স্থানটী বহু প্রাচীন। মন্দিরের ভিতর ইষ্টকনির্ম্মিত রত্নবেদীর গায়ে অতি সূক্ষ্ম কাজ ছিল। বর্ত্তমানে ঐ বেদীতে চূণ ও বালির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। অনেক দিন আগে আশেপাশের ডোমেরা বিশালা মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগের ঢালু জমিতে শূকর বলি দিত। বর্ত্তমানে এই সব স্থানে ডোম নাই। কাজেই শূকর বলিও উঠিয়া গিয়াছে। বিশালার মন্দিরের পূজাপদ্ধতি তন্ত্রমতেই হয়। পাঁচটী মুণ্ড যে রত্নবেদীতে কি করিয়া স্থান পাইল তাহা বলা কঠিন। এখান হইতে ৬।৭ মাইল দূরে সারুল গ্রামেও ঐ রকম পাঁচটী মুণ্ড আছে। এই পঞ্চমুণ্ড বৌদ্ধ "ধর্ম্মঠাকুরের" অঙ্গস্বরূপ হইতে পারে। তবে এই মন্দিরের দেবী বিশালার সহিত পঞ্চমুণ্ডের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনে হয়। আমাদের ছেলেবেলায় অনেকের মুখে কমলাকান্ত রচিত পদাবলী শুনিতাম। বর্ত্তমানে সেই গান আর শুনিতে পাই না; প্রাচীন লোকদের অভাবে বহু পদাবলী লুপ্ত হইয়াছে। এখান হইতে ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা পূর্ব্বোত্তর কোণে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি সেখানে কখনও যাই নাই।'

আশ্রম হইতে এক ক্রোশ উত্তরে গ্রামের ভিতর একটী মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মন্দির সম্বন্ধে স্বামীজী বলিলেন—'ঐ গ্রামের নাম কয়রাপুর। ঐ মন্দিরে প্রস্তর নির্ম্মিত চতুর্ভুজা দেবী আছেন। দেবীর পদতলে এক কুম্ভকারের মূর্ত্তি। জনপ্রবাদ এই যে, কোন ব্রাহ্মণ-বধূ শ্বশুর গৃহ হইতে পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন। কয়রাপুরের মন্দির যেখানে অবস্থিত সেখানে বধূ উপস্থিত হইলে ঐ গ্রামের এক

কয়রাপুরের মন্দির।

ভক্ত কুম্ভকার তাঁহাকে ভগবতী বলিয়া চিনিতে পারে। এই স্থানে কুম্ভকার দেবীর পা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। এই দেবী মূর্ত্তিকে সারা বৎসর জলে ডুবাইয়া রাখা হয়, তারপর শারদীয়া পূজার সময় উহা পুকুর হইতে তুলিয়া অঙ্গরাগ করিয়া সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে মহাসমারোহে দেবীর পূজা, হোম, বলি প্রভৃতি হয়। এই মন্দিরটী বহু প্রাচীন।'

এইভাবে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া স্বামীজী আমাকে বিশ্রামের জন্য উত্তর দিকে অতিথি গৃহে রাখিয়া গেলেন। আমি একাকী সেই গৃহে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম; আমি বিশ্রাম করিব কি? আমার দিবানিদ্রার অভ্যাস একেবারেই নাই। তখন যদি বিশালাক্ষী মন্দিরে যাইতে পারিতাম তবে আমার প্রকৃত বিশ্রাম হইত। মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠার সহিত স্বামীজীর গৃহের দিকে তাকাই, আর চারিদিকের খোলা ডাঙ্গার ভীষণ চিত্র দেখি। এই সকল ডাঙ্গায় এক সময়ে ডাকাতেরা পথিককে ঠেঙ্গাইয়া মারিত। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটী গ্রাম দেখিতে পাইলাম। স্বামীজীর নিকট শুনিয়াছি ঐ গ্রামের নাম গঙ্গাবাজার বা নূতন গ্রাম। ওখানে গোয়ালারা বাস করে।

বেলা চারিটার সময় স্বামীজী আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া তাঁহার নিজ গৃহে লইয়া গিয়া চা ও মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন। তারপর তিনি নিজে হাতমুখ ধুইয়া জলযোগের পর আমাকে সঙ্গে করিয়া বিশালাক্ষীর মন্দিরের দিকে চলিলেন। আশ্রম হইতে পূর্ব্বদিকে পাঁচ মিনিটের পথ হাঁটিলে বিশালার মন্দিরে পৌছা যায়। ক্ষুদ্র একটা ডাঙ্গা পার হইয়া পশ্চিম দিকের সরু গলি দিয়া আমরা উভয়ে কমলাকান্তের আসনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। স্বামীজী অতি স্নেহের সহিত

বিশালাক্ষী মন্দিরে।



পৃঃ ১০ কমলাকান্তের আসন (চান্না)

আমাকে আসনের ইতিহাস বলিলেন। ভক্তিভরে সাধকের আসন স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। বিলাতী মাটী (Cement) দিয়া আসন খানা বাঁধান হইয়াছে। মাঝখানে একখানি শ্বেত প্রস্তরের উপর কাল অক্ষরে চারিটী পংক্তি উৎকীর্ণ আছে—

সাধক প্রবরস্যাস্থা-
পদপঙ্কজ সেবিনঃ।
আসনং কমলাকান্ত-
স্যাত্রৈবাসীদ্ দ্বিজন্মনঃ ॥.

শ্বেত প্রস্তর খানি পরিমাণে একবর্গ ফুট। সম্পূর্ণ আসন খানি ৫ × ৩ ফুট। উত্তর ও দক্ষিণে জোর শিমুল গাছের মাঝখানে আসন খানি অবস্থিত। ইহা ছাড়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে তেঁতুল, শিমূল ও তালগাছ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই আসন বিলাতী মাটীতে বাঁধাইয়া একখানি শ্বেত প্রস্তরের উপর শ্লোক উৎকীর্ণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার টোলের কোন পণ্ডিত এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। তন্ত্রে এক-মুণ্ডী, পঞ্চমুণ্ডী ও শতমুণ্ডী আসনে বসিয়া ইষ্টসাধনকে মুণ্ডসাধন বলা হয়। এই আসন যে কত মুণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা কেহই জানেন না। সাধারণ লোকে এই আসনকে শুধু "কমলাকান্তের আসন" বলিয়া অভিহিত করে। এই আসনের ডানদিকে (মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে) একটী জলশূন্য পুকুর বা ডোবা আছে।

আসন খানা বিশিষ্টভাবে দর্শন করিয়া আমরা মূল মন্দিরের দক্ষিণের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সাদা চূণকাম করা মন্দিরটী দেখিতে সাধারণ চণ্ডী দালানের মত, ইহার গঠনপ্রণালীতে কোনই বিশেষত্ব নাই। বর্দ্ধমানাধিপতির মতে 'এই মন্দির বর্দ্ধমাননিবাসী মানিকরাম বাবু প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গঠনপ্রণালী তান্ত্রিকভাবে নির্ম্মিত। ঐ

মন্দির কোন্ সময়ে যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।' আমি মন্দিরের মাপ লইলাম। সম্মুখের বারান্দাটী পাশে দুই হাত, মাঝখানে তিনটী খিলান আছে। সম্পূর্ণ মন্দিরটী পাশে সাড়ে দশ হাত, দৈর্ঘ্যে এগার হাত এবং উচ্চতায় আট হাত। ভিতরকার ছাদে ১২টী কাঠের বর্গা আছে। মন্দিরের একটী মাত্র দরজা, তখন উহা বাহির হইতে শিকল দিয়া ভেজান ছিল। স্বামাজী মন্দিরের বাহিরে রহিলেন, আমি শিকলটী খুলিয়া মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। পশ্চাদ্‌ভাগের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে একখানি রত্নবেদী সংলগ্ন রহিয়াছে। সম্ভবতঃ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় এই রত্নবেদীতে তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি ছিল। এখন আর সেই মূর্ত্তি নাই। বর্ত্তমানে বেদীর উপর কাল রঙের মাটীর পাঁচটী ডিম্বাকৃতি মুণ্ড দেখা যায়,—উহাদের মাথায় টোপর আছে। মূর্ত্তিগুলির মুখ হা করা,—নাসিকা, ভ্রূ, চক্ষু সবই আছে, তবে যেরূপ ভীষণ আকৃতি বলিয়া পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, দেখিয়া সেইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইল না। সম্ভবতঃ ইহা ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি হইবে।* এই পঞ্চমুণ্ড ধ্যানিবুদ্ধের মূর্ত্তি কিনা তাহাই বা কে বলিবে? এমনও হইতে পারে যে, উত্তরকালে বিশালাক্ষী মন্দিরের রত্নবেদীতে বৌদ্ধ ডোমেরা ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবে। এই মন্দির বিশালাক্ষীর, এখানে পুরোহিত তন্ত্রমতে দেবী বিশালাক্ষীর পূজা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। 'তন্ত্রসারের' ধ্যানেই দেবীর পূজা ও ন্যাস হয়। পাঁচটী মুণ্ডের একটী মুণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেবাইতেরা নূতন অপর একটী মুণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। বেদীর নীচে পূর্ব্বদিকে ভৈরবনাথের কতকগুলি ছোট বড় মাটীর ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* বিস্তারিত আলোচনা 'কমলাকান্ত প্রসঙ্গের' অন্তর্গত 'বিশালাক্ষী মন্দির' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

দেবীকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া আমি মন্দিরের দরজাটী বন্ধ করিয়া বাহিরে আসি।

মন্দির ও তৎসংলগ্ন জমী দেখিয়া আমরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ভৈরব-নাথের আসন দেখিতে যাই। ইহা একডালবিশিষ্ট একটী বটগাছের নীচে অবস্থিত। ইহার গুঁড়ি সরল ও দীর্ঘ। এই বটগাছটী অতি প্রাচীন। ভৈরবনাথের ভোগ গাঁজা, মদ, মাগুর মাছের ঝোল ও খেচরান্ন দিয়া হয়। এখানে ভোগ কদাচিৎ হয়, কিন্তু যখন হয় তখন ঐ সব উপকরণ দিবার রীতি আছে।

ভৈরবনাথের আসন।

ভৈরবনাথ দর্শনের পর আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়া উত্তরে খড়ি নদীর তীরে পঞ্চমতলা বা পঞ্চাননতলা দেখিতে যাই। এই স্থানে একটা বটগাছ আছে। বৃক্ষটী বহুদিনের পুরাতন। উহা ঐ স্থানে যে কতদিন হইতে বিরাজিত তাহা কেহই বলিতে পারে না। ইহা শিবপুর রাজোদ্যানের 'বো' বৃক্ষ অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। ইহার প্রথম সময়কার মূলটী এখন নাই। বোঁয়াগুলি স্তম্ভের মত বৃক্ষের শিরোভাগ রক্ষা করিতেছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামে যখন ওলাউঠা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয় তখন গ্রামবাসিরা এখানে আসিয়া পূজা দেয়। হিন্দুরা এই বৃক্ষের একটী পাতাও ছিঁড়েনা, তবে সাঁওতালেরা ডালপালাও কাটিয়া থাকে।

পঞ্চাননতলা।

মন্দির, আসন প্রভৃতি দেখিয়া এইবার আমরা দক্ষিণে চান্নার দিকে অগ্রসর হইলাম। বাবুভাঙ্গা, নবাবী আমলের বর্দ্ধমান-মুর্শিদাবাদ রাস্তা (বর্ত্তমান জেলাবোর্ডের সাম্‌রা চান্না বর্ত্ম) অতিক্রম করিয়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে পৌছিলাম। রাস্তায় গ্রামের দুইটী বালক আমাদের সঙ্গী হইয়াছিল। গ্রামের পূর্ব্বাংশে একটী ডোবার ধারে একটী ডোম বিধবাকে দেখিয়া

চান্না গ্রামে।

স্বামীজী বলিলেন—'দেখ, তোমার ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরটী এই বাবু দেখিবেন। তুমি মন্দিরের দিকে একবার এস।' স্বামীজীর কথামত বিধবাটী আমাদিগকে একখানা চালা ঘরের দিকে লইয়া গেল। ইহাই ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শনস্বরূপ বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম শ্রী-ধর্ম্মের (বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম) পরিবর্ত্তে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। মন্দিরের ভিতর বিশালাক্ষী মন্দিরের মুণ্ডের মত একটী ছোট মুণ্ড দেখিতে পাইলাম। এই মুণ্ডই ধর্ম্মঠাকুর। মুণ্ডটী দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা সমস্যার নিরাকরণ হইল বলিয়া মনে হইল। এখন আমার মনে হইতেছে হিন্দুর বিশালাক্ষী মন্দিরে বৌদ্ধযুগের অবসানে ধর্ম্মঠাকুরের পাঁচটী মুণ্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। কবি ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' পড়িলে মনে হয় যে, ধর্ম্মপূজা সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা। ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে 'ধর্ম্মমঙ্গলের' সম্বন্ধ বড় বেশী নাই।

ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির দেখিয়া আমরা গ্রামের ভিতর গলি দিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। এখানে প্রায় প্রতি গৃহেই শিবমন্দির আছে। পশ্চিম দিকে চলিবার সময় ব্রাহ্মণপাড়ার বামদিকে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী দেখিতে পাইলাম। ইঁহারই গৃহে স্বামীজী 'সাধন পঞ্চক' পুথীখানা পাইয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর একাংশে কমলাকান্তের 'টোলবাড়ী' ছিল, বর্ত্তমানে উহা গোয়াল-গৃহে পরিণত হইয়াছে। জনশ্রুতি মতে এখানেই সাধক বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া অধ্যাপনার কাজ করিতেন। অনেক গুলি গলি ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা স্বামীজীর বাড়ীর বহির্ভাগে গিয়া দাঁড়াইলাম। এখানে স্বামীজীর বৃদ্ধা জননীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমরা কমলাকান্তের মাতামহের বাস্তুভিটা দেখিতে পশ্চিম দিকে ব্রাহ্মণপাড়ায় চলিলাম। বর্ত্তমানে মাতামহের

বাস্তুভিটা শূন্য, সেখানে কেহই নাই। এই বংশের একঘর জ্ঞাতি আছেন, তাঁহাদের নাম জগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা সাধকের মাতামহবংশের পরিত্যক্ত শূন্য বাস্তুভিটার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রবাদ এই যে, কমলাকান্ত শৈশবে পিতৃহীন অবস্থায় কাল্না হইতে মাতুলালয়ের এই বাস্তুভিটায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভিটার উত্তর দিক্ দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে রাস্তাটী গিয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকে আড়াই কাঠা জমীর উপর এই বাস্তুভিটা। ভিটার পূর্ব্বোত্তর কোণে একটী বৃহৎ জলপূর্ণ ডোবা আছে। পূর্ব্ব দিকে ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা ব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। ভিটার দক্ষিণে আম, তাল ও আমড়া গাছ এবং একটী ক্ষুদ্র ডোবা আছে। এখানেই আমাদের কমলাকান্তের মাতুলালয় চান্না গ্রামের পুণ্যস্থান গুলি দেখা শেষ হইল। ফিরিবার পথে স্বামীজী একজন লোককে ডাকিয়া আমার সঙ্গে দিয়া দিলেন। ৫-৪০ মিনিটের সময় আমরা চান্না পরিত্যাগ করি। লোকটী নূতন একটী রাস্তা ধরিয়া আমাকে লইয়া চলিল। মাঠে আসিতেই আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। পশ্চিমাকাশে বজ্রের গম্ভীর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা দেখিতেছি। এইভাবে মেঘের আড়ম্বরের ভিতরে ভয়ে ভয়ে দিগন্তব্যাপী মাঠ পার হইতেছি। বৃষ্টি অধিক পড়িতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে তড় বড় করিয়া দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে, আবার থামিয়া যাইতেছে। আমরা মাঠের উপর দিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিতেছি, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ আমরা অর্দ্ধ ঘণ্টায় পার হইলাম। ৬-১০ মিনিটের সময় আমরা জংশনে পৌঁছি এবং তথা হইতে ৬—২৩ মিনিটের 'ডাউন সিউরী' ট্রেনে চড়িয়া বর্দ্ধমান ফিরি।

* * * *

* * * *

২২শে চৈত্র। রবিবার। সকাল বেলা ৭টার সময় মানদা বাবুর বাড়ী যাই। সেখানে গিয়া দেখি তিনি কোটালহাট গমনের সমস্তই ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছেন। আরামকেদারায় বসিতেই মানদা বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে এক পেয়ালা চা ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিলেন। জলযোগের পর মানদা বাবুর সহিত তাঁহার গাড়ীতে চড়িয়া রাণীগঞ্জ রোডে আসিলাম। এখানে তাঁহার ঔষধালয়,—তিনি কয়েকটী রোগীকে পরীক্ষা করিয়া সাড়ে আটটার সময় আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া খোস্‌বাগানের দিকে চলিলেন। মাঝখান হইতে তিনি একটী ক্যামেরা লইয়া আসিলেন। তারপর মহাজনটুলি, বড়বাজারের ভিতর দিয়া গাড়ী পশ্চিম দিকে ছুটিয়া চলিল। বড়বাজারের একটী বাড়ী হইতে ফটো-গ্রাফার বাবু আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার নাগ। ইনি খোস্‌বাগান রোডে থাকেন। মানদা বাবুর সহিত ইঁহার বিশেষ আত্মীয়তা। শুনিয়াছি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের চিত্রশিল্পী। মানদা বাবু আমাদের পরস্পরের সহিত একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় করাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী খানা শ্যামনগর, হাঁসপাতাল, মহতাব্ মঞ্জিল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পশ্চাতে রাখিয়া ঘন জঙ্গলাবৃত পল্লীর দিকে ছুটিয়া চলিল। আমরা ৯টার সময় কোটাল-হাটে পৌছিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়াই জঙ্গলাবৃত একটী পরিত্যক্ত ভিটা ও তৎসংলগ্ন একখানা দোচালা টিনের মন্দির দেখিতে পাইলাম। এই ভূমিখণ্ড রাস্তার বামপার্শ্বে অবস্থিত। সরু একটী গলি দিয়া আমি সূর্য্য বাবুর সহিত মন্দিরের দিকে চলিলাম। এই সময়ে মানদা বাবু দুই

কোটালহাটে।

সাধক কমলাকান্ত।



পৃঃ ৬০

বাস্তুভিটা

(কোটালহাট)



একজন স্থানীয় লোককে ডাকিবার জন্য গ্রামের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমি রাস্তায় একটী ছোট ঝোপের নীচে পাদুকা রাখিয়া কালীমন্দিরের বারান্দায় গিয়া উঠিলাম। মন্দিরের ছাদটী টিনের দোচালা। বর্দ্ধমানাধিপতি ৪৫০৲ টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখানেই সাধক কমলাকান্তের 'জপের ঘর' ছিল, তাঁহার পদাবলীতে আছে—

'আমার জপের মালা, ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে রইল ঠাঙ্গা॥ *'

এই জপের ঘর বা বর্ত্তমান মন্দিরের দুই দিকে (পূর্ব্ব ও পশ্চিম) দুইটী কক্ষ আছে। মন্দিরের বারান্দায় উঠিবার চারি ধাপ সিঁড়ী। মন্দিরটী তিনভাগে বিভক্ত, দুই দিকে দুইটী কুঠরী ও মাঝখানে সম্মুখদিকে খোলা একটা কুঠরী আছে। এই মাঝখানের কুঠরীতে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকের অমানিশায় ৺ শ্যামাপূজা হয়। মূর্ত্তির শুধু বেণা ও কাঠাম দেখিতে পাইলাম। দেবী বিসর্জ্জনের পর বেণাটী ঐ স্থানে তুলিয়া রাখা হয়। মাটীর বেদীর উপর মুণ্ডশূন্য খড়ের মূর্ত্তির সম্মুখে একটী ঘট এবং বিগত ৺শ্যামা পূজার শুষ্ক ফুল ও বেলপাতা এখনও পড়িয়া আছে। মন্দিরের সম্মুখে একটী খেজুর গাছ। মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ২২ হাত ও প্রস্থে ১১ হাত। জনশ্রুতি এই যে পূর্ব্বদিকের কুঠরীতে সাধক জপতপ করিতেন এবং সেখানেই নাকি পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল। এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাই নাই। মন্দিরের পশ্চাতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটী বেল গাছ, এই বেল গাছের নীচে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল। এই সিদ্ধাসনে বসিয়া বীরসাধক কমলাকান্ত মায়ের ধ্যানে সমাহিত থাকিতেন। শুনিলাম এই পঞ্চমুণ্ড কাল্‌নায় ছিল, সাধক উহা কোটালহাটে লইয়া

* ঠাঙ্গা=লাঠী।

আসেন। বেলগাছের তলায় শিকড়ের উপর পূর্ব্ব দিকে একখানা কাল পাথর আছে, স্থানীয় লোকেরা এই পাথরখানাকে 'ভৈরব' বলে। একটী লিঙ্গ মূর্ত্তিও আড়ভাবে বেলতলায় পড়িয়া আছে। বেলগাছের গুঁড়ি হইতে চারি হাত উপরে দুইটী বড় ডাল, সেই ডাল দুইখানা হইতে আরও তিনটী ডাল বাহির হইয়াছে। আমি যখন বেলগাছটী বিশিষ্টভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে কাল্‌নার রাজ-কাছারীর পরিদর্শক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মানদা বাবুর সঙ্গে বেলগাছের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার সঙ্গে কমলাকান্ত সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিলাম 'বেলতলার পঞ্চমুণ্ডী আসন সাধক কমলাকান্ত কাল্‌না হইতে এখানে আনিয়াছিলেন।' অপর একটী স্থানীয় ভদ্রলোক বলিলেন 'জপের ঘরেই পঞ্চমুণ্ডী আসন এখনও বিদ্যমান আছে।'

জপের ঘর বা বর্ত্তমান মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে জঙ্গলাকীর্ণ বাস্তভিটা, উহার মাঝখানে পরিত্যক্ত ভিটার ঢিপিটী এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভিটা ও তৎসংলগ্ন জমীর ঘোর দুর্দ্দশা। যে দিন সাধকের কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃগান এই পুণ্যস্থানকে মুখরিত করিত, সে দিন আজ বিস্মৃত স্বপ্নের মত বলিয়া বোধ হয়। কালের কি কুটিল গতি। এই জঙ্গলাকীর্ণ বাস্তভিটার দুর্দ্দশার বিষয় ভাবিতে গেলে প্রকৃতই চক্ষে জল আসে। বর্দ্ধমানের শাখা-পরিষদ্ এই বাস্তভিটার সংরক্ষণ করিয়া ধন্য হউন। এই জমীর পরিমাণ ১২ কাঠা হইবে। ইহার ভিতর ও বাহিরে চারিদিকে অনেকগুলি খেজুর গাছ ও দুই একটী তালগাছ আছে। পশ্চিমদিকে দুইটী তালগাছ ও তেওয়ারী বাবুদের দুর্গাবাড়ীর ভগ্নস্তূপ এবং পূর্ব্বদিকে জঙ্গলের ভিতর রঘু বাবুর রাসমঞ্চ অবস্থিত।

লোকমুখে শুনিলাম বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর প্রতি বৎসর ৺শ্যামা-



পৃঃ ৩৩

পঞ্চমুণ্ডী আসন

(কোটালহাট)

পূজার সময় কুড়ি টাকা সাহায্য করেন। এখানে বৎসরে একদিন মাত্র পূজা হয়। কাঞ্চননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং এখানে আসিয়া শ্যামাপূজা করেন। ইনি কলিকাতায় সদাগরী আফিসে চাকরী করিয়া থাকেন।

নাগবাবু সর্ব্বপ্রথমে মন্দির বা জপের ঘরের ফটো লইলেন। তারপর বেলগাছ বা পঞ্চমুণ্ডী আসন ও বাস্তুভিটার ফটো তোলা হইল। আমাদের ফটো তোলা শেষ হইতেই মানদা বাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'নিকটেই কমলাকান্তের ত্রিমুণ্ডী আসন আছে। চলুন সে স্থান দেখিয়া ফটো তুলিবেন।' আমরা ক্যামেরাটী সহিসের মাথায় তুলিয়া দিয়া একটী আঁকা-বাঁকা গলি ঘুরিয়া বোরহাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বোরহাটে ত্রিমুণ্ডী আসন। জনশ্রুতি এই যে, এখানে একটী নিমগাছের নীচে ত্রিমুণ্ডী আসন আছে। এই আসনে বসিয়া কমলাকান্ত সময়ে সময়ে জপতপ করিতেন। তন্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী চণ্ডাল মুণ্ড, শৃগাল মুণ্ড ও বানর মুণ্ড মাটীর নীচে পুঁতিয়া ত্রিমুণ্ডী আসন রচনা করিতে হয়। কমলাকান্তের পর বোরহাটনিবাসী ৺লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় এখানে উক্ত আসনে বসিয়া পূজা ও জপতপ করিতেন। আজ তিন বৎসর হইল রায় মহাশয় ৯০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভট্টব্রাহ্মণ ছিলেন। রায় মহাশয়ের পরিবার এখনও জীবিতা আছেন,—তাঁহারই নিকটে উপরোক্ত বিষয়টী শুনিয়া মানদা বাবু আমাকে বলিলেন। এই সময়ে রাজকলেজের ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র রায় মহাশয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, 'হাঁ, আমরা শুনিয়াছি এই নিমগাছের নীচে কমলাকান্তের ত্রিমুণ্ডী আসন আছে। সাধক কোটালহাট ও বোরহাট এই দুই স্থানেই সাধনা করিতেন। নিমবৃক্ষসংলগ্ন বাড়ীখানা শ্রীযুক্ত এককড়ি ভট্টাচার্য্য

মহাশয় (রাজবাড়ীর তহশীলদার) সখাউদ্দিন দপ্তরীর নিকট হইতে খরিদ করেন। আমার নিকট সাধকের হাতের লেখা একখানা গানের বই ছিল . বর্ত্তমানে উহা খুঁজিয়া পাইনা।' ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে (পূর্ব্বোত্তর কোণে) গলির মোড়ে অতি বিশাল কালরংএর একটী নিম-গাছের গুঁড়িটী মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার পরিধি বা বেড় ৬।৭ হাত হইবে। এই গুঁড়িটীর দক্ষিণে একটী করবী গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। নিমগাছের গুঁড়ির নীচ দিয়াই সদর রাস্তা, রাস্তার উত্তর পার্শ্বে একটী বড় তালগাছ আছে। নাগবাবু এই ত্রিমুণ্ডী আসনের একখানা ফটো তুলিলেন।

৯-৫৫ মিনিটের সময় বোরহাটের কাজ শেষ করিয়া আমরা পুনরায় কোটালহাটে ফিরিয়া যাই এবং তথা হইতে ১০ ঘটিকার সময় গাড়ীতে চড়িয়া ১০-২০ মিনিটে বাসায় ফিরিয়া আসি।

এতদিনে আমার বাসনা পূর্ণ হইল, সাধক কমলাকান্তের লীলাক্ষেত্র-সমূহ দর্শন ও সেই পুণ্যস্থানগুলির ফটো সংগ্রহ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। এই কাজ যে আমি এত সহজে শেষ করিতে পারিব এরূপ আশা ছিলনা। সাধকের আশীর্ব্বাদ ও মানদা বাবুর সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় আমি এই ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া মনে করিতেছি। দেবোপম মানদা বাবু ও নাগবাবুর সাহায্য ভিন্ন এই কাজ আমি কিছুতেই শেষ করিতে পারিতাম না। মানদা বাবু তাঁহার ধর্ম্ম জীবনে প্রকৃত শ্রেয়কে লাভ করুন এই আমার প্রার্থনা।

* * * *

* * * *

* * * *

২২শে চৈত্র, রবিবার, অপরাহ্ন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় আমি কয়েক খানা গ্রন্থের অনুসন্ধানে বর্দ্ধমান রাজ-ফ্রি-পাবলিক গ্রন্থাগারে

সাধক কমলাকান্ত



ত্রিমুণ্ডী আসন

(যোরহাট)

Harinath Press, Dacca.

গিয়াছিলাম। সাধক কমলাকান্ত সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ বা পুথী আছে কিনা অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্দ্ধমান শহরের এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারে সাধকের জীবনী বা পদাবলী সম্বন্ধে দুষ্প্রাপ্য কোন গ্রন্থই পাওয়া গেল না। যেই দেশে সাধকের লীলাস্থল ছিল, সেই দেশের জনসাধারণ নিজেদের সাধকের কোন সংবাদই রাখেন না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? সাধকের পরিত্যক্ত অনেক জিনিষই উপযুক্ত কালে সংগৃহীত হইতে পারিত, আজও ইচ্ছা করিলে তাঁহারা কমলাকান্তের স্বহস্তলিখিত দুই একখানা পুথী সংগ্রহ করিতে পারেন। শুনিয়াছি বর্দ্ধমানে সাহিত্য-পরিষদের একটী শাখা আছে, আমি সেই শাখা-পরিষদের সদস্য মহাশয়দের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব কবিদের 'রূপান্তর' ও 'ধারা' এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা লইয়াই অনেকে ব্যস্ত, শাক্ত কবিদের কথা তাঁহাদের চিন্তার ধারায় আসিবে কি না জানিনা। যাহাহউক এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আমি কাহাকেও বিরক্ত করিতে চাইনা। বর্দ্ধমানের শাখা-পরিষদ্ যাহা খুসী করিবেন, নিজের জেলার স্থানীয় ইতিহাস ছাড়িয়া তাঁহারা অন্য জেলার ইতিহাস সংকলন করিলেও এই ক্ষেত্রে আমার কোন কথাই বলিবার অধিকার নাই।

রাজগ্রন্থাগারে।

এই গ্রন্থাগারে কমলাকান্ত সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ বা পুথী না পাইলেও আমি একেবারে বিফল মনোরথ হইয়া আসি নাই। এখানে একটী ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার নাম শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য, বয়স ২৮।২৯ হইবে। ইঁহার বাড়ী বোরহাটে; ইনি পূর্ব্বে ঠিকাদারী কাজ করিতেন, বর্ত্তমানে পৌরাহিত্য করিয়া থাকেন; লোকটী সাদাসিদে ধরণের, বড় অমায়িক। কমলাকান্ত সম্বন্ধে নানা কথা ইঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,'আজ সকাল বেলায় আপনাকে কমলাকান্ত কালীতলায় ডাক্তার বাবুর সহিত দেখিয়াছিলাম। আমার বাড়ী বোর-হাটে, কালীতলার নিকট। পূর্ব্বে আমি ঠিকাদারী করিতাম, বর্ত্তমানে যজনযাজন করি। আমি কাঞ্চননগর গ্রামে কমলাকান্তের হাতের লেখা একখানি পুথী দেখিয়াছি। উহাতে তন্ত্রোক্ত লতা-সাধনের বিষয় আছে। পুথীখানা খুব মূল্যবান্, উহা পড়িলে সাধকের সাধন-প্রণালীর একটা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত জানিতে পারিবেন। পুথী-খানা ৺ ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। ভট্টাচার্য্য-গৃহে তাঁহার শাশুড়ী ও শালাজ আছেন। ইঁহারা কিছুতেই পুথীখানা কাহাকেও দেখিতে দিতে চান না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্য কলিকাতার কোন সদাগরী আফিসে চাকরী করেন। ইনি বার্ষিক ৺ শ্যামা পূজা করিয়া থাকেন।' *

ভট্টাচার্য্যের মুখে কমলাকান্ত কথা।

---

* শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা হইতে ৫ই নবেম্বর (১৯২০) তারিখে আমাকে লিখিয়াছেন, 'উপস্থিত আমি ৺কমলাকান্তের কালীপূজা প্রায় ২০ বৎসর করিয়া আসিতেছি। আমার পূর্ব্বে আমার শ্বশুর ৺ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার জামাতা বলিয়া (তিনি অপুত্রক থাকায় এবং একমাত্র কন্যা থাকায়) সমস্ত বিষয় উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইয়াছি। উক্ত কালীপূজার ভার ও আমার উপর আছে। এই পূজার কালে বর্দ্ধমান রাজষ্টেট্ হইতে ২০৲ টাকার বরাদ্দ আছে এবং বর্দ্ধমানের তেওয়ারী মহাশয়দিগের নিকটও বাৎসরিক কিছু পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সাধারণ যাঁহার যাহা ইচ্ছা প্রণামী দিয়া থাকেন। এই প্রকারে মায়ের পূজা সমাধা হইয়া আসিতেছে। বাড়ী-ঘর প্রস্তুত ও মেরামত রাজষ্টেট্ হইতে হয়। পূর্ব্বাপর পূজকদিগের নাম আমি বিশেষ কিছু জানি না। যদি সংগ্রহ করিতে পারি আসিয়া লিখিব। আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচায্য। তিনি অধ্যাপক, দেশেই থাকেন। আমাদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়।'

'আমার শ্বশুর ৺ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য আজ প্রায় বিশ বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যখন মারা যান তখন আমার বিবাহ হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। আমার স্ত্রী একটী মাত্র কন্যা প্রসব করিয়া সেই দিনই দেহত্যাগ করেন।'

কাল্‌নায় কমলাকান্ত ও শ্যামাকান্ত দুই সহোদর ছিলেন। সেখানকার রায়েরা শ্যামাকান্তের দৌহিত্রবংশীয়। বর্ত্তমানে রায়বংশের কেহই জীবিত নাই। শ্যামাকান্তের স্ত্রী সাধকের জপের মহাশঙ্খমালা, সুধাপাত্র, পুথী ও হাতের লেখা পদাবলী ৺ভোলানাথ ভট্টাচার্য্যকে দিয়াছিলেন। পুথী ও পদাবলী রাখিয়া জপের মালা ও সুধাপাত্র ইনি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেন। শুনিয়াছি উহাতে এক হাজার পদাবলী ছিল। সম্প্রতি মাত্র ২।৪ খানা পাতা আছে। লতাসাধনের পুথীখানা আমি দেখিয়াছি, উহা তালপাতার আকারে ২৪।২৫ পাতা হইবে।'

'প্রবাদ এই, তেজগঞ্জের দে তাঁতি বাবুরা একবার শ্যামাপূজার রাত্রে সাধকের পূজা দেখিতে কোটালহাটে আসিয়াছিলেন। তখন কমলাকান্ত দামোদরের তীরে কাঠগোলার ঘাটে শ্মশানে বসিয়া জপতপ করিতেন। এদিকে মায়ের পূজার কোনই আয়োজন নাই। রাত্রি তখন ১২টা। ভৃত্য ৺পূজার প্রতিমা, সাড়ী, ঘট, নৈবেদ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সাধককে সংবাদ দিল। সাধক বলিলেন 'মায়ের বারাণসী সাড়ী, সোণার নথ ও বলির মহিষ কোথায়?' ভৃত্য সাধকের মুখে পূজার উপকরণের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। এই সময়ে বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মায়ের স্বপ্নাদেশ হইল। মহানিশায় ৺পূজার সময় দেখা গেল যে রাজবাটী হইতে বারাণসী সাড়ী, সোণার নথ ও বলির জন্য একটী মহিষ প্রেরিত হইয়াছে। তখন সাধক মায়ের পূজা শেষ করিলেন।'

'কোন এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে একবার বড় রকমের একটা ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। এই ভোজে বহু লোকের নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু উন্মাদ ও শ্মশানবাসী মনে করিয়া গৃহস্থ সাধক কমলাকান্তকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। ব্রাহ্মণগণ আহারে বসিয়াছেন, মাংস খাইবার সময় তাঁহারা দেখিলেন ছাগমাংস গোমাংস তুল্য হইয়াছে। ঐ মাংস

তাঁহারা আর স্পর্শ করিলেন না ; তারপর বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল যে বাড়ীর কর্ত্তা ইচ্ছা করিয়া এই নিমন্ত্রণে কমলাকান্তকে বাদ দিয়াছিলেন। তখনই গৃহস্থ সাধকের নিকট ছুটিয়া গিয়া ক্ষমা চাহিলেন। কমলাকান্ত গৃহস্থের কাতর আহ্বানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সেখানে আহার করিতে আসিলেন। তখন দেখা গেল ছাগমাংস অতি উপাদেয় হইয়াছে।'

'কমলাকান্ত ভাবের মুখে গান রচনা করিতেন এবং এক সেক্‌রা গানের সুর দিতেন। কোটালহাটে জপের ঘরের পূর্ব্বোত্তর কোণের বেলগাছের নীচে যে কাল পাথর খানা দেখিয়াছেন, উহা ভৈরব। ইনি আসন রক্ষা করেন। পূর্ব্বের কুঠরীতেও অনাদিলিঙ্গের একখানা পাথর আছে। তাঁহাকেও ভৈরব বলে। কমলাকান্ত কালীতলার পশ্চিমদিকে যে ভগ্ন বাড়ী আছে উহা তেওয়ারী বাবুদের দুর্গাবাড়ী। বেলগাছের তলায় আড়ভাবে একখানা লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, উহা পূর্ব্বে তেওয়ারী বাবুদের দুর্গাবাড়ীতে ছিল। একদিন দেখা গেল রাস্তার উপর ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। আমি ঐ মূর্ত্তি রাস্তার উপর হইতে তুলিয়া আনিয়া বেলগাছের নীচে রাখিয়া দিয়াছি।'

'বর্ত্তমানে কালী-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটা পাকা কুঠরী আছে, ইহাই সাধকের জপের ঘর ছিল। ঐ কুঠরীতে আসন, ভৈরব (অনাদিলিঙ্গ) ও একটী ঘট আছে। ৬ শ্যামা পূজার দিন জপের ঘরেও পূজা হয়। শ্যামা মূর্ত্তির সম্মুখে একটা বলি হয় এবং বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডী আসনের নিকটও একটী ছাগ বলি হইয়া থাকে। পঞ্চমুণ্ডীর পূজা জপের ঘরেই হয়।'

'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় ডাকাতেরা কমলাকান্তকে আক্রমণ করিয়াছিল। শুনিয়াছি ঐ ডাকাতেরা সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইহাদের বংশধরেরা প্রতি বৎসর দীপালীর রাত্রিতে ৬ শ্যামা পূজার সময় বলির জন্য একটী

ছাগ কোটালহাটে কালীতলায় পৌছাইয়া দিত। পরিশেষে ছাগের পরিবর্ত্তে একটী কুমড়া দিত, আমি এই কুমড়া বলি দেখিয়াছি। আজ প্রায় ১০।১২ বৎসর যাবৎ ইহাদের কেহই আর আসে না। সম্ভবতঃ উহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে।"

এইভাবে সন্ধ্যাবেলায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কমলাকান্ত কাহিনী শেষ হইল। তিনি আমাকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে চৌকীদার গ্রন্থাগারে আলো জ্বালিয়া দিল। আমি দুই একখানা সাময়িক কাগজের পাতা উল্টাইয়া মানদা বাবুর ঔষধালয়ে সোজাসোজি চলিয়া গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি নাগবাবু কোটালহাট, বোরহাটের ফটোর নিগেটিভ প্লেট গুলি মানদা বাবুর নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। আমি প্লেট কয়খানা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম সাধকের আশীর্ব্বাদে লীলাক্ষেত্রের ছায়াচিত্র বেশ ভালই হইয়াছে। রাত্রিতে মানদা বাবুর বাসায় আহারের নিমন্ত্রণ ছিল,—সেখানে আহারাদি করিয়া শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় চলিয়া আসি।

ক্লান্ত দেহখানি শয্যার উপর রাখিয়া আমি নীরবে ভাবিতে লাগিলাম,—'এইত সাধক কমলাকান্তের লীলাক্ষেত্র, এখানে কমলাকান্তের ভাবসাধনার আলোচনা নাই কেন? সাধকের কথা তুলিলে জনসাধারণ তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে চায় না কেন? এই বিচিত্র ভাবের কারণ কি?' এই বিষয়গুলি সংক্ষেপে 'কমলাকান্ত প্রসঙ্গে' যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি।

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণের ভিতর কোটালহাটের জপের ঘর ও পঞ্চমুণ্ডী আসনের চিত্র ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল,—একদিন কোটালহাটে ঐ পঞ্চমুণ্ডীর উপর আসন পাতিয়া মহামায়ার রাঙ্গা চরণে অঞ্জলি দিয়া ভাবে গদগদ হইয়া কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন—

'আদরিণী শ্যামা মাকে, আদর করে হৃদে রাখ।
তুমি দেখ আমি দেখি, আর যেন ভাই কেউ না দেখে ॥' ইত্যাদি ॥

এ মহান্ গানের ঘাত-প্রতিঘাত দূর স্বপনের মত আমার প্রাণের মরমে রেখা টানিয়া গেল,—মনে হইল আমাকে শান্ত করিবার জন্য মা-জগদম্বা বুঝি আমার চক্ষের পাতার উপর তাঁহার অভয় হস্তখানি বুলাইয়া দিলেন। আমিও ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

* * * *

* * * *

প্রত্যাবর্ত্তন।

২৩ শে চৈত্র, সোমবার। প্রাতে ৬-৩০ টার গাড়ীতে বর্দ্ধমান ছাড়িয়া কলিকাতা রওয়ানা হই। বর্দ্ধমান-হাবড়া নূতন কর্ড লাইন দিয়া কলিকাতা পৌছি। শক্তিগড় হইতে নূতন কর্ড লাইন আরম্ভ হইয়া বেলুড়ে শেষ হইয়াছে। পরদিন বেলা ১২-৩০ টার সময় রাঁচি ফিরিয়া আসি।

কমলাকান্ত প্রসঙ্গ

কমলাকান্ত প্রসঙ্গ

মাতৃভক্ত সাধক শ্রীরামপ্রসাদের ভাব-সাধনায় দীক্ষিত হইয়া যে সকল তান্ত্রিক সাধক বাংলার ধর্ম্মজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন শান্ত সাধক শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের অন্যতম।

কমলাকান্ত—মাতৃভাব-সাধক।

কমলাকান্ত গৃহস্থ তান্ত্রিক ছিলেন, তাঁহার মতন অমন ভাবুক ও প্রেমিক সাধক বাংলা দেশে তখন অতি অল্পই ছিল। এই ভাব, রস ও প্রেমের জন্য শক্তিসাধকগণের মধ্যে কমলাকান্তের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি তন্ত্রের ভক্তি এবং ভাবের অংশ অবলম্বন করিয়াছিলেন,—অন্তরে ব্রহ্মময়ীর মাতৃভাব জাগাইয়া তোলাই তাঁহার সাধনার লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

'যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী, তার বাহ্য-সাধন কিছুই নয়।'

এই সংসারের যাহা কিছু সকলই অভিনয়, চিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মময়ী জীব সাজিয়া সংসার-নাটকে মাতিয়াছেন। যাহাদের হৃদয়ে নিয়তই ভোগবাসনার উদ্বেল তরঙ্গ উঠিতেছে তাহারা চক্ষু থাকিতেও মহামায়ার এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। শান্ত সাধক শ্রীকমলাকান্ত মায়ের এই অভিনয় দেখিয়া কোমল কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

'জাননা রে মন! পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘেরি বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়॥

* * * *

ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব যাতনা সয়॥'

যতক্ষণ সত্যময়ীর তত্ত্ব আসিয়া হৃদয় ছাপিয়া না ফেলে, ততক্ষণই জগৎ মিথ্যা, কেননা, জগৎ তখনও জগৎ। তাহার পর, সত্যস্বরূপিণী ভক্তভয়ভঞ্জিনী ত্রিভুবনমোহিনী মায়ের শ্যামসৌন্দর্য্যচ্ছটা আসিয়া যখন হৃদয় ভরিয়া যায়, সাধকের জ্ঞাননেত্র যখন মা-ময় হইয়া উঠে, তখন সংসারচিত্র মায়ের অনন্তস্বরূপে মিশিয়া যায়। শুদ্ধ শান্ত শ্রীকমলাকান্ত মা-ময় হৃদয় লইয়া মিথ্যার আবরণ হইতে সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। শ্যামা মায়ের চরণতলে তিনি বিষয় বাসনাকে অঞ্জলি দিয়া গাহিয়াছিলেন—

'তারা-চরণ কর সার, রে মানসা!
বিষয় বিরলে ত্যজ, কেন মজ মিছা ভ্রমে॥
এসেছ অসার ভবে, কেন মর মিছা লোভে;
ভেবে দেখ তুমি কার, কে আছে তোমার॥
এ ধন যৌবন পরিজন কি তোর সঙ্গে যাবে,
এমন রতন কায়া কোথা রব কোথা রবে।
কমলাকান্তেরে যদি এ সঙ্কটে নিস্তারিবে।
এখন যতনে রাখ বচন আমার, রে॥'

বীরসাধক কমলাকান্ত তন্ত্র শাস্ত্রকে সত্য বলিয়া জানিতেন, তিনি জানিতেন—

বীরসাধকের তন্ত্রে বিশ্বাস।

'নান্যঃ পন্থা মুক্তি-হেতু-রিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ।'

ইহলোক ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত এমন অন্য পথ নাই, যেমন তন্ত্রোক্ত পথ সুখ ও মোক্ষ উভয়ের নিমিত্ত হইয়াছে। তিনি শিবমুখনির্গত

অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত তন্ত্রের অনুশাসনকে ধর্ম্মজীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাই তিনি গাহিয়াছেন—

'সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।'

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া ও অবিদ্যা, এই চারি মায়েরই স্বরূপ। একা তিনি এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া সংসারে আনন্দলীলার অভিনেত্রী, আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া আপনিই তিনি উন্মাদিনী, আপনি জন্মিয়া আপনি মরিয়া, আপন শ্মশানে আপনি নাচিয়া, আপন শবে শিব হইয়া, আপনিই তিনি পরমানন্দনন্দিনী। মা আপনি পুরুষ, আপনি প্রকৃতি, আপনি মায়া, আপনি অমায়া। সাধ্যা সনাতনী মহামায়ার এই অপরূপ দেখিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

'মায়াতীতাং মায়িনীং বিশ্বমায়াং
নিত্যাং শুদ্ধাং নিষ্কলাদ্বৈতরূপাং ৷
পুনর্ম্মায়য়া বিশ্বনিস্তারহেতুং।
প্রপদ্যে সদা ত্বাং ভবাম্ভোধিসেতুং ॥'

ইহারই প্রতিধ্বনিতে সাধক শ্রীকমলাকান্ত গাহিয়াছেন—

'বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারে কর পরিত্রাণ ;
কারে, অবিদ্যা আবৃত কোরে, মোহগর্ত্তে টেনে ফেল।
জীবমাত্র শিব বটে, এ কথা অনেকে রটে ;
যে সদানন্দ তারে কেন, নিরানন্দ হতে হৈল্লো ॥
কমলাকান্তের কালি ! মনের কথা মায়ে বলি ;
কারো সুখের উপর সুখ, কারো দুঃখে কেন জনম গেল'।

কলিযুগে 'তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ।'* তন্ত্রোক্ত পথ

* মহানির্ব্বাণতন্ত্র। দ্বিতীয়োল্লাস। ২০ শ্লোক।

সুখ ও মোক্ষ উভয়ের নিমিত্ত হইয়াছে। অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের পক্ষে 'কালী' নামই সুগম সাধনা। অতি সহজে এই তন্ত্রোক্ত সাধনার প্রণালী বুঝাইয়া সাধক গাহিয়াছেন—

'সুগম সাধন বলি তোরে, ও রে! আমার মূঢ় মন! সাধরে।
যখন যাহাতে সুখে থাক, মন! তাতেই ভাব মারে॥
যদি না থাকিতে পার, মন! চিন্তামণিপুরে।
চরাচরে শ্যামা মা মোর, সকলে সঞ্চরে॥'

প্রেমানন্দে সৃষ্টির বিকাশ ও স্থিতি, শক্তি তাহার লয়। এই শক্তির মহাসাগরে ডুবিয়া পরম নির্ভরশীল শিশুর মত মহাশক্তির অনির্ব্বচনীয় ধ্বংসলীলার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সাধক কমলাকান্ত প্রসাদের অনুসরণে মাতৃরূপ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যাহা ভয়ঙ্কর, তাহার ভিতরেও সাধক বিস্তৃত বরাভয় কর দেখিয়াছিলেন। তিনি সদানন্দময়ী শ্যামা মায়ের নৃত্য দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—

মাতৃভাবসাধনা—কমলাকান্তের লক্ষ্য।

'নাচগো শ্যামা! আমার অন্তরে।
সদানন্দময়ি নাচ! চিদানন্দ উপরে॥
নাচগো নাচগো শ্যামা! নাচন দেখি;
তোমার দিগবাস অট্টহাস, গলিত চিকুরে॥' ইত্যাদি॥

প্রসাদ ও কমলাকান্তের সাধনার বস্তু প্রফুল্ল কমলোপরি উপবিষ্টা মাতৃমূর্ত্তি,—ইঁহারা উভয়েই মধুর মাতৃনামের সহিত এক অভিনব সুরসংযোগ করিয়া বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বাঙ্গালীর কণ্ঠে আকুল প্রাণময় মাতৃসঙ্গীত সঁপিয়া দিয়াছিলেন; ইঁহারা বাঙ্গালীজাতিকে এবং বাংলা ভাষাকে যে বিরাট বৈভব দিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষয়

কমলাকান্তকে বাঙ্গালী ভুলিয়াছিল কেন?

এবং অমর। তাঁহাদের গান এবং সুর বাঙ্গালী জাতিকে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ইঁহাদের মাতৃসঙ্গীত মধুর ভাবের অক্ষয় মঞ্জুষা,—এমন হয় নাই, এমন হইবে না। দেড়শত বৎসর পরেও, ইঁহাদের গান আজও বাঙ্গালীর নিকটে পুরাতন হয় নাই। এখনও সে ভাষা বাঙ্গালীর অব্যবহার্য্য নহে। ইঁহারা উভয়েই সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু শুধু একটী কারণে মনে হয় বাঙ্গালী কমলাকান্তকে ভুলিয়াছিল। দেখা যায়, আপামর জনসাধারণ যে সাধককে সহজেই জড়াইয়া ধরিতে পারে, তাঁহার ছাপ তাহাদের হৃদয়ে বিশিষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সাধক কমলাকান্তকে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর 'নিজস্ব' করিয়া কোটালহাটে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেখানে মহারাজার অনুগ্রহে* সাধককে সংসারের অভাব বিশেষ অনুভব করিতে হয় নাই, রাজানুগ্রহ সাধককে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল,—জনসাধারণ মুক্তপ্রাণে সেখানে গিয়া সাধক কমলাকান্তকে ভক্তির উপহার দিতে পারে নাই।

সম্ভবতঃ এই কারণে কমলাকান্তের মাতৃনামের সুধাধারা রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই সময়ে বাহিরের জগৎ উপপ্লাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজানুগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে সাধকের সাংসারিক জীবনের স্বচ্ছলতার সহায় হইলেও সেই অনুগ্রহ অনেক সময়ে জনসাধারণের পক্ষে নিগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। 'কালীর বেটা' সাধক শ্রীরামপ্রসাদ এই কারণেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন এই অনুগ্রহ তাঁহার ও ভক্তমণ্ডলীর মাঝখানে একটা ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া তুলিবে। ত্যাগী হইলেও ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত নানা কারণে বর্দ্ধমানাধিপতিকে ত্যাগ করিতে পারেন

* কথিত আছে, বর্দ্ধমানের রাজভাণ্ডার হইতে প্রতিমাসে কমলাকান্তকে দুইশত টাকা সাহায্য করা হইত।

নাই। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ ও কুমার বাহাদুর প্রতাপচন্দ্রের সাধনা ছিল, তাঁহারা সেই সাধনার ভিতরে কমলাকান্তকে ডুবাইয়া রাখিতেন। ইঁহাদের এই মহাসম্মেলন বর্দ্ধমান রাজবংশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনা করিয়াছিল। কমলাকান্তের মাতৃসঙ্গীতের করুণ সুর রাজপ্রাসাদের ভাবসরোবরে অম্লান শতদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে,—তাহারই জীবন্ত, জাগ্রত প্রতিমারূপে আজ আমরা শক্তিসাধক শ্রীবিজয়ানন্দকে পাইয়াছি। কমলাকান্ত যাহা শুনাইয়াছেন, শ্রীবিজয়ানন্দ সরল প্রাণে গলা খুলিয়া বাঙ্গালীকে আজ তাহা শুনাইতেছেন। কমলাকান্তের মাতৃনামের সেই পুণ্যধারা আজ আর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ নহে,—শ্রীবিজয়ানন্দের ভাবসাধনার ভিতর দিয়া তাহা বাহিরের জগতকে প্লাবিত করিতেছে। শ্রীবিজয়ানন্দের মধুর কণ্ঠে শুনিতে পাই—

কমলাকান্তের সাধনার ফল—শ্রীবিজয়ানন্দ।

'প্রাণে প্রাণে প্রাণে মাগো কেন সদা এসনা ?
তানে তানে তানে দেগো সাধনার মূর্চ্ছনা ॥
ধ্যানে ধ্যানে ধ্যানে তুমি প্রেমময়ী ললনা।
জ্ঞানে জ্ঞানে জ্ঞানে তুমি মায়াময়ী ছলনা ॥'

আবার মায়ের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িত কুমার প্রতাপচন্দ্রের মুখে গাহিয়াছেন—

'বারে বারে বারে বারে এত দুঃখ দিওনা।
পারে পারে পারে পারে মোরে ফেলে যেও না ॥
তারে তারে তারে তারে বাজ তারা বাজনা।
সারে সারে সারে সারে দিতে মাগো ভুল না ॥'

শ্রীশ্রীশ্যামা মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া শ্রীবিজয়ানন্দ গাইতেছেন—

'কার উপরে রোষ ভরে, শ্যামা মা রণে সেজেছ।
পাগলিনী ভবরাণি, হরে চরণে রেখেছ।
করে নর শির ধর, একি বেশ ভয়ঙ্কর,
তোমারি এ চরাচর তাকি মা ভুলে গিয়েছ।
শুনগো বিজয় রাণী, হও প্রসন্না জননি,
পদতলে শূলপাণি, চেয়ে না মা দেখিছ॥'

* * * *

* * * *

বাংলায় রামপ্রসাদী সুর এক অতি অপূর্ব্ব জিনিস; সোণার বাংলায় ধনী হইতে কুটীরবাসী দরিদ্রের প্রাণকে এই সুরের মূর্চ্ছনায় ধর্ম্মের দিকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। এই সুর যেন একটী স্নিগ্ধ প্রসাদীভাবে কমলাকান্ত। অথচ বৈরাগ্যোজ্জ্বল মাধুর্য্যরসে পরিপূর্ণ এবং ইহা প্রাণের ভিতর এমন একটা স্পন্দন উত্থিত করে যে তাহা মানব মনকে সাংসারিক বিষয়বাসনার নিম্নভূমি হইতে উর্দ্ধে এক শান্তিময় দেবভূমিতে লইয়া যায়। এই অভিনব সুরের তালে তালে কমলাকান্ত মায়ের গান গাহিয়াছিলেন। সরলভাবে সোজা কথায়, প্রাণভরা ছন্দোময় সুরে তিনি মাকে আপনার সুখ দুঃখ জানাইতেন—মা সন্তানের করুণ প্রার্থনা শুনিতেছেন না বলিয়া মায়ের উপর কখনও অভিমান করিয়াছেন, মাতৃস্নেহে পূর্ণ হৃদয় হইয়া—তাঁহার চরণে সম্পূর্ণ-রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া, মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া ধরিয়া, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া গাহিয়াছেন—

'কমলাকান্ত করে নিবেদন,
কালীর তনয়ে কি করে শমন;

ভুলনা রে মন ! অভয় চরণ,
মিনতি রাখ আমার, রে ॥'

এইরূপ সরল ও দ্বিধাশূন্য ভাব কোনরূপ যুক্তিতর্ক সংশয়ের ধার ধারে না—জোর করিয়া যুক্তিতর্ক ঠেলিয়া ফেলিয়া সাধক সাধনরাজ্যে সফলতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের মত সাধক কমলাকান্ত মায়ের পূজার জন্য গান গাইতেন। এ পূজায় বাহ্যিক ফুলচন্দন ও নৈবেদ্যের বাড়াবাড়ি ছিল না, কমলাকান্তের মাতৃভাব-পরিপূরিত উদার হৃদয় হইতে উত্থিত পদাবলী-ই এই মহাপূজার প্রধান উপকরণ ছিল। শাক্ত কমলাকান্তের গান সিদ্ধাচার্য্যদেরই সঙ্গীতের মত ; কেবল সংযম-সন্ন্যাস, সাধনা ও যোগ এবং ভক্তি শিক্ষা দিবার উদ্দেশেই সাধকের স্বাভাবিক স্বতঃ উচ্ছলিত ভাবাবেশে বিরচিত। ঐ গানে হৃদয়ের সরলতা মাখান ছিল ; ভাব বন্ধক দিয়া কৃত্রিম উপায়ে দশের প্রাণ মুগ্ধ করিতে তিনি কখনও গান গাইতেন না। মায়ের চরণে বসিয়া ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে প্রাণ খুলিয়া তিনি মাকে আত্মনিবেদন জানাইতেন, মহাভাবে কাঁদিতেন, হাসিতেন, সেই ভাব আজিও যেন অজ্ঞাতসারে সময়ে সময়ে বাঙ্গালীর মোহের বাঁধন খুলিয়া দেয়।

কমলাকান্ত খুব ভাবের সহিত গান গাইতেন। তাঁহার গানে, গাথায়, পদে কৃত্রিমতা নাই, বাহ্যিকতা নাই ;—আছে, বিশ্বমাতৃত্বের উদার ভাব ও প্রাণের কথা এবং সাধকের উপদেশ। মায়ের ধ্যানে তদ্গত হইয়া তিনি যে গান গাইতেন তাহাতে সাধনার ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তি প্রকটিত হইত। মহামায়ার সগুণরূপ ও নির্গুণভাব দর্শনে তাঁহার শরণ লইয়া সাধক গাহিয়াছেন—

'কত রঙ্গ জান গো শ্যামা !
সুমতি কুমতি গতি, তুমি সে কারণ ॥

প্রকৃতি পুরুষাকারে, নিরঞ্জনী নিরাধারে,
যেরূপে যে জনা ভাবে, সে পাবে তেমন, গো ॥
কমলাকান্তের মনে, কে আছে তারিণী বিনে,
যা কর আপনার গুণে, লইলাম শরণ ॥'

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মায়ের রূপ দর্শনে আনন্দ করিয়া সাধক গাইয়াছিলেন—

'এতদিনে জানিলাম দয়াময়ী কালী, গো ;
কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি, মা !
এই মনে ছিল ভয়, আমি অতি দুরাশয়,
অধম দেখিয়ে জগতে রাখিলি, গো ॥
কমলাকান্তের বাণী, হেন মনে অনুমানি,
বুঝি শ্রীনাথের কথা, সফল করিলি, মা ॥'

দেহাভ্যন্তরে পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মন্ত্র সাহায্যে তিন স্থানে ত্রিমূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়া কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন—

'সদানন্দময়ী সুধানন্দে বিহরে, রে।
চিন্তামণি অন্তঃপুরে ভ্রান্তি দূর করে ॥
মূলাধারে সহস্রারে, হৃদয় পঙ্কজ বরে,
আরে ইচ্ছাময়ী তিন ধামে, তিন মূর্ত্তি ধরে, রে।
কমলাকান্তের মন ! তুমি তাঁরে চিন্ত অনুক্ষণ, রে !
পঞ্চাশদ্বর্ণ সার হার করে পর রে ॥'

সদানন্দময়ী মা যন্ত্রী, জীব যন্ত্র, মায়ের শাসনে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ক্রিয়া পরিচালিত হইতেছে, এই ভাবে গদগদ হইয়া মায়ের আদরের অশান্ত পুত্র কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন—

'সদানন্দময়ি কালি ! মহাকালের মনমোহিনী, গো মা !
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেওমা করতালি ॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী ।
যখন ব্রহ্মাণ্ড নাছিল, হে মা !
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ?
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি ।
তুমি যেমনি রাখ, তেমনি থাকি,
যেমন বলাও, তেমন বলি ॥
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি ।
এবার সর্ব্বনাশি, ধরে অসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটই খেলি ॥'

* * * * *

* * * * *

সাধক শ্রীকমলাকান্ত মহাকালীর সাধনায় তাল দিতে দিতে চলিয়াছেন। এই তালে একটু ভুল হইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা নাই। কমলাকান্ত অশান্ত হইলেও শান্তভাবে তিনি তাঁহার অসিধারী মহাকালীকে ভালবাসিতেন। সংসারের জীব একটু ক্ষেপিলে সংসার ভাসিয়া যায়, কিন্তু ক্ষেপাক্ষেপী চিরদিন অনুক্ষণ ক্ষেপিলেও তাঁহাদের এত বড় সংসারটা কেমন সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন,—'যাথাতথ্যতো অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।' ইহার মূল কারণ 'সদানন্দময়ী কালী।' ঐ সদানন্দ অবস্থা লাভের কারণ সাধক সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন 'যেহেতু তুই মা মহাকালের মনমোহিনী, যাহাতে মহাকাল প্রীতিলাভ করেন কেবলমাত্র তাহাই মা তোর কার্য্য, এই জন্যই মা তুই সদানন্দময়ী।' সাধক গৌণভাবে বলিতেছেন, 'মা, !

আমরা ইহা সংসারে মজিয়া মহাকালের প্রীতিউৎপাদক কার্য্য হইতে বিরত আছি, এজন্য আমরা আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দে কাল কাটাই-তেছি।' মহাকালের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে হইলে আবার আত্মজ্ঞানের আবশ্যক। বিশ্বসংসার যতদিন রহিবে ততদিন সকলকেই নাচিতে হইবে। তবে আমাদের নৃত্য ও মায়ের নৃত্যে প্রভেদ এই যে, আমরা ভেদবুদ্ধি (বদ্ধজীবের ইহাই ধর্ম্ম) লইয়া আত্মজ্ঞানহীন অবস্থায় নৃত্য করি,—আর মা আমাদের অভেদবুদ্ধিতে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া আপন সুখে আপনি নাচেন। আবার তিনি যে কেবল এলো-মেলোভাবে নৃত্য করেন তাহা নহে। মা আপনি করতালি দিতে দিতে নৃত্য করেন। সৃষ্টিস্থিতিসংহারের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে, তাহা না হইলে নৃত্যকালীর মহানৃত্য চলে না।

সাধক আবার ভাববিশেষে দেখিতেছেন যে অভেদ আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে মহাকালের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে পারিলে মায়ের কোলে উঠিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারা যায় এবং মাতৃমূর্ত্তিতে মায়ের ঐ নীরব আদেশ শুনিয়া সাধক আবদার করিয়া সোহাগভরে বলিলেন 'মা! যাহা বলিতেছিস্ তাহাত বুঝিলাম কিন্তু তুই যে মা সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকট (আদিভূতা) হইয়াও চিরকাল বিরাজমানা (সনাতনী) আছিস্, আর আমরা যে মা দিনে দশবার মরি আর দশবার বাঁচি। আবার যে মা তুই বহুরূপী হইয়াও শূন্যরূপা। আর ঐ দেখ আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা এই মায়িক জগতের মায়িকরূপে বদ্ধ হইয়া তোর ঐ রাতুল চরণ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি।

সাধক পুনরায় মাকে 'শশীভালী' অর্থাৎ জগদ্‌গুরু শশীভাল চন্দ্র-শেখরের শক্তিরূপিণী বলিয়া বিশেষিতা করিতেছেন। আবার মায়ের

অর্দ্ধমাত্রা লক্ষ্য করিয়া সাধক তাঁহাকে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না বলিয়া দেখিয়াছিলেন কিনা তাহা কে বলিতে পারে? সাধক শশীভালী ব্রহ্মাণ্ডশূন্য-মধ্যগা জননীকে 'আদিভূতা', 'সনাতনী' ও 'শূন্যরূপা' * বলিয়া সৃষ্টিস্থিতি-সংহার মূর্ত্তিতে তাঁহার ত্রিকাল অস্তিত্ব অনুভব করিয়া এবং মায়ের গলদেশে নরমুণ্ডমালা দর্শনে চমকিত হইয়া বলিলেন, 'মা! প্রলয়কালেও তুই যে মুণ্ডমালা বিভূষণা হইয়া বিরাজিতা থাকিস্ সেই মুণ্ডমালার কি প্রলয়েও ধ্বংস হয় না?' ঐ মুণ্ডমালা অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণ। উক্ত অকারাদি অক্ষর 'অ-ক্ষর' বলিয়া পরিঘোষিত। 'গুপ্তসাধন' তন্ত্রের একাদশ পটলে আছে—

'অক্ষমালা মহেশানি পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।
অকারাদির্মহেশানি ক্ষকারান্তো যতঃ প্রিয়ে॥'

*　*　*　*

'দেহমধ্যস্থিতাং মালাং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীং॥'
'অকারাদিক্ষকারান্তা অস্থিমধ্যে স্থিতাঃ সদা।
তিলার্দ্ধে চাস্থিমধ্যে চ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী॥'

সুতরাং বিশ্বের অপ্রকটাবস্থায়ও উক্ত পঞ্চাশদ্ অক্ষররূপী মুণ্ডমালা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু প্রলয়কালে কি করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে উহা সাধক সাধনাবস্থায় ভাবিয়া পান না, তাই বিস্মিত হইয়া ইষ্টদেবীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'যখন ব্রহ্মাণ্ড নাছিল, হে মা!
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?'

পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মুণ্ডমালাই সাধকের সাধনার মন্ত্র। এজন্য প্রলয়-কালে মন্ত্রময়ী মুণ্ডমালা কোথায় বর্ত্তমান থাকে সেই ভাবনা সাধক এখন

* 'পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা।' তারারহস্য।

হইতেই ভাবিতেছেন। ঐ মন্ত্র সাধন-মন্দিরের গুপ্তভাণ্ডারের চাবিস্বরূপ। সাধনার এই পরিপূর্ণ মন্ত্রটী সাধক কোটালহাটের সিদ্ধপীঠে রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের জীবন এই মন্ত্রানুগত হউক। যদি কখনও কোনরূপে মাতৃপদরূপী অমূল্য রত্নভাণ্ডারের কবাট বদ্ধ হইয়া যায় তবে সাধককে ঐ মন্ত্রময়ী মুণ্ডমালারূপ চাবির গুচ্ছটী সেই রত্ন-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবে, এইজন্যই সাধক 'মুণ্ডমালার' কথাটী ভাল করিয়া মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছেন এবং প্রলয়কালেও সেই চাবির সন্ধান লইয়া রাখিতেছেন। সাধক অন্যদিকে আবার বদ্ধজীবকে বিশেষ করিয়া ঐ চাবিটীর পরিচয় লইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন।

সাধক আবার আরও অগ্রসর হইয়া ভাবিতেছেন যে মন্ত্রময়ী মুণ্ডমালার পরিচয় না হয় পাইলাম কিন্তু তুমি যে মা জীবকে মায়ায় ভুলাইয়া রাখ, জীব যে মা তোমার ক্রীড়ার পুত্তলিকা। তাই তিনি বলিলেন—

'সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী,
যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।'

যন্ত্রীর তন্ত্রে যন্ত্র চলে। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্ররূপী জীবকে মুণ্ডমালাতন্ত্রে চালিত না করিলে কাহার সাধ্য মা, তোমার মুণ্ডমালা আশ্রয় করে। যদিও মা, মুণ্ডমালা বদ্ধজীবের পক্ষে যষ্টিস্বরূপ, তথাপি তুই সেই যষ্টি জীবের হস্তে না দিলে অন্ধ যন্ত্রের কি সাধ্য যে সে সেই যষ্টি আশ্রয় করে। 'তুমি যেমনি রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি।' অতএব তোমার মুণ্ডমালার সন্ধান পাইলেও তোমার কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন জীবের অন্য উপায় নাই। অতএব মা তুমিই সারাৎসারা।

ইহার পরই সাধক বলিলেন—'এতদিন মা, অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভের জন্য শান্তভাবে গুরুদত্ত মুণ্ডমালাতন্ত্ররূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি ইহাতে আশা মিটে না। ধর্ম্মপথে বিষয়াসক্তির শান্তি-

লাভ হয় বটে, কিন্তু মা তোর অভয় ক্রোড়ে স্থান পাইতে হইলে কেবলমাত্র বিষয়াসক্তির শান্তি হইলে আশা পূর্ণ হয় না,—আরও কিছু চাই। সেই আরও কিছু না পাইয়া কমলাকান্ত তাঁহার গুরুদত্ত বৈধীধর্ম্ম হইতে স্খলিতপদ হইতেছেন ভাবিয়া 'অশান্ত' হইয়া জগজ্জননীকে 'সর্ব্বনাশী' বলিয়া গালি দিতেছেন। এতদিনে সাধক বুঝিতে পারিয়াছেন যে মায়ের অসি ধারণ শুধু অধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য নহে। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' উভয়ের বিনাশ হইলে তবে মাতৃপদে বিশুদ্ধ অনুরাগের সঞ্চার হয় এবং কেবলমাত্র সেই বিশুদ্ধ অনুরাগের মহাশক্তিতে সাধক মাতৃক্রোড় অধিকার করিতে পারেন। 'সে বড় বিষম ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'

* * * *

ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় * কমলাকান্ত।

সাধক কমলাকান্তের মাতৃসঙ্গীত প্রসিদ্ধ। এক সময়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কমলাকান্ত পদাবলী সর্ব্বত্রই গীত হইত। প্রসাদী-সুর সংযোগে এই পদাবলীর প্রাণ মাতোয়ারা ঝঙ্কার শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলে। পদাবলীর এই সম্মোহন স্বরে কমলাকান্ত জগন্মাতাকে ডাকিতেন, ভক্তবৎসলার আসন তাহাতে

* ই, আই, রেলওয়ের (লুপ) গুস্কারা ষ্টেশনে নামিয়া পশ্চিম দিকে যাইতে হয়। সেখান হইতে আড়াই মাইল দূরে ওড়গাঁও গ্রাম। ওড়গাঁও গ্রাম হইতে উত্তরে এক মাইল দূরে ফটো দুইখানা তোলা হইয়াছিল। একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্থানটী দেখাইয়া দিয়া বলেন, 'ঐ স্থানে (১ম চিত্র) ডাকাতেরা সাধক কমলাকান্তকে আক্রমণ করিয়াছিল।' দ্বিতীয় ফটোতে কতকগুলি গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, ঐ সকল গর্ত্তে ডাকাতেরা লুকাইয়া থাকিত। প্রথম চিত্র খানা পূর্ব্ব দিক হইতে এবং দ্বিতীয় চিত্রখানা দক্ষিণদিক হইতে তোলা হয়। উভয় চিত্রই একটী স্থানবিশেষের বিভিন্ন দিক্ হইতে তোলা হইয়াছিল। গ্রন্থকার।



পৃঃ ৫৬ ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা (প্রথম চিত্র)



টলিত। অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও একদিন কান্তপদাবলীর সন্মোহন গুণে বিগলিত হইয়াছিল। সে কাহিনীটী এই,—একবার শিষ্যালয় হইতে কমলাকান্ত ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার প্রান্তর দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। তখন এই ডাঙ্গার চারিদিকে দস্যুদিগের বড়ই প্রভাব ছিল। সন্ধ্যার পর এই ডাঙ্গায় হাঁটিতে কেহই সাহস করিত না। বর্ত্তমানে এই স্থানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ডাঙ্গার স্থানে স্থানে এখন চাষআবাদ চলিতেছে। জেলাবোর্ডের যে রাস্তা গুস্কারা হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমানকাটোয়ার রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই রাস্তা এই ডাঙ্গার উপর দিয়া গিয়াছে। বনপাশ বা গুস্কারা ষ্টেশনে নামিয়া কিছুদূর পশ্চিমে অগ্রসর হইলে এই ডাঙ্গায় পৌঁছা যায়। সাধক এই ডাঙ্গায় দস্যুহস্তে নিপীড়িত হইয়াছিলেন। দস্যুগণ লোভের বশে তাঁহাকে প্রাণে মারিবার উপক্রম করে। মাতৃভক্ত তখন অনন্যোপায় হইয়া হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে শরণাগতপালিনী জগদম্বাকে ডাকিতে লাগিলেন—

আর কিছু নাই শ্যামা, তোমার কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি,
অতেব হইলাম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই,
ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা! ইত্যাদি॥

লোভোপহত দস্যুগণ নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিল। ক্ষণকাল মধ্যে মহামাতৃভাবের প্রেরণায় নরপশুদের বজ্রকঠোর হৃদয় গলিয়া গেল। তাহাদের মুক্ত হৃদয় হইতে ভক্তির উৎস প্রবাহিত হইয়া অশ্রুর আকারে সাধকের পদ ধৌত করিতে লাগিল।

অবশেষে এই দস্যুদল কমলাকান্তের চরণতলে পড়িয়া কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল।

কথিত আছে, কমলাকান্ত দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। শেষ বিবাহ কাঞ্চনপুরে করেন। সংসারে শোকতাপ সাধককে স্পর্শ করিতে পারিত না। দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যুর পর দামোদরের বিস্তৃত সৈকতে প্রজ্বলিত চিতা সম্মুখে 'কালীর বেটা' কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিয়াছিলেন—

কমলাকান্তের বৈরাগ্য।

'কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণিকোঠা।
আপ্‌নি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌লনা তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ্‌ দিয়ে পরেছি আর, পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগৎ জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥'

* * * *
* * * *

সাধক কমলাকান্ত পরমাত্মস্বরূপা, নিত্যা, কালরূপা দক্ষিণাকালীর উপাসক ছিলেন। প্রসাদের মত লীলাতত্ত্বে রক্তকমলাসনস্থিতা দক্ষিণাকালী মূর্ত্তিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। তাঁহার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন মহারাজাধিরাজ

মহাকালীর সাধক কমলাকান্ত।

তেজচন্দ্ বাহাদুর তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মুমূর্ষু সাধক তখন মহারাজাধিরাজকে বাধা দিয়া গাইয়াছিলেন—

'কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব। আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে, বিমাতার কি শরণ লব।' মায়ের প্রতি অচলা ভক্তি না থাকিলে, হৃদয়ের বল না থাকিলে কেহ কখনও এমন কথা বলিতে পারেন না। কথিত আছে, গুরুদেবের মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারিয়া মহারাজ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর অল্প কিছুপূর্ব্বে সাধক কুশশয্যায় শয়ন করিয়া গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করেন। অমনি ভূগর্ভ ভেদ করিয়া ভোগবতী গঙ্গা সেখানে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের বদন কমলে পতিতা হইয়াছিলেন।* এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া মহারাজ বাহাদুরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কৌলসাধক সাধনবিভূতি দ্বারা জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়া মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৌলসাধকমাত্রেরই এইরূপ ইচ্ছা-মৃত্যু হইয়া থাকে, তাঁহারা সকলকে বলিয়া কহিয়া দেহত্যাগ করেন।

* * * * * * *

কমলাকান্ত কৌলসাধক † ছিলেন। বীরাচারী শক্তিসাধক হইলেও তিনি বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না,—কালীকৃষ্ণ তাঁহার চক্ষে অভেদ ছিলেন।

কমলাকান্তের পঞ্চমকার সাধনা।

জগদম্বাকে সকল সমর্পণ করিয়া তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বীরাসনে বসিয়া পঞ্চমকারের সাধনা করিতেন। তন্ত্রে আছে—

'মকারঃ পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।' প্রকৃতিপুরুষযোগ বা শিবশক্তির মিলনই তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের কালীসাধনা। পঞ্চতত্ত্ব

* কথিত আছে, নিষ্কাম সাধক সাধু নাগ মহাশয়ের আহ্বানে গঙ্গাহীন দেশে (নারায়ণগঞ্জ দেবভোগ গ্রামে) গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল।

† কথিত আছে, কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক অবধূত সন্ন্যাসী বিশালাক্ষীর মন্দিরে কমলাকান্তকে কৌলাচারে দীক্ষিত করেন এবং গোপনে সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

ব্যতিরেকে মায়ের পূজা করিলে সাধকের পদে পদে বিঘ্ন ঘটে। 'মহানির্ব্বাণ' তন্ত্রের পঞ্চমোল্লাসে আছে—

'কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ।
তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্‌॥'

দেবি! কুলাচার অবলম্বন ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। অতএব কুলাচারে নিরত থাকিয়া শক্তিমন্ত্র সাধন করাই কর্ত্তব্য। 'মদ্য-সাধনা' * এই সাধনার পঞ্চম। মন্ত্রজ্ঞ সাধক জিহ্বাগ্র দ্বারা তালুকুহর রোধ করিয়া স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় শিবশক্তির শৃঙ্গার রসপূর্ণ বিহার হইতে যে সুধাক্ষরণ হইতেছে, সেই সুধাধারা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইতেছে, এইরূপ ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই সময়ে সাধকের নেশার ন্যায় অবস্থা হয়।

কৌলসাধক শ্রীকমলাকান্তের এই নেশার অবস্থা দেখিয়া মহারাজ তেজচন্দ্‌ বাহাদুরের হৃদয়ে একবার সন্দেহ আসিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন তাঁহার গুরুদেব মদের নেশায় মাতলামি করেন। একদিন পথিমধ্যে মহারাজ বাহাদুর সাধককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কমণ্ডলুর মধ্যে কি আছে?' উত্তরে সাধক বলিলেন, 'দুগ্ধ আছে।' মহারাজা বলিলেন, 'দেখি কেমন দুগ্ধ।' তখন কমলাকান্ত কমণ্ডলু হইতে কতকটা দুগ্ধ মহারাজার সম্মুখে মাটিতে ঢালিয়া দিলেন। রাস্তা সিক্ত হইয়া উঠিল। এই দৃশ্য দেখিয়া মহারাজার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সাধক রামপ্রসাদকেও এইরূপ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক

* 'মহানির্ব্বাণে' (পঞ্চমোল্লাস) আছে—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্‌॥

পণ্ডিত বলরাম তর্কভূষণ একবার প্রসাদকে 'মাতাল' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রসাদ তাহাতে বিচলিত না হইয়া ভাবের মুখে জগদীশ্বরীকে আত্মনিবেদন জানাইয়া গাইয়াছিলেন—

'ওরে সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে।

মন মাতালে মাতাল করে, যত মদ মাতালে মাতাল বলে॥' ইত্যাদি।

* * * *

তন্ত্র-শাস্ত্র দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞানের অতীত অবস্থাকে সাধনার প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করিয়া বলিলেন—

অদ্বৈতভাবে 'অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈত-মিচ্ছন্তি চাপরে।

কমলাকান্ত। মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিতাঃ॥

তান্ত্রিক সাধক এই দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞানের অতীত নিত্য শিবশক্তিময় আদ্যশক্তির প্রেমলীলা দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হন ; দ্বৈত জগৎ মন্থন করিয়া অদ্বৈত তত্ত্বে ডুবিয়া দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানের লীলামাধুর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন। সাধকের প্রেম সাগরে যখন অদ্বৈত-ভাবের উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিতে থাকে, তখন সেই ব্রহ্মানন্দ তরঙ্গরসে ত্রিভুবন ডুবিয়া যায়। এই রসে উন্মত্ত হইয়া প্রাণের কবাট খুলিয়া সিদ্ধভক্ত কবি কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন—

'তারিণী আমার কেমন।
কে জানে তাঁরে, যেমন তারা তেমনি ভাল।
দুটী অভয় চরণ, ভাব ওরে মন,
অনুমানে তার কি কাজ বল!
প্রকৃতি পুরুষ অথবা শূন্য,
সেই সে সকলি সকলে ভিন্ন,
ধন্য ধন্য কে জানে অন্য,
ভব যাঁরে ভেবে পাগল হলো॥

* * * *

যেরূপে যে জনা করয়ে ভাবনা,
সেইরূপে তার পূরয়ে কামনা ;
দ্বৈতভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ,
অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল ॥'

আবার দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত পরম শিব প্রেমময়ীর নিত্য জগন্মূর্তিতে নানা রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া গাইয়াছেন—

'কেন রে আমার শ্যামা মারে বল কালো ॥
যদি কালো বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো ॥
মা মোর কখন শ্বেত কখন পীত,
কখন নীল লোহিত, রে !
আমি জানিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেলো ॥' ইত্যাদি।

কৃষ্ণবর্ণা মায়ের ভুবন-আলো-করা মূর্ত্তি দর্শন জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফল। সাধনার পথে অগ্রসর হইলে সাধক মায়ের শ্বেত পীত নীল লোহিত ইত্যাদি কত রূপই দেখিয়া থাকেন, তখন মায়ের প্রকৃত রূপ যে কি তাহা ঠিক করা কঠিন হইয়া পড়ে। তারপর একটু অগ্রসর হইলে কমলাকান্তের ন্যায় শূন্য রূপ মহাকালের (পুরুষের) উপর মহাশক্তির (প্রকৃতির) অধিষ্ঠান দেখিতে পাইয়া পাগল হইতে হয়। প্রথম হইতে কেবল মাত্র অনুমান না করিয়া মায়ের অভয় চরণ দুইখানি ধ্যান করিতে করিতে সাধক যথাক্রমে শূন্য ও তৎপরে নানা বর্ণময়ী পুরুষ ও প্রকৃতি রূপ দর্শনে চমকিত হন। ঐ শূন্য রূপ এবং পুরুষও প্রকৃতি রূপ একই মায়ের, কারণ ত্রিভুবনপ্রসবিত্রী মা একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঐ শূন্যের নিম্নে যে রূপ অর্থাৎ যে রূপে সাধারণ জীব মজিয়া আছে তাহা মায়ের অনিত্য

রূপ এবং ঐ শূন্যের উপরিভাগে মায়ের যে শ্বেত পীতাদি রূপ তাহা নিত্য (অপ্রাকৃত)। অদ্বৈতভাবে ঐ অপ্রাকৃত নিত্যরূপ দর্শন করিতে পারিলে ধন্য হওয়া যায়। সিদ্ধভক্ত কমলাকান্ত দ্বৈতভাব বর্জ্জিত হইয়া নিত্যের সাধনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার প্রথম সোপান মায়ের অভয় চরণ ধ্যান; দ্বিতীয় সোপান অদ্বৈতভাব এবং তৃতীয় সোপান মায়ের শ্বেতপীতাদি রূপ দর্শন। ইহার উপরে আর এক তত্ত্ব আছে, তাহা জগন্মাতার নিত্য বা অপ্রাকৃত কাল রূপ। এই তত্ত্বে পৌছিয়া জগন্ময় শিবশক্তিজ্ঞানে নিত্যসিদ্ধ হইয়া দ্বৈতকে অদ্বৈতে পরিণত করিয়া কমলাকান্ত শান্ত হইয়াছিলেন।

বিভিন্ন পুরাণোক্ত ব্রহ্ম যে এক এবং এক-ই কালী নানা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা, সেখানে কোন দ্বৈতভাব নাই, এই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সাধক কমলাকান্ত গাইয়াছেন—

'যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে।
তোমার দ্বৈতভাবে দিবস গ্যালো,
চিদানন্দ রয় কেমনে॥

* * * *

কমলাকান্তের কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি অন্ত মধ্য নাই,
সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥'

জগদম্বার এই নানা মূর্ত্তিকে ভক্ত ভাবুক কমলাকান্ত অমরবন্দিতা মুক্তকেশী মহাকালীরূপে উপলব্ধি করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের তীব্র তেজে আমিত্ব ও দ্বৈতভাব ঘুচাইয়া দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

* * * * * *

মাতৃসঙ্গীত রচনা করিয়া সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত বাঙ্গালী

জাতির মনোবৃত্তির উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রভাবে বাঙ্গালী এত মাতৃভক্ত ও পার্থিব সম্পদের উপর এত বিতৃষ্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। উভয়েই ভগবানের মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। কালীপূজা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া উভয়েই প্রেমানন্দে ডুবিয়া থাকিতেন। প্রকৃত ভক্তের যে ভগবানের উপর জোর আছে তাহা ইঁহারা উভয়েই দেখাইয়াছেন। কেহই জগদম্বা শ্যামামায়ের চরণ ছাড়িয়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা করেন নাই। গঙ্গার শরণ লওয়া শ্যামামায়ের আদুরে ছেলে প্রসাদ কখনও প্রয়োজন মনে করেন নাই, তাই তিনি মায়ের উপর নির্ভর করিয়া গাইয়াছেন,—

কালীর বেটা প্রসাদ ও কমলাকান্ত।

'কেন গঙ্গাবাসী হব। ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব॥
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥'

ইহারই প্রতিধ্বনিতে শান্ত কমলাকান্ত গাইয়াছেন,—

'কি গরজে কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে, বিমাতার কি শরণ লব॥'

* * * *

নিত্যানন্দময়ীর সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার নিত্য, বন্ধন নিত্য, মুক্তিও নিত্য। সেই নিত্যানন্দময়ী মহাকালীর নিত্যমূর্ত্তিতে সৃষ্টির বীজরূপ পুরুষ নিত্য, কিন্তু সেই পুরুষ শক্তিতে সৃষ্টির প্রক্রিয়া নাই, সেইজন্য মুক্তিদাত্রী মহাশক্তি সেই পুরুষশক্তির উপরিভাগে আরূঢ়া হইয়া—পদতলে স্তম্ভিত করিয়া মুক্তকেশী উন্মাদিনী সাজিয়াছেন। কালীতন্ত্রে আছে—

তন্ত্রে কালীতত্ত্ব।

'করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।

*　　*　　*　　*

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং।

*　　*　　*　　*

শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং॥'

এই সৃষ্টিশক্তি পুরুষরূপই স্বয়ং মহাকাল; তাঁহারই হৃদয়ে দাঁড়াইয়া কালভয়ভঞ্জিনী দিগম্বরী শ্যামা-মা জীবকে কৈবল্য দান করিতেছেন। নির্ব্বাণতন্ত্র বলেন—

'পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামাশক্তির্নিগদ্যতে।
বামা সা দক্ষিণং জিত্বা * মহামোক্ষপ্রদায়িনী।
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে॥'

পুরুষের নাম দক্ষিণ, শক্তির নাম বামা। সাধনার দ্বারা বামাশক্তি জাগরিতা হইলে তিনি যখন দক্ষিণশক্তি পুরুষকে জয় করিয়া তদুপরি স্বয়ং দক্ষিণানন্দে নিমগ্না হন, তখনই তিনি মহামোক্ষপ্রদায়িনী। ইনিই ত্রিলোকে দক্ষিণা কালী নামে প্রসিদ্ধা।

* পাঠান্তর—'বামায়া দক্ষিণা জিহ্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী।'

প্রলয়ার্ণবে ঘোর নামক অসুর বধের পর মহাকালী সৃষ্টিস্থিতিসংহার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাই যোগিনীতন্ত্র বলিয়াছেন,—সা মহাকালী দদাবস্মাসু শাম্ভবি। ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশক্তীঃ সর্ব্বকার্য্যার্থ-সাধনাঃ॥

তন্ত্রোক্ত এই কালীতত্ত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগম্য,—এই কালীতত্ত্বে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অন্তর্হিত হয়। নির্ব্বাণতন্ত্রে আছে—

'নিত্যানন্দপরা দেবী কালী কালপ্রকাশিনী।
আদ্যাশক্তির্মহাকালী দেবনির্ম্মাণকারিণী।

*   *   *   *

অপরা সা মহাকালী নদ্যাদীনাং সমুদ্রবৎ।
গোষ্পদে চ যথা তোয়ং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা।
গোষ্পদং কিং ন জানীয়াৎ সমুদ্রস্য জলং শিবে।
তেন ব্রহ্মা না জানাতি বিষ্ণুঃ কিং বেত্তি শঙ্করঃ॥'

এই নিত্যানন্দপরা নীলরূপিণী মহাকালীর উৎপত্তি বিষয়ে 'নারদ-পঞ্চরাত্র' বলেন—

'দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোকবিশ্রুতা।
কুপিত্বা দক্ষরাজর্ষিং সতী ত্যক্ত্বা কলেবরং॥
অনুগ্রহ্য চ মেনায়াং জাতা তস্যাস্তু সা তদা।
কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥'

কালীমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রপ্রধান যামলে আছে,—

'ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনী।
জ্বলনার্থসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা।
মায়াত্রয়েণ দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
বিন্দূনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী।
বীজত্রয়া শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা।
শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী।
লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
সম্বোধন পদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী।' ইত্যাদি।

শক্তিময়ী, গতিময়ী, লীলাময়ী দেবী মহাকালকে গতিশীল করিয়াছেন বলিয়া তিনি কালী। মহানির্ব্বাণে আছে—

'কালসংকলনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।' কাল অস্তিত্বের জ্ঞাপক, কালী সেই কালের গতিরূপিণী, কালী না থাকিলে কালের অনুভূতি সম্ভবপর হইত না।

মহাকালী অনন্তরূপিণী; মায়ের যে কত রূপ তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এইরূপ ভাবময়,—সাধকের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহার রূপের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। মায়ের বর্ণপরিচয়ে সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন—

'নব জলধর কায়। কালরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়।' অপর পদাবলীতে আছে—

'জাননা রে মন! পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়॥'

শ্যামা-মা পুরুষ ও নারী দুই-ই। যখন তিনি গতিস্বরূপিণী, লীলাময়ী তখন তিনি নারী,—মহাকালী। যখন মা স্থিতিস্বরূপিণী ও কালসঙ্গতা তখন তিনি পুরুষ। এই যে পুরুষও প্রকৃতি ভেদ, ইহা ভাবের ও গুণের তারতম্য হইতে হয়।

কালীতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'কালী নানাভাবে লীলা কর্‌ছেন—তিনি নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ কর্‌ছিলেন। * * * যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন।'

মায়ের রূপ বর্ণনায় ঠাকুর বলেন—'কালী কি কালো? দূরে

তাই কালো, জান্‌তে পার্‌লে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীল বর্ণ। কাছে গ্যাখো কোন রং নাই! সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে গ্যাখো, কোন রং নাই!' এই কথা বলিয়া মাতৃভক্ত ঠাকুর গান ধরিলেন—

'মা কি আমার কালো রে।
কালরূপে দিগম্বরী,—হৃৎপদ্ম করে আলো রে॥'

সাধক কমলাকান্তের কালীতত্ত্ব এক অপূর্ব্ব জিনিস,—কমলাকান্তকে জানিতে না পারিলে সেই গুহ্যতত্ত্ব জানা যায় না। পরমানন্দস্বরূপিণী এবং পরমানন্দদায়িনী মহাকালীর বিচিত্র লীলা দর্শন করিতে হইলে মাতৃমন্ত্র সাধনা করিতে হয়,—এই সাধনা যোগসাপেক্ষ। জীব যখন কালীভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ ভুলিয়া 'মা—মা' করিয়া কাঁদিতে থাকে, তখন মায়ানিদ্রার অবসানে তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাগ্রদাবস্থা লাভ হয় এবং নিত্য চৈতন্যস্বরূপিণী মহাকালীর আনন্দঘন মূর্ত্তি লীলারূপ ধারণ করিয়া সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। করুণাময়ী জগদম্বার গুণময়ী ছায়া জীবের সুবিমল চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হয়,—উহা ছায়া হইলেও জগৎ প্রবাহ যতদিন আছে ততদিন উহা জগৎ প্রবাহের ন্যায় সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলয় হইলেও মা-জগদম্বা নির্গুণা, নিরঞ্জনী। এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে 'মা-জগদম্বার এই গুণময়ী মূর্ত্তি কি অসৎ?' ইহার উত্তর এই 'না সতো বিদ্যতে ভাবঃ।' সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব ও তিরোভাবই এই গুণলীলার প্রকৃত তত্ত্ব।

কমলাকান্তের কালীতত্ত্ব।

একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে সাধকের অনুসন্ধানের বিষয় 'তত্ত্বম্'। যিনি বিচার করিবেন তিনি 'ত্বম্' এবং বিচার্য্য বস্তু 'তৎ'। বিচারকের অবস্থাভেদে বিচার্য্যের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। কমলাকান্তের

সাধ্যবস্তুর তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমে বিচারককে যথাসাধ্য কমলাকান্তের সন্নিকট হইতে হইবে। যিনি যত দূর কমলাকান্তের ভাব গ্রহণ করিবেন কমলাকান্তের সাধ্যবস্তুর নির্ণয় তাঁহার সেই পরিমাণে হইবার সম্ভাবনা। কমলাকান্ত এই স্থূল মায়িক জগতেরই জীব ছিলেন। সাধারণ জীব যেমন নশ্বরদেহ ধারণ করিয়া কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয়, কমলাকান্ত সাধনার প্রথম অবস্থায় তাহাই ছিলেন। সম্ভবতঃ প্রাক্তন সংস্কার বলে কমলাকান্ত উর্দ্ধস্তরে উঠিয়াছিলেন। সংস্কার কর্ম্মজাত,—কমলাকান্তের অনুসরণ করিতে হইলে জীবকে ক্রিয়মান কর্ম্ম দ্বারা শক্তিলাভ করিতে হইবে,—'শক্তিঃ শক্তিমতোরভেদঃ'—সাধারণ জীবের শক্তি না থাকিলেও শক্তিমান্ কমলাকান্ত শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় কমলাকান্ত জীবকে 'মাভৈঃ' বলিয়া আশ্বাস দেন। এই সময়ে 'কালী কে ?' প্রশ্ন করিলে কমলাকান্ত বলিবেন 'তত্ত্বম্।' জীব তন্ময় হইয়া যাঁহাকে জানিতে চায় তিনিই 'তৎ'। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' জ্ঞানিগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম', যোগিগণ 'আত্মা' ও ভক্ত 'ভগবান্' বলিয়া সেই এক ব্রহ্মবস্তুকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পন্থা বিভিন্ন হইলেও তৎব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে সাধকের হৃদয়-গ্রন্থি ভিন্ন, সংশয় সমূহ ছিন্ন ও প্রারব্ধাদি কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যায় এবং তিনি তখন অতুল আনন্দের অধিকারী হন। তবে সাধক ভিন্ন পথে গমন করেন কেন ? ইহার উত্তর এই যে, সাধকদের প্রাক্তন সংস্কারানুযায়ী রুচি ও অধিকারভেদ জন্য এইরূপ হইয়া থাকে।

এইবার সাধকের হৃদয়ে প্রশ্ন উঠিতেছে—

'মায়ের মূর্ত্তি ও রূপ কেমন ?'

উত্তরে কমলাকান্ত গাহিয়াছেন—

'মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ,
কখন শূন্য মহাকাশ রে।

আরে কমলাকান্ত ও ভাব ভাবিয়ে সহজে
পাগল হলো ॥'

আবার মায়ের রূপ সম্বন্ধে গাহিয়াছেন—

'মা মোর কখন শ্বেত কখন পীত,
কখন নীল লোহিত, রে।
আমি জানিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেল ॥'

কমলাকান্তের কালীতত্ত্ব বড়ই জটিল। সাধক গাহিয়াছেন—

'কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি অন্ত মধ্য নাই, সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে ॥'

আবার বলিয়াছেন—

'তোমার দ্বৈতভাবে দিবস গেল, চিদানন্দ রয় কেমনে'।

মা-জগদম্বা চৈতন্যরূপিণী, চিদানন্দময়ী, পূর্ণব্রহ্মসনাতনী, অদ্বিতীয়া। তিনি গুণাতীতা, নিরাকারা, নিরঞ্জনী হইয়াও জীবের মঙ্গলের জন্য নানারূপ-ধারিণী। বিভুভাবে নির্গুণা, নিরূপা, নিরঞ্জনী। জীব যখন বিশ্বময়ী অবিদ্যারূপ অন্ধকারে ডুবিয়া কায়মনবাক্যে যথাশক্তি বেদবিধি অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে, তখন মহাবিদ্যা বিদ্যারূপে তাহাকে আলোক দেখাইয়া ক্রমোন্নতির পথে চলিবার সুযোগ করিয়া দেন। এখানে দ্বৈত-ভাবেই সাধনা হইতে থাকে। ইহার মধ্যে 'যে জনা যেরূপে ভজে, মা তার হৃদয়াম্বুজে, সেইরূপে গতিদায়িনী।' আর একদল আছেন তাঁহারা বলেন 'বিশ্বের ভিতরে ও বাহিরে একমেবাদ্বিতীয়ম্।' 'কি দিয়ে পূজবে তাঁরে সেই সর্ব্বতত্ত্বময়।' কিন্তু মুখে বলিলেও 'সর্ব্বতত্ত্বময়' অনুভূতি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে পারেন না,—এজন্য অন্তরে ব্রহ্মময়ীভাব প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে সেই আদিভূতা সনাতনী মহাবিদ্যা যন্ত্রীর যন্ত্ররূপে আপনাকে

স্থাপনা করিয়া তাঁহারই একটী সিদ্ধ নামব্রহ্ম আশ্রয় করিয়া কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন,—

'কমলাকান্তের আশা, নাম ব্রহ্ম কর্ম্মনাশা ; সেত কঠিন নয়, কেবল মুখের ভাষা, সুসাধ্য সাধন।'

আবার বিদ্বান্ সাধক যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা অধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ক্রমোন্নতির পথে না চলিলে "যম ভয়" কি করিয়া নিবারণ করা যায় ? উত্তরে কমলাকান্ত গাহিয়াছেন,—

'যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদে রটে, সে নামশূন্য জনে বটে ; কিন্তু কমলাকান্তের ঘটে, মিছা সে আতঙ্ক রে ॥'

অন্যত্র আছে—

'যেমন কলি তেমনি উপায়,
কালীনামের জোর ডঙ্কা, বাজেরে।
তারানামের বলে, যে জন চলে,
সে কারে করে শঙ্কা ॥'

কালীতত্ত্ব প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়া তিনি গাইয়াছেন—

'তুমি কার ঘরের মেয়ে কালী গো! আপনার রঙ্গরসে মগনা আপনি।' ইত্যাদি।

কমলাকান্তের কালীতত্ত্ব সাধনার জিনিস ; ইহা কমলাকান্ত পদাবলীর ভিতর দিয়া আভাসে ও ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ ইঙ্গিতই কবচ করিয়া পরবর্ত্তী সাধককে কমলাকান্তের কালীতত্ত্ব প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে হইবে,—ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

* * * *

এইবার বর্দ্ধমানের সোণার মানুষ, মাতৃসাধক কমলাকান্তের মহামহিমোজ্জ্বল জীবনীকথার একটু আলোচনা করিব। সাধারণতঃ

সমালোচকগণের মত এই যে, সাধক বা কবির জীবনী ও তৎসাময়িক অবস্থা জানিতে না পারিলে সাধক বা কবিকে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। সাধকের জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হয়, তাঁহার সময়ে সমাজের যে অবস্থা, তাহা তাঁহার সাধন-প্রণালী ও সঙ্গীতে পরিস্ফুট হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে কমলাকান্তের জীবনী-কথা ঠিক ঠিক জানিবার কোনই উপায় নাই। তবে কতকগুলি কিম্বদন্তী হইতে সাধকের জীবনীর একটা সামান্য আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

চান্নার ভদ্রসমাজে জীবনী-কথা।

বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক হরানন্দ সরস্বতী ও খাঁকী বাবার মতে কমলাকান্তের 'পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টচার্য্য ও মাতার নাম মহামায়া। কমলাকান্ত অম্বিকা-কাল্‌নায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় চান্নায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) অম্বিকা কাল্‌নার অধিবাসী ছিলেন।'

ফরিদপুরের অন্তর্গত খানখানাপুরের বিখ্যাত সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবাকে সাধু হরানন্দ সরস্বতী বলিয়াছিলেন, 'আমার বয়ঃক্রম এখন ৮৫ বৎসর। আমার জন্মস্থান কোটালহাট লাকুড্ডী। আমি বাল্যকালে সর্ব্বদা মার সঙ্গে কমলাকান্তের সাধনাসনে যাইতাম। আমি কালীপদ তর্কবাগীশকে দেখিয়াছিলাম। তিনি কমলাকান্তের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। কমলাকান্ত কৌল ছিলেন। প্রতাপচন্দ বাহাদুর অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। তিনি * * * নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অণিমালঘিমায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। জগজ্জননী কালী ধর্ম্মেরও মা, নারায়ণেরও মা। তাই ধর্ম্ম-নারায়ণের মা সাজিয়া কমলাকান্তের নিকটে গান শুনিয়াছিলেন। চান্নায় তাঁহার জন্মস্থান;—বিশালাক্ষীর মন্দিরে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। নারী বাগ্দীরূপে

কমলাকান্তকে বিশালাক্ষী মাছ দিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামৃত্যু মরিয়াছিলেন। * * * * কমলাকান্তের মহাযাত্রাকালে মা গঙ্গা দর্শন দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের বাড়ীর সম্মুখে কেহ বাড়ী করিয়া বাস করিতে পারে না।'

চান্নার নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী অশীতিপর বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবী ভুলুয়া বাবাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার বাল্যকালের সমস্ত ঘটনা স্মরণ হয় না; বউকালে সকলের মুখে কমলাকান্তের কথা শুনিতাম; তিনি মুখুয্যে-দের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। ঐ শিমূলতলায় তাঁহার পঞ্চমুণ্ডের আসন; ঐ বিশালাক্ষীর মন্দিরে তিনি সাধনা করিতেন। মা বিশালাক্ষী তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন; নারী বাগ্দী হইয়া তাঁহাকে মাছ দিয়াছিলেন। তাঁহার একটী কন্যা ছিল।'

চান্না নিবাসী পণ্ডিত রামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, 'আমরা বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি কমলাকান্ত মুখুয্যেদের দৌহিত্র ছিলেন; শিমূলতলার আসনে তিনি সাধনা করিতেন; ঐ স্থানে মা-জগদম্বা তাঁহাকে ধীবরকন্যারূপে দর্শন দিয়াছিলেন। ধর্ম্মনারায়ণের নাম শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। একটী বিধবারূপে তাঁহার নিকটে গান শুনিয়াছিলেন, একথা শুনিয়াছি। ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় একবার দস্যুগণ তাঁহার জিনিস-পত্র লুণ্ঠন করে, এবং তাঁহার গান শুনিয়া সমস্ত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করে। শেষে দস্যুগণ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ঐ স্থানকে কমলাকান্তের টোলবাড়ী বলে। মহারাজা তেজচন্দ বাহাদুর তাঁহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কোটালহাটে যাইয়া আশ্রম করেন। সেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই প্রবাদ আছে, তাঁহার মরণ সময়ে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গঙ্গা উঠিয়া তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া-ছিলেন।'

মুখুয্যেপাড়ার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, ‘আমার বয়স আশী বৎসর পার হইয়াছে। আমার পিতামহ ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমলাকান্তের বন্ধুত্ব ছিল। আমার পিতামহকে আমি দেখিয়াছি। বাল্যকালের কথা ভাল স্মরণ নাই। কমলাকান্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন—পদকর্ত্তা ছিলেন ; আমার ঠাকুরদাদা বড় গায়ক ছিলেন। তিনি গান রচনা করিতেন, আমার পিতামহ গান করিতেন। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন “ঐখানে কমলাকান্তের বাড়ী ছিল। তাঁহার একটী কন্যা জীবিত ছিল। শিমূলতলার আসনে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। কাঞ্চনপুরে শেষ বিবাহ করেন। তিনি বিশালাক্ষীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। কোটালহাটে দেহত্যাগ করেন।’

চান্নার সোহহং স্বামীর ভক্ত শিষ্য নিরালম্ব স্বামীর বৃদ্ধা মাতা বলিয়াছেন, ‘আমি বউকাল হইতে শুনিয়াছি, কমলাকান্ত মুখুয্যেদের দৌহিত্র। কমলাকান্ত দুইবার বিবাহ করেন। শেষ বিবাহ কাঞ্চনপুরে করেন। তাঁহার কন্যা ছিল। সে মারা গিয়াছে। থাকিলে তাঁহার কাছে সব শুনিতে পারিতেন। মা তাঁহার কাছে গান শুনিতেন। তিনি মাকে দর্শন করিয়াছিলেন। কোটালহাটে দেহত্যাগ করেন।’ *

সাধক শ্রী কমলাকান্তের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। এই বিষয়টী আমি অনেক দিন ভাবিয়া

কমলাকান্তের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল নিরূপণ।

দেখিয়াছি,—আজ পর্য্যন্ত এমন কোন উপকরণ পাই নাই যাহাতে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে ১২৬৪ সালে (ইং ১৮৫৭ সাল) প্রকাশিত “সাধক ৺ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃত শ্যামা সঙ্গীত” গ্রন্থের ভূমিকায় আছে,

* শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবার “কমলাকান্ত” প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

'কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমতঃ অম্বিকা-কাল্‌না হইতে ১২১৬ * সালে বর্দ্ধমান রাজধানীতে সমাগমন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের অপার করুণা প্রসাদাৎ রাজসভা পণ্ডিত হইয়া সমাদৃত হয়েন।' এই গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ বা পুথীতে সাধকের জীবনের কোন ঘটনা বিশেষের নির্দ্দিষ্ট একটা সন তারিখ পাওয়া যায় না। ১২১৬ সালে (ইং ১৮০৯) সাধক কোটালহাটে আসিয়াছিলেন,—শুধু এই সালই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু ১২১৬ সালে যে তাঁহার বয়স কত ছিল তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুমানের উপরও নির্ভর চলে না। ১২১৬ সালে সাধকের যে বয়স কত ছিল তাহা জানিতে পারিলে আবির্ভাবের সন নিরূপণ করা সহজ হইত। কোন লেখক † ১২১৬ সালে সাধকের ৪০ বৎসর বয়স ধরিয়া লইয়া ১১৭০ (১১৭৬ হইবে) সাল তাঁহার জন্মসাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এই বিষয়ে তিনি কোনই প্রমাণ দেন নাই। বর্দ্ধমান রাজবাটীতেও দলিলাদির এমন কোন প্রমাণ নাই যে সাধক চল্লিশ বা ততোধিক বয়সে কোটালহাটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এইবার একবার মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর ও কুমার বাহাদুর প্রতাপচন্দ্রের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহারাজা বাহাদুর ১১৭১ সালের ৬ই মাঘ (ইং ১৭ই জানুয়ারী ১৭৬৪ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৭১ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট (১২৩৯ সালে ২রা ভাদ্র) তারিখে দেহত্যাগ করেন। ১৭৭১—১৮৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাজ তেজ্‌চন্দ্র বাহাদুর রাজত্ব করেন।

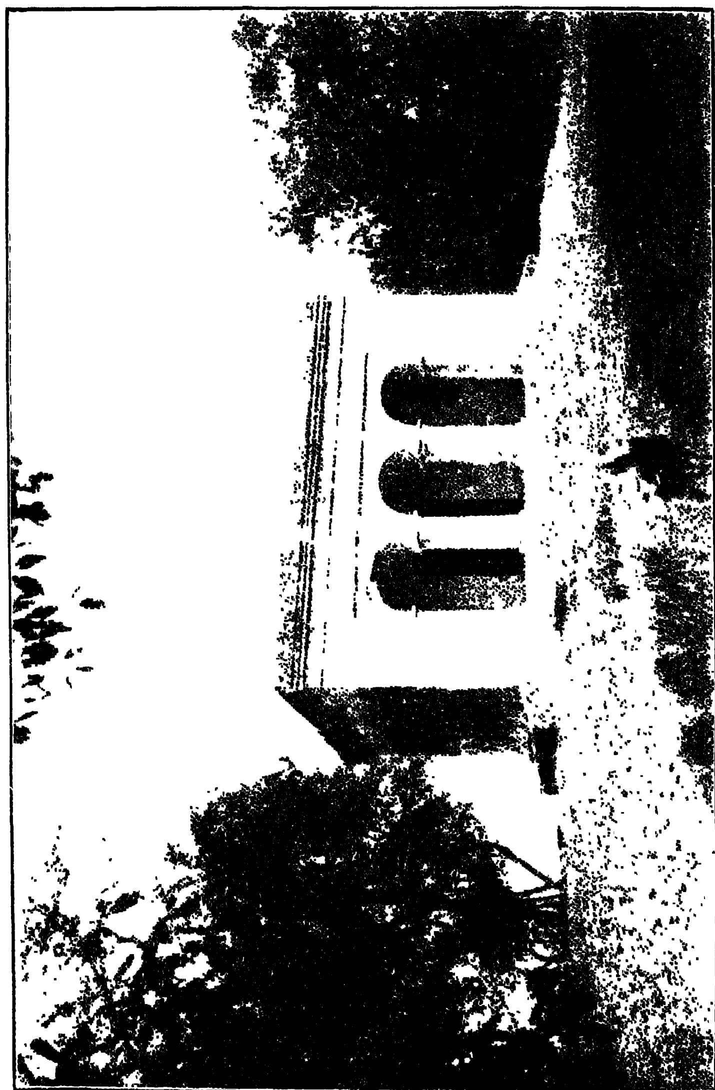
* ১২১৬+৫৯৩=১৮০৯ ইং সন হয়। এখানে সালের মাস ও তারিখ জানা নাই। মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্রের মধ্যে হইলে ইং ১৮১০ সাল হইবে।

† জন্মভূমি—১৩২৭ সাল। আষাঢ় সংখ্যা ১০৩ পৃঃ।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি বলেন, 'যতদুর জানা আছে কুমার প্রতাপ চাঁদের মৃত্যুর পর কমলাকান্তের মৃত্যু হয়।'* ৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'জাল প্রতাপ চাঁদ' গ্রন্থে লিখিত আছে, '১২২৭ (ইং ১৮২০) সালের ২২শে পৌষ রাত্রি দেড় প্রহরের সময় কাল্‌নার রাজবাটী হইতে প্রতাপচাঁদকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হয়।' উক্ত গ্রন্থে তাঁহার জন্মতারিখও পাওয়া যায়। ১১৯৭ সালের (ইং ১৭৯০) কার্ত্তিক মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮২০ সালে কমলাকান্ত জীবিত ছিলেন। কুমার বাহাদুর সাধকের ভক্ত শিষ্য ছিলেন; কথিত আছে, কুমার বাহাদুরের তিরোভাবের (১২২৭ সালের ২১শে পৌষ) অল্পদিন পরই সাধক কমলাকান্ত মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১২২৭ সালের শেষভাগে অথবা ১২২৮ সালে তিনি লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ইহা অনুমানসাপেক্ষ, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে এই অনুমানই করিতে হয়। ইহার পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তেজচাঁদের মৃত্যু হয়। ১৮২০—৩২ এই বার বৎসরের ভিতর সাধক কমলাকান্তের যে তিরোভাব হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ বার বৎসরের মধ্যে কোন্ সালে যে কমলাকান্ত দেহত্যাগ করেন তাহা ঠিক ঠিক জানিবার কোনই উপায় নাই।

কাল্‌নার অন্তর্গত চুপীর বিখ্যাত দেওয়ান মহাশয় রঘুনাথ রায় সাধক কমলাকান্তের সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে, দেওয়ান মহাশয় কমলাকান্তকে মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুরের নিকট পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি ১১৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৩ সালে নন্দোৎসবের দিন দেহত্যাগ করেন। এই তারিখ হইতে জানা যায় যে যখন কমলাকান্ত বর্দ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হন তখন দেওয়ান মহাশয়ের বয়স ৫৯

* বর্দ্ধমানাধিপতির চিঠি হইতে উদ্ধৃত। তারিখ ১১।১১।২০।



ছিল। কিন্তু ইহা হইতে কমলাকান্তের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ কিছুই জানিতে পারা যায় না।

জনশ্রুতি মতে সাধক ৫০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন *। তাহা হইলে উপরোক্ত ১২২৮ সাল সাধকের তিরোভাবের তারিখ ধরিয়া লইলে তিনি ১১৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'জীবনী-সংগ্রহ' লেখক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'সাধক কমলাকান্ত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কাল্না গ্রামে অনুমান ১১৭৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।' এই তারিখ নিরূপণে তিনি কোনই প্রমাণ দেখান নাই। যাহাহউক উপরোক্ত হিসাব হইতে সাধকের জন্ম-মৃত্যুর সন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমান ভিন্ন বর্ত্তমানে অন্য কোন প্রমাণ নাই।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা জংসনের অনুমান দেড়ক্রোশ উত্তরে চান্না গ্রাম। এই গ্রাম হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে খড়িয়া নদীর দক্ষিণে

চান্নায় বিশালাক্ষী মন্দির।

বিশালাক্ষী মন্দির। মন্দিরের সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ৯৯ বিঘা; বিশালাক্ষী দেবীর সেবা ও পূজার জন্য এই জমি বর্দ্ধমান রাজসরকার দেবোত্তর দিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে বিশালাক্ষীর বর্ত্তমান সেবাইতগণ ঐ জমির অনেকাংশ লাখেরাজ বলিয়া হস্তান্তর করিয়াছেন। আমি বিগত ২১শে চৈত্র (১৩২৬ সাল) শনিবার এই মন্দির দেখিয়া আসিয়াছি।

জনশ্রুতি মতে, কোটালহাটের সাধক কমলাকান্ত এই মন্দির সংলগ্ন পঞ্চমুণ্ডী আসনে সাধনা করিতেন। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম এবং

* শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, 'শুনিতে পাই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ৪০ কি ৫০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।'

উহার আশেপাশে অনেকগুলি ডাঙ্গা আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির ও পঞ্চমুণ্ডী আসনের চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি জঙ্গল কাটাইয়া মন্দির ও আসনের সংস্কার সাধিন করিয়াছেন।

মন্দিরের পশ্চিমে দুইটী শিমূল গাছের মাঝখানে কমলাকান্তের আসন দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি এবং শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর নির্দ্দেশানুসারে বর্দ্ধমানাধিপতি বিলাতী মাটী দিয়া আসনখানা অতি পরিপাটীরূপে বাঁধাইয়া দিয়াছেন। আসনের মাঝখানে একখানা শ্বেতপ্রস্তরে কালো অক্ষরে নিম্নলিখিত চারিটী পংক্তি উৎকীর্ণ আছে—

'সাধক প্রবরস্থাত্মা-
পদপঙ্কজসেবিনঃ।
আসনং কমলকান্ত-
স্থাত্রৈবাসীদ্ দ্বিজন্মনঃ॥'

শুনিয়াছি বর্দ্ধমানাধিপতির টোলের কোন পণ্ডিত উপরোক্ত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন।

বিশালাক্ষী মন্দির সম্বন্ধে ফরিদপুরের অন্তর্গত খানখানাপুর আশ্রমের বিখ্যাত সাধক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা লিখিয়াছেন, 'বিশালাক্ষী কোন্ সময়ে কাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা, তাহা নির্ণয় করিতে কাহারো সাধ্য নাই। এই মন্দিরের অর্চ্চনাপদ্ধতির বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমাদের ধারণা হয় জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক কর্ত্তৃক এই স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।'

'প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লানবমীতে এই বিশালাক্ষীর মন্দিরে আড়ং মিলিয়া থাকে। বহুস্থান হইতে ভক্ত বিশালাক্ষী দেবীর অর্চ্চনার জন্য নানাবিধ সামগ্রী সঙ্গে করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বত্র দেবী মন্দিরে পূজা হইয়া

থাকে, এই স্থানের পূজা পদ্ধতির সঙ্গে তাহার বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী মন্দিরে দেবীর সম্মুখে বলিদানের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু বিশালাক্ষীর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বেই ছাগ, মেষ, শূকর, মহিষ, হাঁস, কবুতর প্রভৃতি বলিদান করা হয়। এইরূপ বলির প্রথা শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী-কালের তান্ত্রিক সাধকগণের স্থাপিত দেবীমন্দিরে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বেও কুচবেহার ত্রিপুরা প্রভৃতি বহুপ্রাচীন পার্ব্বত্যরাজ্যে দুর্গোৎসবাদির সময় এইরূপ নির্ব্বিচারে হীনপ্রাণীর বলিদান করা হইত।'

মন্দিরের চারিদিকে * 'হীনপ্রাণীর' বলিদানের ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভুলুয়া বাবা আপত্তি তুলিয়াছেন। বলিদান বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্র কি বলিয়াছেন তাহা এখানে আলোচনা করিব। 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের' ষষ্ঠোল্লাসে আছে—

'মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্।
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে।
যদ্‌যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ॥'

দেবতাকে কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী। যে যে মাংস বা যে যে বস্তু আপনার প্রিয় হইবে, তাহাই ইষ্টদেবতাকে প্রদান করিবে। আবার কোন কোন দেশে নীলতন্ত্র ও অন্নদাকল্পের বিধানানুসারে কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি বলিদান করা হইয়া থাকে। 'মুণ্ডমালা' তন্ত্রের ৪র্থ পটলে আছে—

* মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটু দূরে অতি পূর্ব্বে ডোমেরা শূকর বলি দিত। বর্ত্তমানে চান্নাগ্রামে ডোম নাই, শূকর বলি আর হয় না। ইহা আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া আসিয়াছি।

'ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাৎ মৃগে মোক্ষফলং ভবেৎ॥
দত্তে পক্ষিণি ঋদ্ধিঃ স্যাৎ গোধিকায়াং মহাফলং।' ইত্যাদি।

তন্ত্রোক্ত শাসন ও বিচার চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ছাগ, মেষ, মহিষ, পারাবত প্রভৃতির বলিদান 'হীন বলি' নয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে দেবীর নিকট সিংহ বলি, ব্যাঘ্র বলি বা নরবলি (যথা, 'সিংহ ব্যাঘ্রনরান্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ।') বিশিষ্টভাবে নিষিদ্ধ। 'মহানির্ব্বাণ' তন্ত্র বলিদান সম্বন্ধে অতি উদার বিধান দিয়া বলিয়াছেন 'যে যে মাংস আপনার প্রিয় হইবে তাহাই ইষ্টদেবতাকে দিবে।' কোল-ভীলের রুচি হইতে সুসভ্য সমাজের রুচি বিভিন্ন, সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে তন্ত্রোক্ত বিধানমতে বলিদান করিতে পারে। এই হিসাবে চান্নার বিশালাক্ষী মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে 'ছাগ, মেষ, শূকর, মহিষ, হাঁস, পারাবত' প্রভৃতির বলিদান দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। আমাদের বাংলা-দেশের অনেক স্থলেই গ্রামের প্রান্তসীমায় 'লুড়াইতলীতে' কবুতর বলি হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য দেশসমূহের অধিবাসীরা সম্ভবতঃ তন্ত্রের মূল বিধানানুসারে দেবীর সম্মুখে বলিদান করিয়া থাকে, কারণ তাহাদের বলিদান পদ্ধতি দেখিয়া ইহাই মনে হয়।

শ্রীমৎ ভুলুয়া সন্ন্যাসী অপর একস্থলে লিখিয়াছেন 'এই স্থানে কোন দেবদেবীর প্রতিমা নাই। তাম্রপাতে নির্ম্মিত পাঁচটী অস্বাভাবিক মুণ্ড আসনের উপর স্থাপিত আছে।' আমি চান্নার মন্দিরে এই পাঁচটী মুণ্ড বিশিষ্টভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে কালো রংএর মাটীর পাচটী ডিম্বাকৃতি মাথায় টোপর পরা মুণ্ড রত্নবেদীর উপর হেলানভাবে স্থাপিত। মুখ-হা করা; নাক, ভ্রূ, চক্ষু সবই আছে। চান্না গ্রামে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরেও এইরূপ একটী মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এই শেষোক্ত

মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় সম্ভবতঃ এই পঞ্চমুণ্ড পঞ্চধ্যানি বুদ্ধের মূর্ত্তি হইবে এবং বাংলায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজার প্রবর্ত্তনকালে এই মূর্ত্তি হিন্দু দেবতার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর মতে 'বিশালাক্ষীর মূর্ত্তি মাত্র পাঁচটী মাটীর মুণ্ড, স্ত্রীজাতীয় মুণ্ড বলিয়াই অনুমিত হয়। এই মুণ্ডগুলিই বিশালাক্ষীরূপে পূজিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কেবলমাত্র মুণ্ডপূজা দেখিয়াছি। ধ্যানের সঙ্গে মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। ইহা বর্দ্ধমানের রাজাদের অথবা তাঁহাদের কোন আত্মীয়ের স্থাপিত, রাজবাড়ীর কাগজপত্রে তাহার অনুসন্ধান করিবেন।' শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী আমাকে লিখিয়াছেন, 'বিশালাক্ষী দেবী সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা নাই। সেজন্য কোন মত দিতে পারিলাম না। তবে মুণ্ডের উপরে দেবীপূজা আমি দেখিয়াছি। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থান জয়রামবাটী গ্রামে ৺সিংহবাহিনী দেবীর পূজা এইরূপে হয়। কাংস্য-নির্ম্মিত চুমকি-ঘটির-আকার-পাত্রোপরি একখানি মুখ, উহাতেই দেবীর আবির্ভাব। ঐ মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে অন্য দুইটী এইরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহার দুই সখি জয়া বিজয়ার আবির্ভাব কল্পনা করা হয়।'

চান্নার বিশালাক্ষী মন্দির সাধারণ চণ্ডীমণ্ডপের মত চতুষ্কোণ ইষ্টকগৃহ। মন্দিরের গঠন-প্রণালীতে কোন বিশেষত্ব নাই। চান্নার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'বর্দ্ধমান নিবাসী ৺মানিকরাম বাবু * ও ৺বাশুল্যরাম চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গঠন-প্রণালী তান্ত্রিকভাবে নির্ম্মিত, এই মন্দির কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।' আমি মন্দিরের গঠনপ্রণালী বিশিষ্টভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

* প্রবাদ এই যে ইনিই উত্তরকালে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইনি দেওয়ান মানিকচাঁদ নামে বিখ্যাত।

বাংলার প্রতি গৃহে যেরূপ চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর আবাহন ও পূজা হয় সেইরূপ একখানা পাকা কুঠরীতে বিশালাক্ষীর পূজা হয়। এই মণ্ডপখানা শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া আমার ধারণা। আমি মন্দিরের মাপ লইয়াছিলাম। সম্মুখের বারান্দা পাশে দুই হাত, মাঝখানে তিনটী খিলান আছে। সম্পূর্ণ মন্দিরটী পাশে ১০॥ হাত, দৈর্ঘ্যে ১১ হাত ও উচ্চতায় ৮ হাত। ভিতরকার ছাদে ১২টী কাঠের বর্গা আছে। মন্দিরের একটী মাত্র দরজা, উহা বাহির হইতে শিকল দিয়া ভেজান থাকে। ভিতরের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে একখানা রত্নবেদী সংলগ্ন আছে। সম্ভবতঃ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় এই রত্নবেদীতে তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষীর মূর্ত্তি ছিল। এখন আর সেই মূর্ত্তি নাই। এমনও হইতে পারে যে উত্তরকালে এই মন্দিরের রত্নবেদীতে বৌদ্ধ ডোমেরা ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবে। চান্না গ্রামে ধর্ম্মঠাকুরের মুণ্ড দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে হিন্দুর বিশালাক্ষী মন্দিরে বৌদ্ধ যুগের অবসানে ধর্ম্মঠাকুরের পাঁচটী মুণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কবি ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' পড়িলে মনে হয় যে ধর্ম্মপূজা সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা। ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্ম্মমঙ্গলার সম্বন্ধ বড় বেশী নাই। এই মন্দির বিশালাক্ষীর, এখানে পুরোহিত তন্ত্রমতে দেবী বিশালাক্ষীর পূজা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। 'তন্ত্রসারের' ধ্যানেই দেবীর পূজা ও ন্যাস হয়। পাঁচটী মুণ্ডের একটী মুণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেবাইতেরা অপর একটী নূতন মুণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। বেদীর নীচে পূর্ব্বদিকে ভৈরব নাথের কতকগুলি ছোট ও বড় মাটীর ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশালাক্ষীর পূজা দৈনিক হয়, গ্রাম হইতে পূজারী আসিয়া পূজা করিয়া যান। নিত্য পূজায় আধসের আতপ চাউল, একটী ছোট গুড়ের লাড়ু ও ফুল-জল-বেলপাতা দেওয়া হয়। কাহারও মতে পাঁচ পোয়া আতপ

চাউল, রম্ভা ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা হইয়া থাকে। তন্ত্রোক্তমতে পঞ্চোপচারে নিত্য পূজা হয়, ভোগ বা শীতলের কোন ব্যবস্থা নাই। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লানবমী তিথিতে † সামান্য আয়োজন সহকারে বাৎসরিক পূজা হয়, সেই সময়ে একটী মেলাও বসে। এই পূজার সময় ছাগ ও মেষাদি বলির ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটু দূরে ডোমেরা শূকর বলি দিত, এখন এই বলি উঠিয়া গিয়াছে। আশ্বিনের শুক্লানবমী তিথিতে বৎসরে একবার পূজা ও বলিদান হয়। দেবীর নিত্য ও বাৎসরিক পূজার সময় প্রায় প্রতি মন্ত্রের শেষে 'ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' ইত্যাদি প্রয়োগের বিধি আছে।

বিশালাক্ষী দেবীর অর্চ্চনা পদ্ধতির বিবরণ শুনিয়া ভুলুয়া বাবা স্থির করিয়াছেন যে কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই অভিমতের স্বাপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। বিশালাক্ষী হিন্দু তন্ত্রোক্ত দেবী। * 'আদি যামলে' বিশালাক্ষী দেবীর ধ্যান ও পূজার উল্লেখ আছে।

'তন্ত্রসার' বলেন—

'ঋষিরস্য মহেশানি সদাশিবোমহাপ্রভুঃ।
পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দশ্চ কথিতং বিশালাক্ষী চ দেবতা॥
শক্তিঃ প্রণবমিত্যুক্তং লজ্জাবীজঞ্চ বীজকং।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥'

---

† আষাঢ়ে নবমী পূজার সময় বর্দ্ধমান রাজষ্টেট হইতে প্রতি বৎসর একটী টাকা দেওয়া হয়। যখন এই চান্না গ্রাম খাসে ছিল তখন বৎসরে দুইবার পূজার সময় চারি টাকা দেওয়া হইত। এই মহাল পত্তনী দেওয়ায় এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

* 'বিশ্বসার তন্ত্রে' আছে—'গুড়াপ্রেতা বিশালাক্ষী সতী সাধ্বী বিরূপিণী। বিকক্রঃ শোভনী চণ্ডী প্রচণ্ডা অতিচণ্ডিকা॥'

দেবীর ধ্যানে আছে—

'দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাং।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গখেটকধারিণীং॥
নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং॥
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাং॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাং।
সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥'

এইভাবে ধ্যান করিয়া যথাসম্ভব উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণকালে 'বর্ণলক্ষং জপেৎ সুধীঃ।' বিশালাক্ষীর যন্ত্র এই, —'প্রথমতঃ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে অষ্টদল পদ্ম, বৃত্ত, চতুরস্র ও চারি দ্বার অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। এই যন্ত্রে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী বিশালাক্ষী দেবীকে আবাহন করিয়া যথাবিহিত পূজা করিবে। ত্রিকোণ মধ্যে মহাদেবীর পূজা করিয়া ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিবে। তৎপর 'ওঁ পঙ্কজাক্ষ্যৈ নমঃ' এইরূপে বিশালাক্ষী, বক্রাক্ষী, সুলোচনা, একনেত্রা, দ্বিনেত্রা, কোটরাক্ষী ও ত্রিলোচনা প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া পত্রাগ্রে পশ্চিমাদিক্রমে অষ্টসিদ্ধিস্বরূপিণী অষ্ট যোগিনীর পূজা করিতে হইবে। চতুরস্র ইন্দ্রাদিলোকপালের পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। তৎপরে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপশেষে পূজা সাঙ্গ করিবে। এই পূজায় দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে ন্যাস করিবার বিধি,কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ বামাবর্ত্ত বিধানে ন্যাস করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বিশালাক্ষী দেবীর পূজা ও ন্যাস হিন্দু তন্ত্রোক্ত বিধানমতই সম্পন্ন হয়, ইহার সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকের কোন

সম্বন্ধ নাই। বিশালাক্ষীর পূজা বাংলায় স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে এবং এই দেবী.বিশেষের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত ভক্ত তান্ত্রিকও দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে কোন কোন লেখক বলেন 'চণ্ডীদাস বজ্রযান-উদ্ভূত তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধক ছিলেন।' 'কোনও প্রামাণিক হিন্দুশাস্ত্রে বাশুলী দেবীর নামোল্লেখ নাই।' 'বজ্রেশ্বরী সাধারণের মুখে অপভ্রংশে বাজশালী বা বাশুলীতে পরিণত হইয়াছে।' ইঁহারা এইভাবের মনগড়া মতবাদের দ্বারা হিন্দুর তন্ত্রকে উড়াইয়া দিয়া চণ্ডীদাস, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগকে জনসাধারণের নিকট 'বৌদ্ধতান্ত্রিক' রূপে পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই মতবাদ যে কতটা প্রকৃত তাহা হিন্দুমাত্রেই ভাবিয়া দেখিবেন। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক সাধনায় বৌদ্ধতন্ত্রের অল্পবিস্তর প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়, তাহা বলিয়া হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র বৌদ্ধশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা কখনই বলা যায় না। জোর করিয়া যাঁহারা তারা প্রভৃতি দেবতাকে বৌদ্ধদেবী বলিয়া প্রমাণ করিতে চান, তাঁহারা 'নূতন একটা করো' এইমতেরই পরিপোষক। ইঁহারা বৌদ্ধমতের চস্‌মা চক্ষে দিয়া হিন্দুর আপামর তেত্রিশ কোটি দেবতাকে 'বৌদ্ধ দেবতা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপ অভিনব ব্যাখ্যা সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের নিকট কিছুদিনের জন্য ভাল লাগিতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহারা তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর প্রকৃত রহস্য জানিলে পর ঐ সাময়িক ভাবব্যাখ্যায় প্রীত হইবেন না। যাহাহউক বিরাট্ হিন্দুসমাজ এই অভিনব ভাব প্রচারে বড় একটা আস্থা স্থাপন করেন বলিয়া মনে হয় না; তাঁহারা পূর্ব্বাপর তন্ত্রের দেবদেবীকে যে চক্ষে দেখিতেন এখনও সেই চক্ষেই দেখিতেছেন। তাঁহারা জানেন 'তারা' দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা, ইঁহার সহিত 'শূন্যবাদ' বৌদ্ধধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই।

* * * *

বিশালাক্ষী মন্দিরে বর্ত্তমানে তন্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর প্রতিমা নাই সত্য, ঘট ও যন্ত্রেই দেবীর পূজা ও বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। রত্নবেদীতে মৃন্ময় নির্ম্মিত পাঁচটী মুণ্ড আছে। কেহ কেহ বলেন 'বিশালাক্ষী মন্ত্রে দীক্ষিত কোন সাধক এখানে পঞ্চমুণ্ডী আসনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থ পাঁচটী মুণ্ড মন্দিরে সংরক্ষিত হইয়াছে।' কিন্তু এই উক্তি খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তন্ত্রোক্ত শৃগাল মুণ্ড, বানর মুণ্ড, সর্প মুণ্ড ও দুইটী চণ্ডাল মুণ্ড এই পঞ্চমুণ্ডের সহিত মন্দিরের পঞ্চ মুণ্ডের কোনই সাদৃশ্য নাই। শুনিয়াছি চান্না হইতে ৬।৭ মাইল দূরে সারুলা গ্রামেও এইরূপ পাঁচটী মুণ্ড আছে, তবে আমি নিজে সেই মূর্ত্তিগুলি দেখিবার সুবিধা ও সুযোগ পাই নাই। কাজেই এই উভয় স্থানের পঞ্চ-মুণ্ডের তুলনায় সমালোচনা করিতে পারিলাম না।†

'বাঙ্গালা ভাষার' অভিধানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় 'বাসুলী' শব্দ সংস্কৃত বিন্ধ্যবাসিনী হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিন্ধ্যবাসিনী কংস-হস্ত-ভ্রষ্টা মহাশক্তি অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছেন। তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষী দ্বিভুজা, কিন্তু বিন্ধ্যাচলের দেবীমূর্ত্তি অষ্টভুজা। এই দুই মূর্ত্তি যে বিভিন্ন তাহা তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যান পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। কাহারও মতে 'বাশুলী' বা 'বাশুলি' বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি আই ই মহাশয়ের মতে বাসুলী ও বিশালাক্ষী ধর্ম্মের পৃথক্ দুই আবরণ দেবতা। 'ধর্ম্মপূজা বিধান' গ্রন্থে * আছে—

† কেহ সারুল গ্রামের পঞ্চমুণ্ডের বিবরণ আমাকে পাঠাইয়া দিলে আমি কৃতার্থ মনে করিব।

* এসিয়াটিক সোসাইটীর ৫৪৩৮ সংখ্যক তালপাতার পুথী।

'ওঁ আম্নাতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে।
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে॥
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নুপূরং বাদয়ন্তী।
কৃত্বা হস্তেচ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥'
ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।
'ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে—সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুল দূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীং॥
অসিদ্ধ সাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবী সান্নিধ্যমিহ কল্পয়ে॥'

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন 'বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক এবং বৌদ্ধ দেবী।' এক সময়ে গৌড়বঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় বজ্রসত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানিবুদ্ধ ও বজ্রেশ্বরী নাম্নী তাঁহার শক্তি কল্পনা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বজ্রেশ্বরী শব্দ বজ্জশ্বরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাসুলীতে পরিণত হইয়া থাকিবে। *

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ উত্তরে আনুড় গ্রামেও এক বিশালাক্ষী দেবী আছেন। মাঠের মধ্যে ছাদশূন্য গৃহে দেবীর অবস্থান। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পাদটীকায় (৪৩ পৃঃ) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন,—'উক্ত দেবীর নাম বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী তাহা স্থির করা কঠিন। * * * মনসা দেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিত হইয়া এখানে লোকের

* সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্যত্র অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়।' আনুড়ের বিশালাক্ষী মনসা দেবী হইতে পারেন, কিন্তু চান্নার বিশালাক্ষী তন্ত্রোক্তা দেবী বিশালাক্ষী,—সেই ধ্যানেই দেবীর পূজা হয় এবং সাধক কমলাকান্ত এই দেবীরই পূজা করিতেন বলিয়া জনসাধারণের ধারণা। এই মন্দিরে পাঁচটী অদ্ভুত মূর্ত্তি যে কি করিয়া স্থান পাইল সে সম্বন্ধে আমার অনুমান পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশালাক্ষী মন্দির সম্বন্ধে অধিক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই, ভবিষ্যতে পারিলে যথাসময়ে তাহার আলোচনা করিব।

* * * *

কমলাকান্ত-জীবনী আলোচনা।

সাধক কমলাকান্তের জীবনীর ধারাবাহিক আলোচনা বাংলাদেশে হয় নাই বলিলেও চলে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ৺ মহ্তাব্ চান্দ বাহাদুর ১২৬৪ সালের ২২শে ভাদ্র কমলাকান্ত পদাবলী' ৺ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য,—আমি বাংলার নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ইহা পাই নাই। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে ইহার একখানি খণ্ড আছে। আমি বর্দ্ধমানাধিপতির অনুগ্রহে উহার আংশিক নকল পাইয়াছি। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে, 'মহারাজা বাহাদুর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতৃবধূর নিকট হইতে তাঁহার নিজ গৃহস্থিত ও স্বহস্তে লিখিত পুথী সংগ্রহ করিয়া উহা ছাপাইয়াছিলেন। এই হিসাবে এই পদাবলী-সংগ্রহ বিশেষ প্রামাণিক। মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুসন্ধিৎসার ফলেই কমলাকান্তের পদাবলী বাঙ্গালী প্রথমে ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইয়াছেন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরিশেষে এই গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্ত্তীকালের লেখকগণ পদাবলী সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। রাজবাটীর এই গ্রন্থে ২৬৯টী পদাবলী আছে। উত্তরকালে বিশেষ ও মৌলিক অনুসন্ধানে কোন নূতন পদাবলী আর সংগৃহীত হয় নাই এবং বর্ত্তমানে সে পন্থা সম্পূর্ণরূপে কণ্টকাকীর্ণ। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও বর্দ্ধমান রাজবাটীর মূল পুথীখানা * পাই নাই। মনে হয় যে ছাপাখানায় (ভাস্করযন্ত্রে) মহারাজা বাহাদুর গ্রন্থখানা ছাপাইয়াছিলেন সেই প্রেসেই উহা ছাপাখানার লোকদের হাতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক বর্দ্ধমানাধিপতি একটু যত্ন করিলেই ঐ মূল পুথীখানা কোটালহাটের কালীবাড়ীতে অথবা রাজবাড়ীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করিতে পারিতেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর হাতের লেখা এবং তাঁহার ব্যবহৃত বহু জিনিস সেই সুদূর অতীতকালে বৈষ্ণব ভক্তেরা অতি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সাধক কমলাকান্ত রাজবাটীর আশ্রয়ে না থাকিয়া জনসাধারণের মধ্যে বাস করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার স্বহস্তলিখিত পদাবলীর বিলোপসাধন হইত না। তবে ইহা ঠিক যে মহারাজা বাহাদুরের বিশেষ চেষ্টায় "কমলাকান্ত পদাবলী" বঙ্গসাহিত্যে সংরক্ষিত হইয়াছে, এজন্য বাঙ্গালীমাত্রেই মহারাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের 'ভূমিকায়' সাধক সম্বন্ধে দেশ প্রচলিত প্রবাদগুলির কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্দ্ধমানের পর কলিকাতা ৫৮নং পটলডাঙ্গা পটুয়াটোলা লেন হইতে ১২৯২ সালে শ্রীকান্ত মল্লিক 'কমলাকান্ত পদাবলী' প্রকাশ করেন। এই বইখানা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য হইলেও কলিকাতার কোন কোন গ্রন্থাগারে

* বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে বিগত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯১৯) জানাইয়াছেন—'We have no manuscript of Kamalakanta Padabali in our library; so the question of photographing a page of it does not arise.'

দেখিতে পাওয়া যায়। * এই গ্রন্থে ২৬৯টী পদাবলী আছে, তন্মধ্যে শ্যামাবিষয়ক পদ ২৪১টি এবং কৃষ্ণবিষয়কপদ ২৪টী আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৯। মল্লিক মহাশয় বর্দ্ধমান রাজবাটীর ভূমিকা অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে সাধকের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহে সর্ব্বপ্রথমে প্রচলিত প্রবাদগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাই এই সংগ্রহ-গ্রন্থের বিশেষত্ব বা নূতনত্ব।

ভাবিয়াছিলাম ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা-বিষয়ক-প্রস্তাব' ও শ্রদ্ধাস্পদ দত্তমহাশয় লিখিত 'History of Bengali Literature' গ্রন্থে সাধকের জীবনীর আলোচনা দেখিতে পাইব। দুঃখের বিষয় এই মহাত্মাদ্বয় কমলাকান্ত সম্বন্ধে কোন কথাই লেখেন নাই; ইঁহারা কেন যে এত বড় শাক্ত কবির কথা বাদ দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানে নিরূপণ করা অসম্ভব।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় আমাকে একখানা বটতলা সংস্করণের 'শ্যামা-সঙ্গীত' বই পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৪। ইহাতে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, মহারাজা রামকৃষ্ণ, কুচবিহারাধিপতি হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, রাজা শিবচন্দ্র (নবদ্বীপ), কালিদাস ভট্টাচার্য্য (মুর্শিদাবাদ বালুচর) প্রভৃতি শক্তিসাধকদের পদাবলী সংগৃহীত আছে। 'কোটালহাট নিবাসি সাধক শিরোমণী কবিবর ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত' ৮০টী পদ এই গ্রন্থে ৫৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক 'ঘরবাড়ি ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা' এই পদটীর ব্যাখ্যায় পাদটীকায় (৮৪ পৃঃ) লিখিয়াছেন, 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা নামক একটা বৃহৎ প্রান্তর শ্মশাণ ভুমি বদ্ধমান জেলায় অধিন আছে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে, চৈতন্য লাইব্রেরীতে ও মৃজাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন গ্রন্থাগারে এই বহিখানা আছে।

তাহাতে লোকজন কি জন আদি নাই দস্যুলোকের দস্যুতা করার একটি রঙ্গভূমি বটে তথাতে অনেক লোক দস্যুহস্তে নিহত ও ধনসম্পতী অপহৃত হয়। কমলাকান্তের কোটালহাটের ভদ্রাসন বাটীতে তাহার একটী ষপের ঘর তাঁহাতে তাহার প্রতিষ্ঠিত আদ্যা মূর্ত্তি ও ত্রিমুণ্ডি আসন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সে জিবন নিতান্ত দ্রষ্টব্য।' * বিক্রমপুরের ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'সঙ্গীত-মুক্তাবলী' (১৩০০ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে কমলাকান্ত রচিত ২৮টী পদাবলী সংযোগ করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি সাধকের অতি সংক্ষেপ পরিচয় দিয়াছেন। এই পরিচয়ের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন—'একদিন কমলাকান্ত স্বপনে তাঁহার ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হন, এবং নিদ্রাভঙ্গে না দেখিয়া এই গানটী রচনা করেন। "হায় গো আমার কি হলো। হৃদি সরোজ মাঝারে কাল কামিনী লুকালো ॥" ইত্যাদি।

'বসুমতী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "কমলাকান্ত পদাবলী" গ্রন্থে ২৬৬টী পদাবলী আছে। জীবনীর আলোচনা এই সংগ্রহ গ্রন্থে একেবারে নাই।

'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত (১৩১২ সালে প্রকাশিত) 'বাঙ্গালীর গানে' ৮০টী পদাবলী আছে। লাহিড়ী মহাশয় ১৫টী লাইনে অতি সংক্ষেপে সাধকের মামুলি পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত কার্য্যালয় হইতে ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সাধকের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী-কথা আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে নূতন কিছুই নাই।

---

* এই গ্রন্থে লিখিত পদবিশেষের ভাষা ও বানান আমি জনসাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য যথাযথ উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রাচীন লেখকদের ভাষা বা বানানের সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার আমার নাই, সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা পরিহার করিয়াছি।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রামপ্রসাদের জীবনী, কাব্য ও পদাবলীর আলোচনার পর পাঁচটী লাইনে কমলাকান্ত প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,'কমলাকান্ত ভাট্টাচার্য্য ১৮০০ (১৮০৯ সাল হইবে) খৃঃ অব্দে অম্বিকা-কাল্না হইতে বৰ্দ্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বৰ্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামা বিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর।' *

---

* রায় বাহাদুর তাঁহার ইংরাজী 'History of Bengali language and Literature' (page 722 : Published by the University of Calcutta in 1911) গ্রন্থেও অতি সংক্ষেপে কমলাকান্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'Kamala Kanta Bhattacharyya, born in the last part of the 18th century. He was formerly an inhabitant of Ambikanagara in Kalna, but removed to Kotalhata in Burdwan in the year 1800. He was the religious preceptor of Maharaj Tejachandra of Burdwan. I may here give *one* of his songs :=

"In whatever station I may be placed, it all becomes blessed, if I forget thee not. O Mother! this life, the bitter cup of life, is a source of bliss, if I can feel thy grace in my heart. Ashes and clods of earth, or precious jewels, lodging beneath a tree for want of a roof, or a seat on the royal throne to Kamalakanta all these are of equal value, when in his heart thou dwellest."

মূল পদাবলীটি এই :—

'যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে।
সকলই সফল যদি না ভুলি তোমারে॥
জনম করম দুখ, সুখ করি মানি।
জলদ বরণী যদি নিরখি অন্তরে, শ্যামা॥
বিভূতি ভূষণ কি রতন মণিকাঞ্চন।
তরুতলে বাস কি রাজসিংহাসনে॥
কমলাকান্ত উভয় সম সাধন, জননি!
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে, গো মা॥'

কমলাকান্তকে যে তিনি এত সহজে ছাড়িয়া দিয়াছেন ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকের আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই, বরং আমরা সুখী হইয়াছি। তিনি পাকা হাতে সাধকের চিত্র 'ভাবের মুখে' যে ভাবে ফুটাইয়া তোলেন তাহা শুনিতে কাহারও বড় একটা রুচি হয় না; তাঁহার অভিমত না শুনিতে পাইলেই আমরা ভাগ্য বলিয়া মনে করি। ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় 'কমলকান্ত' প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ,—১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, মাঘ সংখ্যা, পৃঃ ২৭২) লিখিয়াছেন—'শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বিখ্যাত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকেও এই মহাত্মার প্রতি সুবিচার করেন নাই।' যিনি সাধকের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতে অসমর্থ তাঁহার লেখনীতে ঐ সকল বিষয়ের বিচার ও আলোচনা যত কম হয় ততই ভাল।

ভক্তকবি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালী সাহিত্য' (১৩১৮ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় কমলাকান্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'ভক্ত কমলাকান্তের শ্যামাবিষয়ক গান প্রসিদ্ধ। এক সময়ে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ইঁহার গান গীত হইত। এখনো যে ভক্তসমাজে না হয়, তাহা নহে। তবে সত্যের অনুরোধে বলিব, ইহাতে প্রসাদের সেই প্রাণ মাতোয়ারা মহামাতৃভাবের মহাবিকাশ নাই। গানগুলি পাণ্ডিত্য, ভাবুকতা ও কবিত্বের পরিচায়ক হইলেও, প্রসাদের সেই আকর্ষনীশক্তি ইহাতে নাই।' এই উক্তি ভক্তকবির প্রাণের কথা কিনা জানি না। কমলাকান্তের পদাবলী যিনিই পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন তিনিই বলিবেন উহাতে মহামাতৃভাব সাধনার প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান, সেই সাধন-পথে চলিলে তবে মাতৃভাবের বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। প্রসাদ ও কমলাকান্ত উভয়েই একই শ্যামা-মায়ের সিদ্ধভক্ত,—তাঁহাদের মত মায়ের ভক্ত সন্তান সেই যুগবিশেষে

ছিল না বলিলেও চলে। তাঁহাদের উভয়ের ভিতর ও বাহিরে যে মাতৃভাবের পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল একথা বলিলেও বোধ হয় সাধকদের প্রতি যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না। আশা করি শ্রদ্ধাস্পদ রক্ষিত মহাশয় এতদিনে কমলাকান্ত সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বমত পরিহার করিয়াছেন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ের সম্পাদিত 'বর্দ্ধমানের ইতিকথা' (১৩২১ সনের প্রকাশিত) পুস্তিকায় শ্রীরাখালরাজ রায় কমলাকান্ত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'মহারাজ তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অম্বিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন ও শেষ বয়সে বর্দ্ধমান নগরে বাস করিয়াছিলেন। * * কোটালহাটে সাধক কমলাকান্ত বাস করিতেন।' এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ছিল বলিয়াই মনে হয় রায় মহাশয় কমলাকান্ত সম্বন্ধে কিছুই লিখিবার অবসর পান নাই। 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক 'কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য' প্রবন্ধে (১২৯৮ সনে প্রকাশিত) সাধকের জীবনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় নূতন কিছুই সংগৃহীত হয় নাই। কুমিল্লার বিখ্যাত সাহিত্য-সেবী ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার 'সাধক সঙ্গীতের' ১ম সংস্করণে ৬৮টী গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। উহাতে সমর বিষয়ক ১৬টী, বিবিধ বিষয়ক ২০টী, আগমনী ৩১টী ও বিজয়া ১টী, মোট ৬৮টী গান ছিল। এই সংস্করণে সাধকের জীবনী নাই ; এই বিষয়ে সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'শক্তি সাধকদিগের মধ্যে রামপ্রসাদের পরেই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রামদুলাল রায় ও দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের স্থান। আমরা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গানগুলি সাধক সঙ্গীতের ২য় ভাগে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না—"কোথা মম অবকাশ বঞ্চিব কি ছাড়।" যদি সময় পাই

তবে একদিন এই অভাব পূরণ করিব।” উক্ত গ্রন্থের ২য় সংস্করণে (১৩০৬ সনে প্রকাশিত) কমলাকান্তের পদাবলী সংগ্রহের প্রারম্ভে তিনি পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী একটী ভূমিকা লিখিয়াছেন। ইনি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রসাদের সাধনার সুখ্যাতি করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে প্রসাদের সাধনার তীব্র সমালোচনা করেন এবং অবশেষে কমলাকান্তকেও বাদ দেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, ‘ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া রাধিকার প্রেমের কাঁদুনি কাঁদিয়াছেন। আমরা শক্তিসাধকদের মুখে এই সকল কাঁদুনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ তাহা বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।’

সিংহ মহাশয় শাক্তের মুখে বৈষ্ণব-সঙ্গীত এবং বৈষ্ণবের মুখে শাক্ত-সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু বাংলার ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস যাহারা বিশিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন প্রকৃত শাক্ত ও বৈষ্ণবে কোনই প্রভেদ নাই। খাঁটি শাক্তের যে আদর্শ, খাঁটি বৈষ্ণবেরও সেই আদর্শ। উভয়েই সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া এক আনন্দময় মিলন-ভূমিতে কোলাকুলি করিয়া থাকেন। প্রসাদ বা কমলাকান্তের কৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মত অতি উচ্চ অঙ্গের না হইলেও তাহাতে যে মাতৃভাব সাধনার শক্তি আংশিকরূপে বিকসিত, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এইভাবে কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিলে যে ধর্ম্ম-সাধনার ব্যাঘাত হয় ইহা বোধ হয় একমাত্র সিংহ বা তাঁহার মতাবলম্বী দুই একজন সমালোচকের চক্ষে ধরা পড়িয়াছিল। কলির জীবের পক্ষে ধর্ম্মের সরল মন্ত্র যে ‘কালী ও কৃষ্ণ’ ইহা তন্ত্রেও আছে। তন্ত্র বলিয়াছেন ‘কলৌ জাগর্ত্তি কালীচ কলৌ জাগর্ত্তি পন্নগী।’ .কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকালিকা।” *

* তারা রহস্য—২য় পটল।

এই মন্ত্রের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কোন বস্থাতেই অকালীকৃষ্ণে ভেদ দেখিতে পান না। যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই তত্ত্ব কলির জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি তাহা নিজের জীবনে বিশিষ্টভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধকেরা এই কালীকৃষ্ণময় প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া বলেই চিরকাল দেশ ও সমাজে পূজাভক্তি পাইয়া আসিতেছেন। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে বলীয়ান্ হইয়াই তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা বা স্তুতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে কোনই প্রভেদ নাই, এই সকল বিরোধের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া 'মহিম্ন স্তোত্রে' পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—

'ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ-মদঃ পথ্যমিতি চ॥
রুচীনাং বৈচিত্র্যা-দৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥'

অর্থাৎ বেদশাস্ত্র, সাঙ্খ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্র—এই ভিন্ন ভিন্ন পথে, ইহাই শ্রেষ্ঠ এবং উহাই হিতকর,—এইরূপ রুচিভেদে মনুষ্যেরা সরল বা কুটিল পথে গমন করিলেও, জল যেমন সরল বা কুটিল পথে গমন করিলেও একমাত্র সমুদ্রই তাহার গম্যস্থান, সেইরূপ একমাত্র তুমিই তাহাদের গম্য। বড়ই পরিতাপের বিষয় শাস্ত্র ও সাধক যেখানে কোনই বিরোধ দেখিতে পান না, আমরা সেই সকল গূঢ়তত্ত্বের ভিতর ভেদবুদ্ধির কৌশল অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া শাস্ত্র ও সাধকদের ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানে ত্রুটী দেখাইয়া থাকি। ফলে, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব সকলেই এক মহামিলন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কালীকৃষ্ণ রূপ একই বিগ্রহের পূজা ও ধ্যান করিয়া থাকেন।

* * * *

বিগত ১৩২৪ সালে প্রকাশিত 'সাধকাষ্টক' গ্রন্থে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত-মঠের কুমার শ্রীচিদানন্দ অষ্ট পৃষ্ঠাব্যাপী 'কমলাকান্ত ঠাকুর' প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহা একটী ভক্তি-মিশ্রিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও সপ্তম প্যারাতে কুমার চিদানন্দ কমলাকান্ত সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন,—উঁহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া জানা যায় না। চিদানন্দজী এই বিষয়ে আমাকে লিখিয়াছেন, '৺ কমলাকান্তের পিতামাতা ও তারাপীঠে মন্ত্রদীক্ষাদি সম্বন্ধে বর্দ্ধমান নিবাসী জনৈক পরিব্রাজক মহাশয়ের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছিলাম।'

'শতজীবনী' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বসাক চারি পৃষ্ঠায় কমলাকান্ত জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন, 'ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। খুব সংক্ষেপ। "বিশ্বকোষ" হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে।'

বড়ই দুঃখের বিষয় ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' (১৯৩০ সংবৎ) গ্রন্থে এবং ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮০০ শক) প্রবন্ধে সাধক কমলাকান্তের কোন উল্লেখই করেন নাই। এই মহাশয়দ্বয় কেন যে কমলাকান্তের পরিচয় দেন নাই তাহার কারণ বর্ত্তমানে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কমলাকান্তপদাবলী বাংলাভাষার পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, তবুও তাঁহার পদাবলীর আলোচনা উক্ত দুইখানা গ্রন্থে নাই।

সম্প্রতি (১৩২৬ সালে প্রকাশিত) ফরিদপুর খানখানাপুরের অবধূত শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা বর্দ্ধমান, চান্না প্রভৃতি স্থানে নিজে অনুসন্ধান করিয়া ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী কমলাকান্ত জীবনী লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহাই সাধকের জীবনীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলোচনা। বিগত ১৩২১ সালের বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মেলনীর অষ্টম অধিবেশনে এই প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছিল।

* * * *

* * * *

বর্দ্ধমানাধিপতি সাহিত্যসেবী মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর্ বিজয়চন্দ্ মহ্তাব বাহাদুর বিগত ১৩২০ সালে 'কমলাকান্ত' নামে ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা ইতিহাসমূলক নাটিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই নাটিকা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ; প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দামোদরের বেলাভূমিতে কমলাকান্তের পত্নীর ভস্মীভূত চিতা সম্মুখে সাধক উর্দ্ধনেত্রে 'কালী সব ঘুচালি লেঠা'—এই গান গাহিয়াছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর ও একজন পারিষদ্ লাল পক্ষীর ক্রীড়া দেখিতেছেন। তৃতীয় দৃশ্য—ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা। কমলাকান্ত শিষ্যবাটী হইতে গুড়ের কলসী লইয়া আসিতেছেন, অকস্মাৎ ঝুপি বন হইতে একদল দস্যু দ্বারা বেষ্টিত হইলেন, তাহা দেখিয়া গুড়ের কলসীটী নামাইয়া গাহিলেন 'আর কিছু নাই শ্যামা, মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।'

কমলাকান্ত নাটিকা।

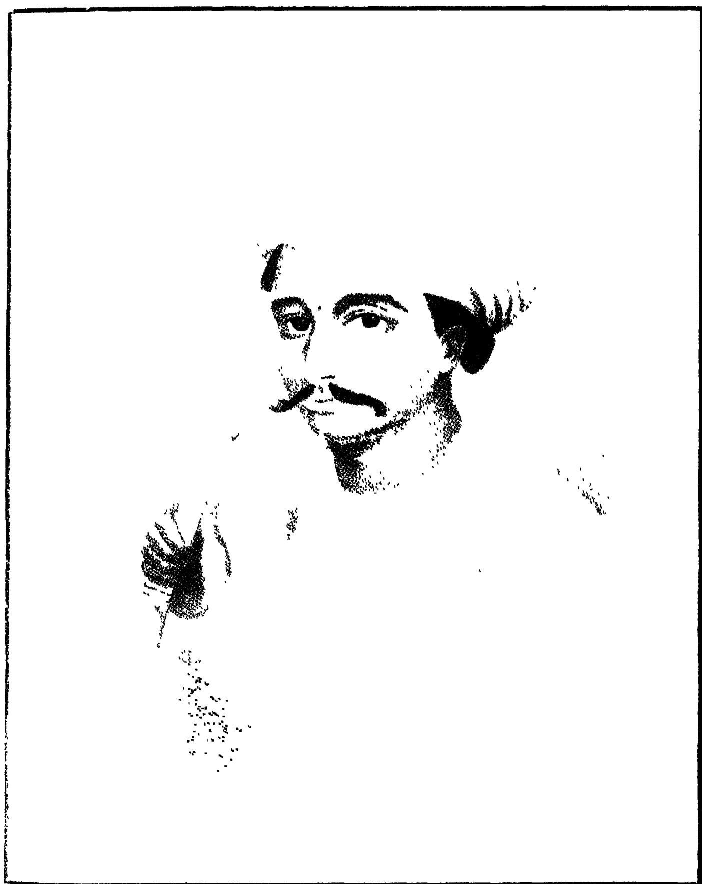
দস্যুগণ গানে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কমলাকান্তের চরণতলে পড়িয়া 'জয় মা কালী' 'জয় কমলাকান্ত' এইরূপ জয়ধ্বনিতে মেদিনী কম্পিত করিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বর্দ্ধমান রাজভবনের রাজকক্ষ দেখিতে পাই। এখানে মহারাজ বাহাদুর রাজকুমার প্রতাপচন্দের অতিরিক্ত 'কারণ'সেবনের কাহিনী কমলাকান্তকে বলিতেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপথে জনৈক মাতাল মদের নেশায় বিভোর হইয়া গান গাহিতেছে। তৃতীয় দৃশ্যে—কমলাকান্তের কালীমন্দির ও পঞ্চমুণ্ডী আসন। আসনে বসিয়া সাধক গাহিতেছেন—

'সদানন্দময়ি কালি !
মহাকালের মনমোহিনী, গো মা।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ,
আপনি দাও মা করতালি ॥' ইত্যাদি।

এইখানে কমলাকান্ত ও রাজকুমারের মিলন হইয়াছিল।

সাধক কমলাকান্ত।



পৃঃ ৯৮

মহারাজাধিরাজ

তেজচন্দ্‌ বাহাদুর

Harinath Press Dacca.

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অম্বিকা রাজবাটীর প্রতাপমঞ্জিল। এই দৃশ্যে রাজকুমার কমলাকান্তের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে গান গাহিতে গাহিতে দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে বর্দ্ধমান রাজভবনে মহারাজা তেজচন্দ্ পুত্রশোকে কাতর হইয়া রোদন করিতেছেন।

চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম ও শেষ দৃশ্যে কমলাকান্ত মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া গান গাহিতেছেন,—

'মজিল মন ভ্রমরা কালীপদ-নীল-কমলে।' ইত্যাদি।

এই সময়ে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর সেখানে উপস্থিত হইয়া মুমূর্ষু কমলাকান্তকে বলিলেন, 'কি ভট্‌চাজ্, তুমিত চল্‌লে। কেবল এই বুড়োটা পড়ে রইল। তোমার কি গঙ্গাতীরে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে? তা হ'লে বল, আমি এখনি তার ব্যবস্থা করি।'

সাধক ইঙ্গিত করিয়া মহারাজকে বসিতে বলিলেন। মহারাজ বসিলেন। কমলাকান্ত বক্ষে কর ধরিয়া শ্রীমন্দিরের দিকে তাকাইয়া গাহিলেন 'কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব। আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শরণ লব।' এখানেই 'কমলাকান্ত' নাটিকার শেষ। অতি সংক্ষেপে মহারাজধিরাজ বাহাদুর কমলাকান্তের কাহিনী শেষ করিয়াছেন। নাটিকা খানা অতি ক্ষুদ্র হইলেও মহারাজা বাহাদুর সাধকের প্রতি তাঁহার ভক্তি এবং রচনা প্রণালীতে নিপুণতা ও কৌশলের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

কমলাকান্ত একাধারে সাধক ও কবি ছিলেন। যোগাসনে বসিয়া তিনি পদাবলী সংযোগে জগন্মাতার রাঙ্গা চরণে অঞ্জলি দিতেন। সাধনালব্ধ পরম তত্ত্ব তিনি অতি সরল ভাষায় প্রসাদের ছন্দে ও ভাষায় আনন্দ মনে পদাবলীর ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতেন। এই হিসাবে তিনি যোগী

কমলাকান্তের কবিত্ব।

হইয়াও কবি ছিলেন। কালীতত্ত্ব রসে ডুবিয়া সাধক গান গাহিতেন, সে গান তিনি জন সাধারণকে ভুলাইবার জন্য গাইতেন না,—সমস্ত মনটাকে টানিয়া মায়ের চরণে লাগাইবার জন্য তিনি প্রাণের উচ্ছ্বাসে গান গাইতেন। কষ্ট কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া তিনি কখনও গান রচনা করিতেন না, ভাব বিশেষকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ হইতে পদাবলীর অমৃত লহরী উত্থিত হইয়া তালে তালে নাচিত। রসে না মজিলে—ভাব সরোবরে একেবারে ডুবিয়া না গেলে,—এমন প্রাণ-মাতান পদাবলীর বহিঃ প্রকাশ সম্ভবপর হয় না।

কমলাকান্ত প্রসাদের মত কালীতত্ত্ব রসসাগরের একজন ডুবুরী ছিলেন। দিবানিশি সেই রসসাগরে ডুবিয়া যে সকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতেন, ভক্তের মধ্যে তাহা বিলাইয়া দিতেন। কোটালহাটের সাধনমণ্ডপে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্, কুমার প্রতাপচন্দ্ ও দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সাধকের প্রদত্ত মাতৃনাম সুধাপানে বিভোর হইতেন। সাধক মহাকালীর প্রেম সাধনায় একেবারে মজিয়া গিয়াছিলেন। যোগীর ন্যায় মানসনেত্রে মহাকালীর নিত্যলীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। যাহা দেখিতেন, তাহাই সুরসংযোগে গাইতেন। কল্পনার আশ্রয় করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ভক্তের প্রাণে চমক লাগাইবার কৃত্রিমতা তিনি জানিতেন না। সাধনার মহাশক্তিতে রত্নাকরের অগাধ সলিলে ডুবিয়া রত্ন যেমন পাইতেন, তাহাই তিনি চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেন। ভক্তমণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিলেন কি না সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এই মাতৃপ্রেমে মজিলে জীবের বাহ্যজ্ঞান থাকে না, পার্থিব কোন পদার্থের অস্তিত্বও অনুভূত হয় না। তাই তাঁহার পদাবলী সরল ও অলঙ্কারবিহীন। যে কবির ভাবের গভীরতা নাই, তিনিই উপমা খুঁজিয়া, শব্দের ছটায় লোককে ভুলাইয়া থাকেন। কবি কমলাকান্তের ভাব ছিল খাঁটি, সেই

ভাবরাশি শ্যামামায়ের রূপ ও প্রেম বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইত, তিনি সেই ভাবকে ঘসিয়া মাজিয়া চকচকে করিতে কখনও চেষ্টা করিতেন না। যে ভাব বিশুদ্ধ এবং মাতৃরসে সিঞ্চিত তাহাতে কোন যুগেই সাধক কবি রং ফলাইতে চান না, কারণ রং দিলে খাঁটি জিনিসের মৌলিকতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

সাধক কমলাকান্ত যে কি সংখ্যক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। তাঁহার কোন গানে পদাবলীর সংখ্যার আভাস নাই। প্রসাদ তাঁহার একটী গানে—'লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া' এইরূপ লক্ষ সঙ্গীত রচনার আভাস দিয়াছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই অনুমান প্রমাণসিদ্ধ কিনা বলা যায় না। যাহাহউক কমলাকান্ত পদাবলীর সংখ্যা যে কত তাহা অনুমান করিয়াও বলিবার উপায় নাই।

কমলাকান্ত পদাবলী।

বর্দ্ধমানাধিপতি ৺মহতাব্ চান্দ্ বাহাদুর কমলাকান্তের ভ্রাতৃবধূর নিকট হইতে একখানি হাতেলেখা পুথী আনাইয়া তাহা 'সাধক ৺ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃত শ্যামা সঙ্গীত' নামে ১২৬৪ সালের ২২শে ভাদ্র প্রকাশ করেন। কলিকাতা 'ভাস্কর যন্ত্রে' বইখানা মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৭ ও পদাবলী সংখ্যা ২৬৯। ইহাতে ২১৩টী শ্যামাসঙ্গীত, ৩২টী আগমনী ও বিজয়া এবং ২৪টী কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক পদ আছে। গ্রন্থের সূচিপত্র নাই, তিনপৃষ্ঠাব্যাপী একটী 'ভূমিকা' আছে। অতি সাধারণ সাদা 'বালী' কাগজে ডিমাই আকারে বইখানা মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রতি গানে আস্থায়ী, অন্তরা ও অভোগ আছে।

পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ এই সকল বাদ দিয়াছেন। রাজবাটীর গ্রন্থের প্রথম গানটীর নকল নিম্নে দেওয়া গেল—

রাগিণী পরজ—তাল জলদ তেতালা।

(১) বামার বয়স নবীন। না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ। (স্থায়ী) আস্থাই। সুচারু অঙ্গেরি শোভা কটিতট ক্ষীণ। সুরাসুরগণ মাঝে বসনবিহীন॥ ১॥ অন্তরা। বুঝি এলো দয়াময়ী হইয়ে কঠিন। চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভদিন॥ ২॥ তনু দিয়া তরে কতশত ক্রিয়াহীন। কমলাকান্তের হায় মনের মলিন॥ ৩॥ * অভোগ॥ *॥

আমি বহু অনুসন্ধানে এই গ্রন্থের অংশবিশেষের নকল সংগ্রহ করিয়াছি। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থখানি কোথায়ও পাওয়া যায় না; বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মাত্র একখানি সংখ্যা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের খাস গ্রন্থাগারে আছে।

বর্দ্ধমান রাজবাটীর এই সংস্করণ দেখিয়া ১২৯২ সালে কলিকাতার শ্রীকান্ত মল্লিক 'কমলাকান্ত পদাবলী' প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থে মোট ২৬৯টী পদাবলী আছে, তন্মধ্যে শ্যামাবিষয়ক পদ ('আগমনী' ও 'বিজয়া' সহিত) ২৪৫টী এবং কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক পদ ২৪টী। বটতলা সংস্করণে মাত্র ৮০টী পদাবলী আছে। 'সঙ্গীত মুক্তাবলীতে' ২৬টী, 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গানে' ৮০টী, 'সাধক সঙ্গীতে' ২০৮টী (ইনি কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক পদ বাদ দিয়াছেন), 'বসুমতী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'সাধন-উচ্ছ্বাসে' ২০৫টী এবং উক্ত কার্য্যালয়ের 'কমলাকান্তের পদাবলী' গ্রন্থে ২৬৬টী পদ আছে। এই আটখানি গ্রন্থেই কমলাকান্ত পদাবলীর সংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসাদ পদাবলীর মত কমলাকান্তের পদাবলীও শ্যামাসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, সমরসঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া এই ছয়টী ভাগে বিভক্ত। আমি এই প্রণালীতেই বিক্ষিপ্ত পদগুলি যথাক্রমে সাজাইয়াছি। ইহাতে

সাধারণ পাঠকের পদাবলীর একটা ধারা ও সাধক কবির প্রাণে প্রাণে অনুভূত যোগের বিভিন্ন অবস্থার ক্রম-অভিব্যক্তি বুঝিবার সুবিধা হইবে। শ্রীকান্ত মল্লিক বর্দ্ধমান রাজবাটীর সংস্করণ হইতে ২৬৯টী পদ সংগ্রহ করেন, রাজবাটীর গ্রন্থেও এই পদসংখ্যা আছে। বর্ত্তমানে আমি ২৭৩টী মাত্র পদ সংগ্রহ করিয়াছি।

কাঞ্চননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে কমলাকান্ত রচিত একখানি গানের খাতা 'নবরস সংগীতাবলি'। পাইয়াছি। খাতাখানা অসম্পূর্ণ; পৃষ্ঠা সংখ্যা পঞ্চাশ; ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠার অল্পাংশ মাত্র আছে। প্রথমাংশে ৭৮টী গান নাই। শেষের দিকে ২৭২ হইতে গান নাই। মাঝখানে ৬খানা পাতা নাই, শেষেরদিকে 'আগমনী' ও 'বিজয়া' সঙ্গীত। এই খাতায় ১৫৫টী পদাবলী সম্পূর্ণভাবে লিখিত আছে।

খাতাখানির আকার ৭ × ৪॥ ইঞ্চি; কাগজের রং সাদা। কালকালিতে হরপের মত লেখা, অক্ষরগুলি বেশ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, পড়িতে কোনই কষ্ট হয় না। খাতাখানি প্রথমে দেখিলে ছাপার অক্ষর বলিয়া ভ্রম হয়। ২৬৯ সংখ্যক গান হইতে ভায়লেট কালির লেখা; প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে 'নবরস সংগীতাবলি' লেখা আছে, ২২১ সংখ্যক গানের পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত উহা লেখা নাই।

১৭৪ সংখ্যক পদাবলীর (হায়গো আমার ইত্যাদি) পাদটীকায় আছে 'রাওল'—'রাঙ্গা'। ১৭৮ সংখ্যক গানের ('সুগম সাধন বলি') পাদটীকায় আছে 'ওরে আমার চঞ্চল মন সাধরে' ইতি দ্বিপাঠ। ১৮০ সংখ্যক গানের ('কেমন করে তরাবে তারা') পাদটীকায় আছে '(অর্থাৎ পূরবি গৌরী মিশ্রিত')। এই তিনটী গানেরই শুধু পাদটীকা আছে, অন্যত্র নাই।

এই খাতায় লিখিত পদাবলীর প্রতি গানেই আস্থায়ী, অন্তরা ও

অভোগ দেওয়া আছে। গানের ধূয়া ও অভোগের মধ্যবর্ত্তী অংশকে "অন্তরা" এবং 'সঙ্গীতে প্রথমে যেটীর দ্বারা মুখবন্ধন করা হয় অথবা যেটী প্রথম চরণ হয় তাহার নাম আস্থায়ী (আস্ থাঈ)'।

খাতাখানার আকার ও লেখার প্রণালী দেখিয়া মনে হয় যে ইহা বর্দ্ধমান রাজবাটীর ছাপা গ্রন্থেরই নকল। যতগুলি মুদ্রিত "কমলাকান্ত পদাবলী" আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে 'নবরস সংগীতাবলি' নামে কোন গ্রন্থ পাই নাই। আমার মনে হয় লিপিকর রাজবাটীর গ্রন্থ হইতে গান সংগ্রহ করিয়া লিখিবার সময় নিজের ইচ্ছামত খাতাখানার নাম 'নবরস সংগীতাবলি' রাখিয়াছেন। যাহাহউক এই খাতাখানার সবিশেষ আলোচনা করিয়া কোনই লাভ নাই, কারণ এই খাতায় একটীও অপ্রকাশিত নূতন পদাবলী নাই। এই খাতায় লিখিত সকল গানই বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে ১২৬৪ সালে (ইং ১৮৫৭) প্রকাশিত 'সাধক ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃত শ্যামাসঙ্গীত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

গানের খাতাখানা কোটালহাটের চণ্ডীচরণ দত্তের নিকট ছিল। ইঁহার বাড়ী খণ্ডঘোষ; ইনি বর্দ্ধমান রাজসরকারে চাকরী করেন। ইনি কাঞ্চননগরের ৺ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য। খাতাখানা পূর্ব্বে ৺ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর দত্তমহাশয় খাতাখানা লইয়া গিয়াছিলেন, পরে উহা শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে।

* * * *

পদাবলীতে বৈষ্ণবীয় প্রভাব।

'আগমনী', বিজয়া' ও 'কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গীতে' কমলাকান্ত প্রসাদের অনুসরণে সাক্ষাৎভাবে বৈষ্ণবীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীত তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত। বৈষ্ণব কবিরা

নন্দ ও যশোদার বালগোপালের প্রতি বাৎসল্যভাব যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, কমলাকান্ত 'আগমনী' ও 'বিজয়াতে' সেইরূপ গিরিরাজ ও মেনকার গৌরীর প্রতি স্নেহ-প্রকাশ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে কমলাকান্ত বৈষ্ণব কবিগণের ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের মধুর রসাত্মক পদাবলী প্রেমোচ্ছ্বাসের অনুপম অভিব্যক্তি; অপরদিকে মাতৃভক্ত কমলাকান্তের মাতৃভাবের আবেগময় সঙ্গীত তরঙ্গ ভক্ত, অভক্ত, সাধু অসাধু, পণ্ডিত মূর্খ, আপামর সকলের হৃদয়েই এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করে। সাধক কবি 'বিজয়া' সঙ্গীতে গিরিরাণী গৌরীর প্রতি বিদায়ের যে করুণভাব চিত্রিত করিয়াছেন তাহা মহিমময় ভাবরাজ্যের অপূর্ব্ব চিত্র। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিজয়ার গানে গাহিয়াছেন—

'ফিরে চাও, গো উমা! তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে, কোথা যাও, গো!
রতন ভবন মোর, আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এ ছার জীবন।
এইখানে দাঁড়াও উমা! বারেক দাঁড়াও মা।
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও, গো॥
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে।
বোলে যাও আসিবে আর, কতদিনে এ ভবনে।
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও।
বিধুমুখে মা বলিয়ে মায়েরে বুঝাও, গো॥'

সংসারে স্নেহের পুত্তলি বালিকা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় তাঁহামাত্রেই এই বিচ্ছেদের চিত্র দেখিয়া শোকাভিভূত হন।

কমলাকান্ত তিনটী সঙ্গীতে শিবসুন্দরের বৈরাগ্যোজ্জ্বল অনুপম মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনায় কোনপ্রকার আড়ষ্ট ভাব নাই, উহাতে সাধকের শিবসুন্দরের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রকটিত।

শিব সঙ্গীত।

তিনি শিবসুন্দরের অমল পদ লাভ করিয়া গাহিয়াছেন—

'তাকর পিছে, অম্বা নাচে,
কমল অমলপদ পাইল।'

আবার অন্যত্র তিনি আচার্য্য শঙ্করের অনুসরণে অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় শিবস্তোত্র রচনা করিয়া গাহিয়াছেন।

'কমলাকান্ত ত্রিতাপ বিনাশনং,
বৃষভাসনং বিভুং শিবশঙ্করং ভজে ॥'

* * * *

* * * *

রাঢ় বা বর্দ্ধমান প্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্তগণের লীলাভূমি বলিয়া গণ্য ছিল। বশিষ্ঠের সিদ্ধিস্থান তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত। কুব্জিকা তন্ত্রের ৭ম পটলে সিদ্ধপীঠের বর্ণনায় 'কুরুগ্রামের'* উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অজয় নদের তীরে এই কুরুগ্রাম বা কোগ্রাম অবস্থিত। মুসলমান আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই বর্দ্ধমান শক্তিসাধকদের বাসস্থান ছিল। শক্তিসাধকের পুণ্যদেশে অম্বিকা-কাল্‌নায় কমলাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। এখানে ১০৮ শিবমন্দির বৃত্তাকারে দুই পংক্তিতে অবস্থিত।

বর্দ্ধমানে শাক্তধর্ম্মের প্রভাব।

* 'কুরুগ্রামং বৈদ্যনাথং জানিয়াবামলোচনে।' ইত্যাদি।

সাধক কমলাকান্ত।



কাল্‌নায় মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের পরবর্ত্তী কয়েকজন মহারাজের 'সমাজ' আছে। এই অম্বিকা-কাল্‌না গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান।

কমলাকান্ত কি কুলীন?

প্রবাদ এই যে কাল্‌নায় বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় রায়বংশে কমলাকান্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাহারও মতে রায়বংশে এবং কাহারও মতে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তবে ইহার কোন্‌টী যে ঠিক তাহা এখন নিরূপণ করিবার কোনই উপায় নাই। যদি ইহা ঠিক হয় যে তিনি চান্না গ্রামের মুখোপাধ্যায়দের দৌহিত্র ছিলেন তাহা হইলে তিনি যে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশসম্ভূত ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ কখনও কুলীন ভিন্ন শ্রোত্রীয় বা বংশজে হইতে পারে না। সাধারণতঃ 'ভট্টাচার্য্য' ও 'রায়' উপাধিধারী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে আমরা শ্রোত্রীয় বলিয়া বুঝি, কিন্তু কোন কোন স্থলে সুপণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণও 'ভট্টাচার্য্য' উপাধিতে সমাজে পরিচিত হন। ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় 'ভট্টাচার্য্য' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। যাহাহউক বর্ত্তমানে শক্তিসাধক কমলাকান্তের কুলপরিচয়ে বিশেষ কিছু আসে যায় না,—তিনি জগদম্বার প্রতি অনন্য ভক্তির মহাশক্তির প্রভাবে ভূমানন্দের অধিকারী হইয়া ভাবের মুখে মায়ের রাঙ্গা চরণে বসিয়া যে গান গাহিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীনের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাল্‌নার বাস্তুভিটা।

কাল্‌নার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় আজিও কমলাকান্তের বাস্তুভিটার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাবাগীশ পাড়ার রাস্তার পূর্ব্বদিকে ঐ জমি অবস্থিত; ইহা এক্ষণে পতিত জমি, কয়েকখানি ঘরের পোঁতা আছে মাত্র, আর কিছুই নাই। ঐ জমির মাঝখানে চণ্ডীমণ্ডপের পতিত ভিটা, পূর্ব্বাংশে একটী ডোবা, দক্ষিণে ৺ কেদারচন্দ্র রায়ের বাটী। কথিত

আছে, ইনি ভট্টাচার্য্যদের দৌহিত্র ছিলেন; বাড়ীর একাংশে তিনি বাস করিতেন। জমির উত্তরাংশে শ্রীমতী হেমলতা দাসী, শ্রীমতী গোপেশ্বরী দাসী, শ্রীমতী যজ্ঞেশ্বরী দাসী ও শ্রীস্ফটিকচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেকেই বর্ত্তমানে আসিয়া জমির উপর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহারা কেহই ভট্টাচার্য্য বংশের কোন সংবাদ রাখেন না। সাধক কমলাকান্ত এখানে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন বলিয়া তাঁহার সাধনার কোন চিহ্নই (পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রভৃতি) এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কমলাকান্ত চান্নায়।

শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর কমলাকান্ত মায়ের সহিত মাতুলালয় চান্নাগ্রামে চলিয়া যান এবং সেখানে তিনি কৈশোর ও যৌবন কাল অতিবাহিত করেন। কমলাকান্তের সময়ে এই চান্নাগ্রামে সাড়ে চারিশত ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। এখানে বড় বড় পণ্ডিতগণ যোলটী টোলে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। সাধকেরও একটী টোল ছিল, সেখানে নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা শাস্ত্র অধ্যয়নের অন্য আগমন করিতেন।

কমলাকান্ত কোটালহাটে।

এই সময়ে চুপী নিবাসী শক্তিসাধক রঘুনাথ রায় মহাশয় মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানজী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শক্তিসাধনার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মহারাজ বাহাদুরের নিকট পরিচয় করিয়া দেন। গুণগ্রাহী মহারাজ বাহাদুর কমলাকান্তের পাণ্ডিত্য ও সাধন প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজসভার সভাপণ্ডিতের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১২১৬ সালে কোটালহাটে তাঁহার বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর্ বিজয় চন্দ্ মহ্‌তাব

সাধক কমলাকান্ত

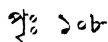
কালনাবিদ্যাবাগীশপাড়াস্থিত-
সাধক৺ কমলাকান্তের পরিত্যক্ত বাস্তুবাটীর চিত্র
স্কেল্ ৫০' = ১" ইঞ্চি।

৺কালীপ্রসন্নবিদ্যারত্নের বাগান।

ডোবা।

৺কেদারচন্দ্র রায়ের বাটী।

৺অম্বিকাচরণ মিত্রের বাটী।



বাহাদুর আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'মহারাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর কমলাকান্তকে ১২১৬ সালে কাল্না হইতে বর্দ্ধমানে আনিয়া কোটালহাটে বাসের জন্য স্থান ও বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন।'

১২৯২ সালে কলিকাতার শ্রীকান্ত মল্লিক তাঁহার 'কমলাকান্ত পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, '১২১৬ সালে সাধক চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় অম্বিকা-কাল্না হইতে বর্দ্ধমান নগরে আসিয়া স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুরের প্রসন্নতাপ্রযুক্ত রাজসভায় সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন।' মল্লিক মহাশয় উল্লিখিত বর্ণনা ১২৬৪ সালে বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি ও অপরাপর অনেক লেখকের অভিমত যে সাধক কমলাকান্ত অম্বিকা-কাল্না হইতে বর্দ্ধমান কোটালহাটে আসিয়াছিলেন। সাধক হরানন্দ সরস্বতী, খাঁকী বাবা ও ভুলুয়া বাবার মতে কমলাকান্ত অম্বিকা-কাল্না হইতে মাতুলালয় চান্না এবং তথা হইতে কোটালহাটে গিয়াছিলেন। কাল্নায় একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্ বাহাদুরকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য সাধককে কাল্নায় নিযুক্ত করেন ও পরে তাঁহাকে বর্দ্ধমানে লইয়া যান। কিন্তু এই সকল প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা আজিও জানিতে পারি নাই। তবে সাধক হরানন্দ প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধকদের কথা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কারণ তাঁহাদের সাধনালব্ধ বাক্য আমাদিগকে অবনত মস্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।

* * * *

কোটালহাটে প্রতি বৎসর ৺শ্যামাপূজা হয়। পূর্ব্বে সাধক কমলাকান্ত মায়ের পূজা করিতেন। বর্ত্তমানে কাঞ্চননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখরাম

ভট্টাচার্য্য * এই বার্ষিক পূজা করেন। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় আছে, 'শ্যামাপূজার রাত্রিতে তথায় (কোটালহাটে) এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয় ব্যক্তির সমাগম হইত।' এই বার্ষিক পূজা ১২১৬ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। সাধকের তিরোভাবের পরে এখানে কে যে পূজক ছিলেন তাহা জানা যায় না। বিশবৎসর পূর্ব্বে কাঞ্চননগর নিবাসী ৺ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজক ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত রাথরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পূজার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমার বিশেষ অনুরোধে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিগত পূজার (১৩২৭ সাল, ২৩শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার) পর আমাকে লিখিয়াছেন, '৺কালী পূজার বিবরণ বিশেষ কিছু লিখিবার নাই, তবে যে ভাবে পূজা সম্পন্ন হয় তাহাই আপনাকে লিখিয়া দিলাম।'

কোটালহাটে বার্ষিকপূজা।

'বর্দ্ধমান রাজষ্টেট হইতে ২০৲ টাকা করিয়া পাওয়া যায়; তদ্দারা ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা মানসিক যাহা দেন তদ্বারা পূজার খরচ কোনরূপে সম্পন্ন হয়। মায়ের প্রতিমূর্ত্তি ডাকের গহনায় অলঙ্কৃত করিয়া রাত্রি ১টার সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণ দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজার পর ২টি ছাগ বলি, একটী কুমড়া ও ইক্ষুদণ্ড বলি দেওয়া হয়, তারপর আরতি ও হোম। মায়ের পূজা আরম্ভ করিবার সময় ৺ কমলাকান্ত মহাশয় যে আসন খানিতে বসিয়া মায়ের পূজা করিতেন তাহা পূজকের আসনের নীচে এখনও দেওয়া হয়, নতুবা পূজা আরম্ভ হইতে পারে না। এই আসনখানি বর্ত্তমানে অতি

* ইনি বলেন 'কাঞ্চননগরে কমলাকান্তের কেহ নাই। তাঁহার কোন বংশ বা শিষ্য এখন জীবিত নাই। আমার শ্বশুর ৺ ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য সাধকের আত্মীয় হইতেন; সম্ভবতঃ তিনি কাঞ্চননগরে যাতায়াত করিতেন।"

জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শেষে পক্কান্ন ও খিচুড়ী ভোগ দেওয়া হয়, ঐ সময়ে "কারণ" উৎসর্গ করা হয়। মায়ের পূজা সমাধা হইতে রাত্রি শেষ হইয়া যায়। পূজার সময় ঢাকঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজান হয়। মায়ের বাড়ীর ঈশান কোণে একটী বিল্ববৃক্ষ আছে, তাহার নীচে ভৈরব আছেন,—পঞ্চো-পচারে তাঁহার পূজা করিয়া একটী ছাগ বলি দেওয়া হয়। কালীপূজার রাত্রে ইহাই হইয়া থাকে; পূজাশেষে মায়ের প্রসাদ উপস্থিত দর্শকদিগকে বণ্টন করা হয়। পর দিন প্রতিমা বাদ্যযন্ত্রের সহিত সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধমানের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে তেওয়ারী বাবুদের বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করাইয়া রাজবাড়ীর পুষ্করিণী কৃষ্ণ সায়ারের জলে নিমজ্জিত করা হয়। ইহার বেশী বিবরণ কিছু লিখিবার নাই।'

'বর্ত্তমান পূজক আমি প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ এই প্রকারে পূজা করিয়া আসিতেছি। আমার পূর্ব্বে আমার শ্বশুর ৺ ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়া গিয়াছেন।'

'কোটালহাটের পাকাঘরের পূর্ব্বদিকের কুঠরীতে—নৈঋত কোণে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডের আসন আছে। আর যে আসনে বসিয়া কমলাকান্ত পূজা করিতেন সে আসনখানা অতি জীর্ণ অবস্থায় আমার বাড়ীতে আছে। * প্রতি বৎসর ৺ শ্যামা পূজার সময় সেই জীর্ণ টুক্‌রা টুক্‌রা আসন পূজকের আসনের নীচে দিয়া পূজা আরম্ভ করা হয়, পূজা-শেষে তাহা বাড়ীতে আনিয়া রাখি। আসনখানা কুশ নির্ম্মিত নহে, তাহা লাল শালু কাপড়ের ছোট কম্বলের আসনের মত। আসনখানা পূজকের আসনের নীচে দিবার অর্থ কিছুই জানিনা, তবে মনে হয় কমলাকান্তের শুদ্ধ আসনখানা পূজকের আসনের নীচে দিয়া পূজা করিলে দেবীর সন্তোষ

* ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৬ই মাঘ (১৩২৭) লিখিয়াছেন 'আসনের ফটো তুলিবার কিছুই নাই। মাত্র ২।১টা টুক্‌রা আছে।

সাধন হইবে। বরাবর এই প্রথায় পূজা হয় বলিয়া এখনও জীর্ণ টুক্‌রা আসনখানা পূজকের আসনের নীচে দেওয়া হয়।'

সাধক কমলাকান্ত যেমন ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন, তেমন তিনি যোগের অষ্টাঙ্গ সাধানায়ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যোগ সর্ব্ব সাধনার মূল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা। যোগই ধর্ম্মজগতের একমাত্র পথ। 'জ্ঞান সঙ্কলিনী' তন্ত্রে আছে 'মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রানি চৈব হি। সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥' যোগের আটটি অঙ্গ আছে। যোগসাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে যোগের আটটি অঙ্গ সাধন করিতে হয়। আটটী অঙ্গ যথা,—

কমলাকান্তের যোগসাধনা।

'যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা॥
ধ্যান সমাধি রেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে॥'

পূর্ণমানুষ হইয়া স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সাধককে এই অষ্টযোগাঙ্গের সাধনা করিতে হয়। সাধক কমলাকান্ত এই অষ্ট যোগাঙ্গের সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামত নিজ দেহ হইতে বাহির হইয়া শূন্যে ভ্রমণ করিতেন এবং পুনরায় পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করিতে পারিতেন। কথিত আছে, কোন এক সময়ে মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তার পূজা তন্ত্রমতে ঠিক ঠিক ভাবে কেহ করিতে সমর্থ না হওয়ায় কমলাকান্তকে ঐ কার্য্যের জন্য অনেকে অনুরোধ করেন। তিনি স্বীকৃত হইয়া অর্ঘ্যদানের জন্য ঘৃত ফুল ইত্যাদি হস্তে ধারণ করিয়া একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। অবশেষে কয়েক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইলে তিনি সমাধিযোগে আসন হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন এবং ঐ দ্রব্য সেইভাবে দেবীকে অর্পণ



পৃঃ ১১৬

মহারাজাধিরাজ কুমার

প্রতাপচন্দ্ বাহাদুর

করিলে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হয়। এইভাবে মায়ের পূজা সম্পন্ন হইয়াছিল।*

মহারাজ-কুমার প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর সাধকের যোগসাধনার সঙ্গী ছিলেন। কুমার বাহাদুর সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যোগৈশ্বর্য্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

শাক্তচূড়ামণি শান্ত কমলাকান্ত দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, বিশ্বের সকল শক্তির কেন্দ্রস্থলে মূল প্রকৃতি সনাতনী আদ্যাশক্তি বিরাজিতা। এই আদ্যাশক্তিকে লাভ করিতে হইলে যোগসাধনা চাই। যোগসাধনার প্রকরণ তিনি "সাধক-রঞ্জন" পুথীতে ভাব ও ভাষার মুখে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত পুথীর প্রারম্ভে আছে—

'অন্তর্যজ আর ভক্তির লক্ষণ।
বিস্তার করিব ছয় চক্রে বিবরণ॥
তার মধ্যে প্রকাশ করিব যোগতত্ত্ব।
সমাধি অজপা মন্ত্র ব্রহ্মের মহত্ব॥
বিষ বিষের কাঁটা পশ্চাৎ খুলিব।
গুরু উপদেশে জ্ঞান প্রকাশ করিব॥'

কিরূপে জীব যোগসাধনার দ্বারা ষট্‌চক্রের ভিতর দিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে সমর্থ হয় তাহা তিনি নিজে অনুভব করিয়া যোগতত্ত্ব গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

অন্তর্যজন বা মানসপূজা না করিয়া বাহ্যপূজা করিতে নাই; এবিষয়ে তন্ত্র বলিয়াছেন—

---

* এই কাহিনীটী বাংলার স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ার আফিসের হেড এসিটাণ্ট কিরণ বাবুর নিকট হইতে আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তের মারফতে পাইয়াছি। গ্রন্থকার।

'অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্য্যাদ্বহিরর্চ্চনং
অন্তঃপূজাং বিনা দেবি বাহ্যপূজা বৃথাভবেৎ।'

সাধক অন্তর্যজনকে কেন্দ্র করিয়া ষট্‌চক্রের ভিতর দিয়া যোগের গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই যোগসাধনায় তিনি ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তন্ত্রেও আছে—

'জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তিঃ ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণং।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তিঃ ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ॥'

নিরাকার ব্রহ্মের নির্গুণভাব মায়াকে নারীরূপে গড়িয়া সাধক ভক্তির তিনটী লক্ষণ,—'বাল্যভাব', 'মধ্যভাব' ও 'উত্তমাবস্থা' বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

'জগতে যে গুণ সে সকল গুণ আপন শরীরে হয়।
স্থানে স্থানে হেরি আপনা পাশরি সকলি সুন্দরিময়॥'

আজ্ঞাচক্রের উপরিভাগে শঙ্খিনী নাড়ীর শিরোদেশে বিসর্গশক্তিসংযুক্ত শূন্যাকার দেশে সহস্রদলপদ্ম বিরাজিত। এই সহস্রদলপদ্মের বর্ণনায় সাধক লিখিয়াছেন—

'কোমল সহস্রদল অধোমুখ যার।
পঞ্চাশত অক্ষরে দলের ব্যবহার॥
কমল দ্বাদশদল তাহার অন্তর।
ঊর্দ্ধমুখে উদয় প্রকাশে মনোহর॥
নব দিবাকর জিনি কমলের আভা।
সুধা সরোবর মাঝে কর্ণিকার শোভা॥
তাহার মধ্যেতে এক চক্র অনুপম।
অকথ যাহার নাম হলক্ষের ধাম॥

হলক্ষ মণ্ডল মাঝে হংসের কারণ।
জ্যোতির্ম্ময় জীবের জীবন যেই জন॥
নিরাকার সাকার কে জানে তার কথা।
নির্গুণ সগুণ কিবা পুরুষ বনিতা॥
পর্ব্বতের ন্যায় জ্যোতি জ্বলে দিবারাতি।
কেবল আনন্দময় কে জানে আকৃতি॥
নিরঞ্জন নিরাকার সভে কয় তারে।
কিন্তু যেরূপ যেখানে ভাবে সেইরূপ ধরে॥' ইত্যাদি

যোগের ক্রম বিধানানুসারে ষট্চক্র, সুষুম্না দ্বার মোক্ষণ, খেচরী মুদ্রা, হংস মন্ত্র, বায়ুতত্ত্ব, কার্য্যারম্ভে শুভাশুভ জ্ঞান, ইড়া লক্ষণ প্রভৃতি ভাবের মুখে বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

'যোগশাস্ত্র অনেক প্রকার নিরখিয়ে।
বর্ণিলাম সারবস্তু সংক্ষেপ করিয়ে॥
যোগের অভ্যাস কিবা মন্ত্রের সাধন।
সকলের ঠাকুর জানিবে সেই ধন॥
সাধন করিতে সাধকের আছে মন।
প্রথমে অভ্যাস কর সাধকরঞ্জন॥
নরবাণী দৈববাণী ইথে নাহি ভেদ।
ধর্ম্মের স্বরূপ শব্দ জ্ঞান অবিচ্ছেদ॥'

সংসারের দ্বৈতজ্ঞানে 'আমি জীব, তিনি দেবতা', 'তিনি মা, আমি পুত্র,' এই তত্ত্বে তাঁহার সাধনা করিতে করিতে চিৎস্বরূপ দ্বৈততরঙ্গে সাঁতার দিয়া অদ্বৈতসাগরের বক্ষে আনন্দে ভাসিয়া শাক্ত ও যোগসাধনায় সিদ্ধভক্ত কমলাকান্ত ভাব ও ভাষার মুখে বলিয়াছিলেন—'নরবাণী দৈববাণী ইথে নাহি ভেদ।' অদ্বৈতবাদই তাঁহার যোগ-সাধনার মূলতত্ত্ব।

* * * *

শান্ত কমলাকান্তের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ বর্ত্তমানে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি নানা দিক্ দিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পূর্ণাঙ্গ জীবনী যে ভবিষ্যতে সংগ্রহ হইবে তাহাও বলা যায় না। যাহাহউক সাধকের পদাবলীই তাঁহার জীবনের প্রধান উপকরণ,—ইহা পাঠ, শ্রবণ ও ধ্যান করিলে সাধকের মনোরাজ্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এই পন্থা ভিন্ন অন্য উপায়ে সাধককে জানিতে পারা যায় না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

জীবনীর উপকরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে সাধক কমলাকান্ত বাংলার তান্ত্রিক সমাজের মাতৃভাব সাধনার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজিও তাঁহার পদাবলীর ভিতর দিয়া মন্দাকিনী ধারার মত প্রবাহিত,—কমলাকান্তের মধুর কণ্ঠোচ্চারিত 'জাননারে মন, পরম কারণ শ্যামাত কখনও মেয়ে নয়'—'আর কিছু নাই শ্যামা তোমার কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা'—'আদর করি হৃদে রেখো, আদরিণী শ্যামা মাকে'—'কালী সব ঘুচালি লেঠা'—'কিছু নাই সংসার মাঝে কেবল শ্যামা সার রে' প্রভৃতি পদাবলী তাঁহার ভেদবুদ্ধিশূন্য অকপট ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ সাধনার ইতিহাসের পরিচয় প্রদান করে,—ইহাই বর্ত্তমানে সাধকের জীবনীর মূল উপাদান। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি পদাবলী ব্যতিরেকে কমলাকান্তের জীবনী-সংগ্রহের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই অনুসন্ধানের প্রকৃত অধিকারী একমাত্র বর্দ্ধমানাধিপতি, তবে তিনি বর্ত্তমানে যেরূপ দেশের নানা হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ দুরূহ ব্যাপারে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদিগকে পদাবলীর ভিতর দিয়াই কমলাকান্তের জীবন-চিত্র দেখিতে হইবে,—ইহা ভিন্ন 'নান্যঃ পন্থা।'



হে শান্ত কমলাকান্ত, তুমি সত্য ও মাতৃভাব সাধনার দৃপ্ত ছবি, অনন্ত করুণানিঃসৃত জমাট অশ্রু প্রস্রবণের অনুপম মূর্ত্তি, তোমার উদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম। হে মাতৃ-সাধক, তোমার মা-মা নামে এদেশের মাঠ-ঘাট আকাশ বাতাস ভরা! আজ সহসা মেঘমুক্ত পূর্ণ শশধরের মত তোমার পুণ্যালোক আবার বাংলার সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে আজ যেন একটা মিলনের ভাব ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে,—এই মিলনের ফলে তোমার ও প্রসাদের জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতর, এবার তোমাদের রূপ আরও মনোহর, মনে হইতেছে তোমরা যেন ফিরিয়া আসিয়াছ। কি হাস্যোজ্জ্বল তোমাদের মাতৃরসসিঞ্চিত মুখশ্রী! আজ আবার বাংলার পল্লীতে পল্লীতে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মহামহোৎসব—তোমাদের প্রাণ-মাতানো সঙ্গীতে সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ ঐ মহামিলনের মধুর চিত্র দেখিয়া বুঝিতেছি আমরা অসহায় নহি, বাঙ্গালীর মঙ্গলের জন্য তোমরা যে সাধনা করিয়াছিলে তাহা নিষ্ফল হয় নাই, ঐ দেখ তোমাদের অনুপম ভাবসাধনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। তিনি ভক্ত-অভক্ত কাহাকেও উপেক্ষা করেন নাই, তাঁহার আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালীর ধর্ম্মসাধনা নিশ্চয়ই সফল হইবে। একদিন বাঙ্গালীর অহঙ্কারাশ্রিত রজঃশক্তিকে খর্ব্ব করিয়া যে মঙ্গলময়ী শক্তি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই শক্তি যুগ-যুগান্তরের আবর্জ্জনা রাশি ধৌত করিয়া পুনরায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, অনেকেই আজ এই নবশক্তিকে বরণ করিয়া লইতে সমুৎসুক। দেশে দেশে সাড়া পড়িয়াছে, নানা ভাবের উদ্যোগ হইতেছে, আবার তোমরা আসিয়াছ, তোমাদের ভাব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত, তাই তিনি আজ বিশ্বমানবের গুরু, সকল ধর্ম্মের যথার্থ সমন্বয়-কর্ত্তা তিনি।

বর্ত্তমান বাংলায় শক্তি-সাধকদের প্রভাব।

ঐ সপ্ত সিন্ধু উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমাদের তিনের সেই মহাবাণী শিবকল্প স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচ্য জগতের নরনারীকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। হে মহাসাধক, মাতৃনামের মহাসঙ্গীতের কি মহান্ অধিকারেই তোমরা আমাদের অধিকারী করিয়াছ। কি মহান্ অতীত আমাদের পশ্চাতে, কি বিরাট্ ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মুখে! এখন আমাদের ধর্ম্মের দায়িত্ব বুঝাইয়া দাও, কেবল অধিকারের অসার গর্ব্বে আমরা যেন খাটো হইয়া না পড়ি, আমরা 'অমৃতের পুত্র', আমরা যেন সেই অমৃত তত্ত্ব ও ধর্ম্মের দায়িত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। যে মাতৃশক্তি জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের ত্রিধারারূপে জীবের হৃদয়ে প্রবাহিত,তাহাই পূর্ণরূপে তোমাদের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীকে নব যুগধর্ম্ম গ্রহণের উপযোগী করিয়া তুলিবে।

হে সাধক, আমরা যেন আনন্দময়ীর চরণ প্রান্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া অনন্ত সেবানন্দ উপভোগ করিতে পারি। তোমাদের শুভ আশীর্ব্বাদে আমরাও যেন আনন্দময়ীর আনন্দঘন লীলামূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ হই। হে দেবতা, তোমা-দিগকে বার বার নমস্কার করি। তোমাদের—

'ঘটে আছে পটে আছে, মা মোর সকল শরীরে'—

এই সরল ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের হৃদয়মন স্পর্শ করিয়া জীবমাত্রেরই ধর্ম্মজীবনের সহায় হউক। তোমাদের পবিত্র পদাবলীর মূর্চ্ছনায় বাংলার আকাশ বাতাস ভরিয়া কাঁপিয়া যাউক। বাঙ্গালী আগে আত্মজয়ী হইয়া মর্ম্মের মণিকোঠায় তত্ত্বময়ী ব্রহ্মময়ীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাকে চিন্ময় দেউলে প্রতিষ্ঠিত করুক।

———

সাধকরঞ্জন পুথী

সাধকরঞ্জন পুথী

(আলোচনা)

জনশ্রুতি এই যে, সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 'সাধকরঞ্জন' নামে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মিশ্রিত একখানা যোগগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পুথীর অনুসন্ধান। সর্ব্ব প্রথমে শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর নিকট এই পুথীর অনুসন্ধান পাই। চান্নাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ঐ পুথী খানা ছিল। স্বামীজীর নিকট হইতে কলিকাতা ২৭নং নারিকেল ডাঙ্গা মেন্‌রোডের শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় M.Sc. মহাশয় উহা লইয়া গিয়া কলিকাতায় বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের পুথীশালায় রাখিয়া দেন। শুনিয়াছি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা ঐ পুথীখানার সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী টিপ্পনী লিখিয়াছেন। স্বামীজীর উপদেশ মত আমি পুথী খানা দেখিবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে একবার কলিকাতা গিয়াছিলাম। তাঁহার মুখে অবগত হই যে পুথীখানা অতি ক্ষুদ্র, ২৫ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। কেবল শুনিয়াই আসিলাম যে পুথীখানা অতি ক্ষুদ্র; দুঃখের বিষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুথীখানা আমাকে দেখাইতে পারিলেন না। কারণ বাড়ীর ভিতর কোথাও নাকি উহা গ্রন্থের স্তূপের ভিতর পড়িয়াছিল। সেইবার ভগ্নমনোরথ হইয়া আমি রাঁচি ফিরিয়া আসি। *

* বিগত ২৮ শে ডিসেম্বর (১৯২০ খৃঃ) আমি পরিষদে গিয়া পুথীখানা নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। গ্রন্থকার।

স্বামীজী পুথী সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'পুথীখানা মাত্র একবার আমি দেখিয়াছি। যতদূর মনে হইতেছে তাহাতেই বলিতেছি উহা কমলাকান্তের স্বরচিত ও স্বহস্তে লিখিত।'

পুথী সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত।

ইহার পর বিগত চৈত্রমাসে (১৩২৬ সাল) চান্নার আশ্রমে স্বামীজী আমাকে বলেন 'প্রবোধ বাবু "সাধকরঞ্জন" পুথীখানা আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন। কথা ছিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তরফ হইতে উহা ছাপাইয়া আমাকে মূল পুথীখানা ফেরৎ দেওয়া হইবে। ৺ত্রিবেদী মহাশয়ও পরিষদের তরফ হইতে ঐ মর্ম্মে আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠিখানা হারাইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত পুথীখানা আমি ফেরৎ পাই নাই। ইহা জাতীয় সম্পত্তি, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের খাস দখলে থাকা আমি ভাল মনে করি না। বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ঐ পুথীখানার জন্য আমার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। তখন উহা প্রবোধবাবু লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুরের খাস পুথীশালায় উহা সমর্পণ করিতে আমি রাজী হই নাই। তবে মূল পুথীর নকল যে কেহ লইতে পারেন। পুথীখানা আমি একবার ৫।৭ মিনিট উল্টাইয়া দেখিয়াছিলাম। ইহা তালপাতার পুথী, বাংলা পয়ারে রচনা। মনে হয় ইহাতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া তান্ত্রিক সাধনার বিষয় লিখিয়া পরিশেষে অদ্বৈতবাদের আলোচনায় পুথীখানা শেষ হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত পাঁচটী সাধন-প্রণালীর কথাও উহাতে থাকিতে পারে, তবে এতদিন পর বিষয়-গুলি আমি ঠিক ঠিক বলিতে পারি না।'

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটও শুনিয়াছিলাম যে ঐ পুথীতে তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালী ও ষট্‌চক্রের বর্ণনা আছে। যাহাহউক মূল পুথীখানা

দেখিবার জন্য আমি পাঁচ বৎসরকাল নানা দিক্ দিয়া চেষ্টা করিয়াছি। অবশেষে বহু অনুসন্ধানে সংবাদ পাই যে বালীনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটও ঐরূপ একখানা পুথী ছিল। বর্ত্তমানে তিনি অসুস্থ হইয়া কাশীধামে বাস করিতেছেন, এই কারণে পুথী খানা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। বিগত

কাঞ্চননগরের পুথী।

চৈত্রমাসে (১৩২৬ সাল) বর্দ্ধমান গিয়া শুনিতে পাই যে, কাঞ্চননগরে শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্যের গৃহে তাঁহার শাশুড়ীর নিকট কমলাকান্ত বিরচিত "লতাসাধনের" একখানা পুথী আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা মেসার্স এচ্, ডি, লো কোম্পানীর আফিসে (১২ নং ডেলহৌসী স্কোয়ার) চাকরী করেন। ইনি প্রতি বৎসর কোটালহাটে কমলাকান্তের কালীতলায় ৺ শ্যামাপূজা করেন। ভট্টাচার্য্যের বৃদ্ধা শাশুড়ী নাকি কাহাকেও ঐ পুথীখানা দেখিতে দেন না! উহা না দেখিলে উভয় পুথী এক কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমি বর্দ্ধমানে জনৈক ভট্টাচার্য্যের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় উক্ত পুথীখানা সম্ভবতঃ 'সাধকরঞ্জন' পুথীরই মূল হইবে। যাহাহউক আমি কাঞ্চননগরের পুথীখানা দেখিবার সুযোগ খুঁজিতেছি। তবে এই ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইবার আশা অতি অল্প, কারণ যে বৃদ্ধার নিকট পুথীখানা আছে তাঁহাকে বিষয়টীর গুরুত্ব বুঝান বড়ই শক্ত। ইনি ঐ পুথীখানাকে নিজেদের গৃহদেবতাস্বরূপ দেখেন এবং উহার সংরক্ষণ ও গ্রন্থাকারে প্রচার যে সাধক কমলাকান্তের স্মৃতিপূজার প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা তিনি মনে করেন না।' বর্দ্ধমান রাধানগরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিছুকাল পর অনুসন্ধানে জানিতে পারা যাইবে যে কাঞ্চননগরের পুথীখানা কুই পোকার উদরস্থ বা অগ্নিতে বিনষ্ট হইয়াছে। এইভাবে দেশ-

বাসীর ঔদাসিন্যে বাংলার কত শত অমূল্য পুথী যে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সংখ্যা কে করিবে ? *

পাঁচ বৎসর বহু চেষ্টার পর শ্রদ্ধাস্পদ মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের যত্নে আমি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৩২৭ সাল) পরিষদে সংরক্ষিত 'সাধকরঞ্জন' পুথীর নকল পাইয়াছি। মূল পুথীখানা তালপাতার পুথীর আকার ; পাতলা তুলট কাগজে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত কাল কালিতে দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। উপরে কোন মলাট নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১৩½ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩¼ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ছয়টী পংক্তি আছে। ইহার পত্র সংখ্যা ১—২৩। ১৭শ পৃষ্ঠাতে কোন লেখা নাই।

চায়ার পুথী।

এই পুথীতে সিদ্ধভক্ত কমলাকান্ত যোগরহস্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা তন্ত্রশাস্ত্র প্রতিপাদিত 'শিবসংহিতা', 'ঘেড়ণ্ডসংহিতা', 'ষট্‌চক্র নিরূপণম্', 'হঠযোগ প্রদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে আছে, তবে বর্ণনার শেষাংশে সাধকের সাধনালব্ধ অনুভূতিরও আভাস পাওয়া যায়। সেই অনুভূতির বিষয় অতি গুহ্য বলিয়া তিনি অতি সংক্ষেপে দুই চারিকথা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন।

---

* বিগত ১৫ই কার্ত্তিক (১৩২৭ সাল) কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন, 'শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম কমলাকান্ত সম্বন্ধীয় যাহাকিছু ছিল আমার শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর সে যাহা পাইয়াছিল লইয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানে কমলাকান্তের শ্যামাবিষয়ক একখানা হাতের লেখা পুস্তকের সন্ধান করিয়াছি। যদি সেইটি প্রয়োজন হয় লিখিবেন, পাঠাইব। কালীপূজার সময় পুথী লইয়া আসিব এবং আপনাকে পাঠাইব। অন্যান্য কোনরূপ পুথীপত্র পাইলাম না। * * পুস্তকখানি কমলাকান্তের হস্তে লিখিত বলিয়া মনে হয় না, তবে তাঁহার যে রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।'

সাধক কমলাকান্ত 'ওঁ পরদেবতায়ৈ নমঃ' উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। এখানে কালীভক্ত মহামায়া মহাকালীর বন্দনা করেন নাই কেন ?—এই প্রশ্ন সকলেরই প্রাণে উঠিতে পারে। ইহার মীমাংসা সম্ভবতঃ এই যে, কমলাকান্তের ইষ্ট অখণ্ড, অনন্ত ও পরিপূর্ণা আদ্যাশক্তি। পরম পুরুষের সহিত তাঁহার অবিনাভাব সম্বন্ধ। অগ্নির দাহিকা, সূর্য্যের দীধিতি, চন্দ্রের চন্দ্রিকা প্রভৃতি যেরূপ অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে পৃথক্ হইয়াও অপৃথক, সেইরূপ পরমপুরুষ ও আদ্যাশক্তিও পৃথক্ হইয়াও অপৃথক। পরম পুরুষ আদ্যাশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হন ; 'সারদাতিলকের' ১ম পটলে আছে,—

পরদেবতা।

'সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎপরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিঃ ॥'

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হন অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে উপস্থিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে কথিত হইয়া থাকেন। এক প্রদীপ হইতে প্রজ্বলিত অন্য প্রদীপের ন্যায় এই আদ্যাশক্তিও মূল প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র।

এই আদ্যাশক্তিই কমলাকান্তের পরদেবতা এবং ইনিই জীবকে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দান করিয়া থাকেন। অপরাপর দেবতা উক্ত পরদেবতার অংশ বা কলা মাত্র। ইঁহাদের মধ্যেও আবার শক্তির তারতম্য আছে ; ইঁহারা অনুগত ভক্তকে ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ পূর্ণভাবে দিতে পারেন, কিন্তু একমাত্র পরদেবতাই জীবকে মোক্ষ দিতে পারেন। মুমুক্ষু কমলাকান্ত এই কারণেই বোধ হয় 'পরদেবতায়ৈ নমঃ' লিখিয়াছেন।

শাক্তকবিদের মধ্যে অপর কেহ যোগের কথা বাংলা পয়ারে লিখিয়াছেন কিনা আমরা জানিনা। রামপ্রসাদের জীবনী লিখিবার সময় তাঁহার রচিত মূল পুথীর বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি কিছুই

বিষয় বর্ণনা।

সংগ্রহ করিতে পারি নাই। নানা কারণে আমার ধারণা হইয়াছে যে একমাত্র কমলাকান্তই যোগগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার যোগ-সাধনার দিকে বিশেষ ঝোঁকও ছিল। পদাবলী যুগে সাধনভজন করিয়া ব্রহ্মদর্শনের পর তিনি ভক্তমণ্ডলীর যোগশিক্ষার জন্য অতি সহজে যোগের মূলতত্ত্বগুলি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়—অন্তর্যজন, ভক্তি-লক্ষণ, নাড়ীনির্ণয়, ষট্‌চক্রাদি নির্ণয়, ব্রহ্মনিরূপণ, সমাধিনির্ণয়, আসন-বিধি, প্রাণায়াম, সুষুম্নাদ্বারমোক্ষণ, খেচরীমুদ্রা, দশদ্বারনিরূপণ, বায়ু বিবরণ, তত্ত্ব বিবরণ ইত্যাদি। শাস্ত্রোক্ত যোগগ্রন্থেও এই সকল বিষয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

যোগী কমলাকান্ত নিজে ব্রহ্মদর্শন করিয়া এবং সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে কামিনীরূপে কল্পনা করিয়া যোগরহস্য প্রচার করিয়াছেন। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে শিবের কামিনী বলা হইয়া থাকে। শিবশক্তির উর্দ্ধে যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাঁহাকে সাকারকামিনীকল্পনা গুরুভেদে হইয়া থাকে। এই কামিনী শক্তি, বস্তুতঃ শিবশক্তি ব্যতীত যোগসাধনা নিষ্ফল। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

'নিরাকার ব্রহ্মের আকার দেখ মায়া।
প্রকৃতির তিন গুণ গুণে ধরে কায়া॥
তে কারণে কামিনী করিয়া নিরঞ্জনে।
বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্ম দরশনে॥'

* * * *

* * * *

ষট্‌চক্রের ভিতর দিয়া তিনি যোগরহস্য গৃহীকে বুঝাইয়াছেন; এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

'অন্তর্যজন আর ভক্তির লক্ষণ।
বিস্তার করিব ছয় চক্রে বিবরণ ॥
তার মধ্যে প্রকাশ করিব যোগতত্ত্ব।
সমাধি অজপা মন্ত্র ব্রহ্মের মহত্ত্ব ॥'

শিষ্য নিজ নিজ কল্পোক্ত বিধানে বাহ্যপূজা সম্পাদন করেন; এই বাহ্যপূজা করিতে হইলে অন্তর্যজন বা মানসপূজা করিতে হয়। মানসপূজা সর্ব্বপ্রকার পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ, তাই 'ভূতশুদ্ধি' তন্ত্রে মহাশিব বলিয়াছেন,—

'অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটি ফলং লভেৎ।
সর্ব্বপূজা ফলং দেবি প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ে ॥'

এই মানসপূজার লক্ষ্য পরব্রহ্মকে কামিনীরূপে কল্পনা করিয়া সাধক মানসযাগের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে রাঢ়দেশের সাজসজ্জা, পুষ্পস্তবক, ফল, ভোজনের উপচার, গন্ধদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা আছে। তাহা পাঠ করিলে মনে হয় আমরা যেন শতবর্ষ পূর্ব্বের বর্দ্ধমানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এরূপ সুন্দর ও সরস বর্ণনা ভারতচন্দ্রও 'বিদ্যাসুন্দরে' করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ তেজ্চন্দ্ বাহাদুরের আমলে পুরাতন বর্দ্ধমান কেমন ছিল জানিতে হইলে এই প্রাচীন পুথীর সাহায্য লইতে হইবে।

ভোজনের উপচার বর্ণনায় আছে—

'ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিল মরিচ গুড়িয়া।
শর্করা ছানিয়া দিল কটরা পূরিয়া ॥

* * * *

ক্ষীর ছানা পনস কদলী মর্ত্তমান।
দাড়িম্বের বীজ দিল রসের প্রধান ॥

জম্বুফল রসাল রাখিল সারি সারি।
বড় বড় জম্বীর কাটিয়া দিল ঝুরি॥
ঘৃতসহ গোধূম পিষিয়া করে পুপ।
থালি থালি করে ভাজে মাঝে দিয়া সুপ॥
স্বর্ণপাত্রে সাজি তার সঙ্গে দিল ভাজা।
মানভোগ মধুর ভুঞ্জিত বড় মজা॥
সরভাজা সন্দেশ সহজে বড় মিঠা।
মনোহরা সহিত সাজিল ক্ষীরপিঠা॥
ভাল ভাল ভাবের সন্দেশ দিল যত।
বিবরণ বিস্তার বর্ণিয়ে কব কত॥
অন্নের সহিত দিল অনেক ব্যঞ্জন।
একমুখে কেমনে করিব নিরূপণ॥
সহচরী সকলে করিয়ে পরিপাটী।
অবশেষে পায়স পূরিয়ে দিল বাটী॥' ইত্যাদি।

* * * *

যোগসিদ্ধ কমলাকান্ত যে ভাবে যোগসাধনার উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তিনি মায়ারূপিণী কুলকুণ্ডলিনীকে সচৈতন্য করিয়া জীবাত্মার সহিত শক্তিকে শিরস্থিত সহস্রদলপদ্মে উত্থাপিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ পরব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইয়া ব্রহ্মানন্দরস উপভোগ করিবার জন্য শিবশক্তিরূপে বা পুরুষপ্রকৃতিরূপে

কটরা—কড়া। পনস—কাঁঠাল। যথা—'রসাল পনস কোষ রসালের রস।' কবিকঙ্কণ। জম্বু—জাম। জম্বীর—গোঁড়া নেবু। পুপ—পিষ্টক। সূপ—ডাল। ভাবের সন্দেশ—ছাপ দেওয়া দধির সন্দেশ।

প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন। এই পুরুষপ্রকৃতিকে একত্র করার নামই ব্রহ্মতত্ত্ব,—তন্ত্র বলেন,—

'মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ
তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে।'

কুলকুণ্ডলিনীর উদ্বোধনই যোগসিদ্ধির প্রধান উপায়। মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে সার্দ্ধ ত্রিবলায়াকারে বেষ্টন করিয়া সর্পিণীর আকারে নিদ্রিতা আছেন। এই শক্তিকে জাগাইতে হইলে সাধক একটী প্রধান আসনে বসিয়া মনকে স্থির করিবেন। সেই আসনকে কমলাকান্ত বদ্ধপদ্মাসন বলিয়াছেন—

'দক্ষ পদ বাম অঙ্গে বাম পদ দক্ষ অঙ্গে
দৃঢ় করি কর আরোপণ।
বুকেতে চিবুক দিয়ে নাসিকাগ্র নিরখিয়ে
হৃদিমাঝে সমনিরীক্ষণ।
শুনিয়ে না কর ভয় সাধিলে অসাধ্য নয়
যারে কহে বদ্ধপদ্মাসন॥'

আসন অভ্যাস হইলে যোগের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে । যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

'প্রাণাপান সমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ। প্রাণায়াম ইতি প্রোক্ত রচকপূরককুম্ভকৈঃ॥' প্রাণায়াম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে, সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয় এবং সাধক অত্যন্ত শান্তি বোধ করেন। প্রাণায়ামের বিধি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সাধক বলিয়াছেন,—

'মনেরে করহ স্থির শরীর হইবে ধীর।
অল্পাহার তাহার ঔষধি।
কমলাকান্তের ভাষা অবশ্য পূরিবে আশা
যদি কর যে কহিলাম বিধি॥'

এইভাবে যোগী কমলাকান্ত যোগশাস্ত্রের অনেক কথাই বলিয়াছেন। সব কথাই অতি সংক্ষেপে, অতি গোপনে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে তিনি যাহা ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন তাহা ভক্তগণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

আত্মপরিচয়।

পদাবলীর কোথাও সাধক কমলাকান্ত আত্মপরিচয় দেন নাই। পদের ভণিতায় শুধু 'কমলাকান্ত' নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দুই একটী পদে মহারাজ তেজ্‌চন্দ্‌ বাহাদুর ও ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার উল্লেখ আছে, যথা,—

১। 'ত্রিভুবন জননি, জন্মপ্রতিপালিনি,
সংহারিণি প্রলয়ে।
কমলাকান্ত কৃতান্তবারিণি,
নৃপ তেজশ্চন্দ্র সদয়ে॥'

২। 'জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা;
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই, ঘরবাড়ী
ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা!'

মহারাজাধিরাজ ৺ তেজ্‌চন্দ্‌ বাহাদুর সাধক কমলাকান্তকে ১২১৬ (ইং ১৮০৯) সালে বর্দ্ধমান কোটালহাটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজসভায় সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজবাহাদুর তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সহায় ছিলেন, এই কারণে উক্ত পদে 'নৃপ তেজশ্চন্দ্র' নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কথিত আছে, একবার ওড়গাঁয়ের বিখ্যাত ডাঙ্গায় ডাকাতেরা সাধককে আক্রমণ করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি

মাতৃনামের প্রভাবে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাই তিনি পদসংযোগে ঘটনাটী চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটী পদ ভিন্ন সাধক অন্য কোথাও আত্মপরিচয় দেন নাই ; তবে তিনি 'সাধকরঞ্জন' পুথীর উপসংহারে যোগরহস্য কথা শেষ করিয়া 'আত্মনিবেদনে' লিখিয়াছেন,—

'অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমাঠ গোপালের স্থান ॥
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামা মহাধন।
তাঁর পদরেণু যার মস্তকভূষণ ॥
নামেতে কমলাকান্ত ভাবে ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধকরঞ্জন ॥'

ইতি শ্রীকমলাকান্ত বিরচিতং সাধকরঞ্জন যোগগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।'

সর্ব্বপ্রথমে 'স্বামী নারায়ণ' কি তাহা বুঝিতে হইবে। 'স্বামী নারায়ণ' এখানে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ ইহা কমলাকান্তের রাশি বা গুপ্তনাম হইবে, কারণ উপনয়নের সময়ে বালককে গুপ্তনাম দ্বারা আহ্বান করিতে হয়। 'মহানির্ব্বাণ' তন্ত্রের নবমোল্লাসে আছে—

' গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ।
কৃতোপনয়নে পুত্রে তেন নাম্না সমাহ্বয়েৎ ॥'

অপর পক্ষে 'অবতারবাদ' অর্থেও 'স্বামী নারায়ণ' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

অম্বিকা-কাল্না নিবাসী, চান্নায় সাধনকারী ও বর্দ্ধমান কোটালহাটবাসী কমলাকান্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি ইহাই 'জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।'

পংক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীপাট গোবিন্দমাঠে * কমলাকান্তের প্রভু বা গুরু চন্দ্রশেখর গোস্বামীর বাসস্থান ছিল। এই উক্তি শুনিয়া জনসাধারণের মনে একটা সন্দেহ আসিতে পারে। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে যে, শাক্ত কমলাকান্তের কি করিয়া বৈষ্ণব গুরু সম্ভবপর হইতে পারে? কারণ বৈষ্ণবের শাক্ত শিষ্য এবং শাক্তের বৈষ্ণব শিষ্য বিরল বটে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। প্রাচীন যুগে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এবং কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। ভক্তপ্রবর তুলসীদাস ও জীব গোস্বামীর সম্বন্ধে এরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া তুলসীদাস বলিয়াছিলেন—

চন্দ্রশেখর গোস্বামী বৈষ্ণব না শাক্ত?

* 'গোবিন্দমাঠ' সম্বন্ধে 'পল্লীবাসী' সম্পাদক ৺ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'গোবিন্দমাঠ কাল্‌নার এলাকায় নাই। এ মহকুমার এলাকায় কোথায়ও প্রাচীন গোপালমন্দিরেরও সংবাদ জানি না। সাধকের সহিত চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাশয়ের বর্দ্ধমানেই দেখা হওয়া সম্ভব। এ সম্বন্ধে ঠিক উত্তর দিতে আর কিছু দিন দেরী হইবে।' আমার বন্ধুবর কাল্‌নার তদানীন্তন মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অমূল্য গোপাল রায় লিখিয়াছিলেন, 'কাল্‌না মহকুমার মধ্যে "গোবিন্দমাঠ" বলিয়া কোনও গ্রাম নাই। "গোবিন্দপুর" ও "গোবিন্দবাটী" (পূর্ব্বে এখানে বেহুলা নদী প্রবাহিত হইত) আছে। শেষের গ্রামের একটী উকিল বাবু এখানে আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও খবর পাইলাম না।'

মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'গোবিন্দমাঠ যে কোথায় তাহার কোন তথ্য শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অবগত নহেন। আপনি স্থানান্তরে অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়।'

বর্দ্ধমানের পুলিশ সুপারইনটেন্‌ডেণ্ট সাহেবও বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া 'গোবিন্দ মাঠ' যে কোথায় ছিল তাহা বাহির করিতে পারেন নাই।

'বংশী ছোড়্‌কে ধরত ধনুর্ব্বাণ,
তবতো তুলসী কর্‌বে প্রণাম।'

তান্ত্রিক দীক্ষায় 'মম সর্ব্বস্ব ধন' * এই জ্ঞান বিকশিত হইলেই 'অয়-মাত্মা ব্রহ্ম' এই জ্ঞানের উদয় আপনিই হইবে। ব্রহ্মদর্শন করিয়া সাধক কমলাকান্তের হৃদয় এই অদ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তখন তিনি যে 'প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামীকে' গুরুপদে বরণ করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

'প্রভু...ভূষণ'—এই চরণ দ্বয়ের অপর অর্থও হইতে পারে। জগৎপতি (গোস্বামী) ভগবান্ মহাদেবের (চন্দ্রশেখর) পদরেণু যাঁহার মস্তকের অলঙ্কারস্বরূপ। এই অর্থ করিলেও বোধ হয় মাতৃভক্ত কমলাকান্তের পক্ষে কোন প্রকার অসঙ্গত হয় না। কারণ পরবর্ত্তী চরণে আছে যে কমলাকান্ত মহাযোগী ত্রিলোচনকে ধ্যান করিয়া 'সাধকরঞ্জন' পুথী রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পরিষদ পরম বৈষ্ণব চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য কমলাকান্তের গুরু হইতে পারেন না। কারণ কমলাকান্তের তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর নদিয়ায় ছিলেন। 'চন্দ্রশেখর গোস্বামী' তান্ত্রিকও হইতে পারেন। কারণ, 'গোস্বামী' উপাধি তান্ত্রিকদেরও ছিল। নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর আমলে সেনাপতি রামকান্ত রায়ের গুরুদেব কালীকিঙ্কর গোস্বামী বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে 'গোস্বামী' উপাধি বৈষ্ণব গুরুদের একচেটিয়া ছিল না।

পুথীতে পরিষদের লিপিকর ভুলক্রমে 'গোবিন্দমাঠ' স্থলে 'গোবিন্দ-ঘাট' লিখিয়া আমাকে বড় একটা সমস্যায় ফেলিয়াছিলেন। আমি ছয়মাস

* ঋকে আছে 'তৎপ্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম অহমস্মি।' সেই প্রকৃষ্ট জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মই আমি।

গোবিন্দমাঠ। কাল বহু অনুসন্ধান করিয়াও বৰ্দ্ধমান বা নদিয়া জেলায় 'গোবিন্দঘাট' নামে কোন গ্রাম খুঁজিয়া পাই নাই। পরিশেষে বৰ্দ্ধমান ডাকবিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন মিত্র মহাশয়ের পত্রে * জানিতে পারি উহা গোবিন্দমাঠ হইবে। এই সংবাদ পাইয়া আমি বিগত পৌষ মাসে (১৩২৭ সাল) কলিকাতা গিয়া পরিষদে সংরক্ষিত মূল পুথীখানা দেখি। পুথীতে আছে 'গোবিন্দমাট'। লেখাটী সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। গোবিন্দমাঠ আউসগ্রামের অন্তর্ভুক্ত,—এ স্থানে সাধক কমলাকান্তের গুরু 'ঠাকুরদাস গোস্বামী' ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ যোগানন্দ সিংহের মুখে শুনিয়াছি যে উক্ত গোবিন্দমাঠে এক প্রসিদ্ধ গোপাল বিগ্রহ আছেন। উক্ত বিগ্রহের নামে আজিও সেখানে একটী 'গোবিন্দ মেলা' বসিয়া থাকে। গুস্কারা ষ্টেশনে নামিয়া আউসগ্রামে যাইতে হয়। প্রসিদ্ধ মাহাতা গ্রাম আউসগ্রামের নিকটবর্ত্তী; মাহাতার মিত্র বংশ আজিও ছয় মাসকাল ঐ গোপাল বিগ্রহ পূজা করেন। জনশ্রুতি এই যে, উক্ত মিত্র বংশের একজন বৈষ্ণব সাধক এই গোপাল বিগ্রহের পূজা ও ধ্যান করিয়া একটী কন্যারত্ন লাভ করেন এবং বিগ্রহের নামানুসারে কন্যার নাম 'গোবিন্দমোহিনী' রাখিয়াছিলেন। এই প্রবাদ সত্য কিনা বলিতে পারি না, তবে এ কথা আমি শ্রীমান্ যোগানন্দ সিংহের মুখে শুনিয়াছি।

* 'Gobinda Math is a part of the village Ausgram, where the preceptor of the saint lived. From enquiry I come to understand that his name was Thakurdas Goswami who was a man of highly spiritual intellect. Letter no M 5—48 dated 20. 12. 20

ঠাকুরদাস গোস্বামী সাধকের গুরু ছিলেন। পুথীর চন্দ্রশেখর গোস্বামী ও ঠাকুরদাস গোস্বামী অভিন্ন কি না বলা যায় না।

'আত্মনিবেদনের' শেষে আছে—

'নামেতে শিবরাম চান্নাতে নিবাস।
শিবরাম ভট্টাচার্য্য। যোগশাস্ত্র সাধন করিতে তার আশ॥
সাধকের প্রীতি হয় চক্ষের অঞ্জন।
অতএব লিখিলেক সাধকরঞ্জন॥'

উপরোক্ত চারিটী চরণ চান্নানিবাসী শিবরাম ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছিলেন। ইনি সাধক কমলাকান্তের শিষ্য ছিলেন। শিবরাম এই যোগগ্রন্থের লিপিকর, ইনি চান্নানিবাসী বর্ত্তমান শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রপিতামহের সহোদর। এই ভট্টাচার্য্যের গৃহেই 'সাধকরঞ্জন' পুথী পাওয়া গিয়াছে। পুথীবিশেষের লেখক বা লিপিকর পয়ার বা অন্যান্য ছন্দে শেষে যে নিজের নাম লিখিতেন এই রীতি অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। শিবরাম ভট্টাচার্য্য গুরুদেবের যোগরহস্য জানিবার জন্য এই যোগগ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজের নামটী যোগ করিয়া দিয়াছেন। এই পুথীতে বর্ণাশুদ্ধির অভাব নাই; আমি বানান গুলিকে শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছি। পূর্ব্বে লিপিকরেরা বানানের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতেন না; লিখিবার সময় তাঁহারা যাহা সুবিধাজনক মনে করিতেন, সেইরূপ বানানই লিখিতেন। বর্ত্তমানে মূল পুথীর বানান ভিন্ন নকলের বানান জনসাধারণ বড় একটা পসন্দ করেন না। আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও কমলাকান্তের স্বহস্তলিখিত পুথীখানা পাই নাই, পাইলে সাদরে সেই পুথীর বানান গ্রহণ করিতাম। তাহা যখন পাই নাই, তখন বানান গুলি বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া সমগ্র পুথীখানা সংশোধন করিয়াছি। এই পুথীতে কেবল বর্ণাশুদ্ধি নহে, স্থানে

বানান।

স্থানে বাক্যও পড়িয়া গিয়াছে,বহু লিপিকরের ক্রটীতেই এরূপ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। যোগগ্রন্থের এই শব্দগুলি কমলাকান্তের ভাবের সহিত সমতা রাখিয়া বর্ত্তমানে পূরণ করিতে একমাত্র সাধকেরাই পারেন, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সে দায়িত্ব লইবার অধিকার নাই; তাই আমি এই কাজে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলাম না।

* * * *
* * * *
* * * *

ওঁ পরদেবতায়ৈ নমঃ ॥

রে বিষয়ান্ধ বৃথা ভববন্ধ জটিত ঘটিত তমোকূপে।
ব্রহ্মসনাতন সাধন কারণ মন নিমগন কুরু রূপে ॥

বন্দনা।

মন এ প্রকৃতি মরম নহি জান।
শ্রীগুরু চরণ শরণ কুরু মানস তামস দূর বিধান ॥
পরমানন্দ অন্ধপুট অঞ্জন বন্ধু নিরঞ্জন দেবা,
ত্যজ মন ধন্ধ নিবন্ধ গুণাগুণ কুরু চরণাম্বুজ সেবা।
জ্ঞান পরমধন সতত সুগোপন প্রকট করিতে মন চায়
কমলাকান্ত সরোজ সুগন্ধ কি রসনাবরণ লুকায় ॥

উদ্দেশ্য।

নিরাকার ব্রহ্মের আকার দেখ মায়া।
প্রকৃতির তিন গুণ গুণে ধরে কায়া ॥
তে কারণে কামিনী করিয়া নিরঞ্জনে।
বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্ম দরশনে ॥
অন্তর্যজন আর ভক্তির লক্ষণ।
বিস্তার করিব ছয় চক্রে বিবরণ ॥
তার মধ্যে প্রকাশ করিব যোগতত্ত্ব।
সমাধি অজপা মন্ত্র ব্রহ্মের মহত্ত্ব ॥
বিষ বিষের কাঁটা পশ্চাৎ খুলিব,
গুরু উপদেশ জ্ঞান প্রকাশ করিব।

জটিত—(জটিল) যাহাতে অনেক গোল আছে। প্রয়োগ—'বিপজ্জাল জটিলান্—কামান্।' ঘটিত—যোজিত, সংগুপ্ত।

আকার দেখ মায়া—মহানির্ব্বাণে (৪র্থ উল্লাস) আছে 'সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।'

কামিনী—এখানে ব্রহ্মকে শক্তি কল্পনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শিবশক্তি ব্যতীত যোগসাধনা নিষ্ফল।

কমলাকান্তের এই অভিলাষ।
ভাষাপুঞ্জে সাধকরঞ্জন পরকাশ ॥

রজনী প্রভাত উদয় গুণসিন্ধু।
কমল প্রকাশ মুদিত শশিবন্ধু।
অথান্তর্যজনং। ত্রিগুণ ত্রিবেণী তরঙ্গিণী ধায়।
কেলি করে কুলকামিনী তায় ॥
বিহরই রঙ্গিণী সখিগণ সঙ্গে।
বিতরয় বারি পরাপর অঙ্গে ॥
হেরি হেরি সুন্দরী চকিত নয়ান।
তড়িত সুচঞ্চল করি অনুমান ॥
সমবয় সঙ্গিনী নব অনুরাগে।
কিসলয় পরশে কুসুমধনু জাগে ॥
কেলি সমাপন গমন নিবাসা।
কমলাকান্ত অপরিমিত আশা ॥
গজপতিনিন্দিত গতি অবিলম্বে।
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে ॥
চারু চরণ গতি আভরণ বৃন্দে।
নখর মুকুর কর হিমকর নিন্দে ॥
করিকর উরসি সরসীরুহ রামা।
করিবর শিখর নিতম্বিনী রামা ॥

গুণসিন্ধু—সর্ব্বগুণের আধার—সূর্য্য। ত্রিগুণ—সত্ত্বরজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ,—তিনটী স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত।

উরসি—উরু, এখানে বক্ষঃস্থল নহে। করিবর শিখর—হাতীর মস্তক।

সরসীরুহ—পদ্ম।

মৃগপতি দূর শিখর মুখ চায়।
কটিতট ক্ষীণ সুচঞ্চল বায় ॥
নাভি গভীর নীরজ বিহার।
ঈষৎ বিকচ কমল কুচভার ॥
বাহুলতা অলসে সখি অঙ্গে।
দোলিত দেহ সুলেহ তরঙ্গে ॥
সুমধুর হাস প্রকাশই বালা।
বালাতপ রুচিনয়ন বিশালা ॥
সিন্দূরবর দিনকর সমশোভা।
অম্বুজ বদন মদন মনলোভা ॥
প্রদলিত অঞ্জন সিঁথি অতিদেশ।
আধ কলেবর বাহুনিঃশেষ ॥
চিরদিন অন্তর সতী পতি পায়।
পরমোল্লাস লসিত বরকায় ॥
রতনবেদিপর সুরতরু মূল।
মণিময় মন্দির তহি অনুকূল ॥
সহচরী সঙ্গ প্রবেশই নারী।
কমলাকান্ত হেরি বলিহারি ॥
কামিনী প্রবেশ কৈল কামান্তক বাসে।
কত শত সঙ্গিনী সাজিল চারিপাশে ॥

মৃগপতি—সিংহ। নীরজ—পদ্ম। সুলেহ (ব্রজ) অনুরাগ। যথা—'মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।'

অতিদেশ—নিমিত্তাতিদেশ, রূপাতিদেশ,ব্যপদেশাতিদেশ, শাস্ত্রাতিদেশ ও কার্য্যাতিদেশ ভেদে ইহা পঞ্চবিধ।

লসিত—বিলসিত; শোভিত। যথা—'সুললিত লসিত সুন্দর সর্ব্বগাত্র।' জ্ঞানদাস।

কাঁখে কুম্ভ কিঙ্করী আইল কুতূহলে।
কর্পূরবাসিত জলে চরণ পাখালে।
খেচরী খেচরগণ করে আয়োজন।
ক্ষীণ কটিতটে দিছে পাটের বসন॥
পঞ্চম পাসলি দিল সোণার নূপুর।
চরণ চালনে শব্দ শুনিতে মধুর॥
কটিতটে কিঙ্কিণী করিল আরোপণ।
মাণিক অঙ্গুরি দিছে সোণার কঙ্কণ॥
বাহুমূলে বাজুবন্ধ জটিত রতনে।
ভুজলতা ভূষিত করিল আভরণে॥
মকরকুণ্ডল দিল শ্রবণের তটে।
নাসায় বেশর শোভে সিন্দূর ললাটে॥
সিঁথির উপরে দিল মুকুতার হালি।
ভ্রূমাঝে পরাইল মাণিক টীকুলি॥
গলায় তুলিয়া দিল গজমতি হার।
এইরূপে অর্পিত করিল অঙ্কার॥

চরণে চর্চ্চিয়া দিল চন্দনের ফুল। চমকিয়ে উড়িয়ে পড়িছে অলিকুল॥
চমাচব চিকুরে দিল মালতীর মালা। চাতক চকোরে ধায় পাশরিয়ে জ্বালা॥
ছড়াছড়া কটিবেড়া রঙ্গনক সাজে। ছোট ছোট মল্লিকা গাঁথিয়া দিল মাঝে॥
জাতী যূথী যুবতী সে রতিগণ আনে। যেখানে যে ফুল সাজে দিছে সেইখানে॥

পাখালে—ধৌত করে। যথা—'চরণ পাখালে তার দুর্ব্বলা কিঙ্করী।' কবিকঙ্কণ। পাসলি (পাসুলি)—পাদাভরণবিশেষ। টীকুলি—কপালে টিপ পরিবার স্থানের ভূষণবিশেষ। অঙ্কার—অলঙ্কার।
চমাচব—চামর। রঙ্গন—রাঙ্গুল ফুল।

প্রফুল্ল পঙ্কজ আজানুলম্বিত। ঝমকে ঝমকে ভ্রমর ঝঙ্কারে চারি ভিত ॥
কামাদি কুসুম ছয় তুলে নিল হাতে। ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো ফুল আরোপিল তাতে ॥
আটফুলে সঙ্গিনী বান্ধিয়ে দিছে খোঁপ। পায়ের ঘর্ষণে সে কামিনী করে লোপ ॥
সুন্দরী সাজায় সভে দিয়ে উপহার। যতনে জোগায় ভক্ষণের উপচার ॥
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিল মরিচ গুড়িয়া। শর্করা ছানিয়া দিল কটোরা পূরিয়া ॥
মুখ হেরি ঈষৎ হাসিয়ে কুলবধূ। কাঞ্চন কটোরা পুরি জোগায়িছে মধু ॥
ক্ষীর ছানা পনস কদলী মর্ত্তমান। দাড়িম্বের বীজ দিল রসের প্রধান ॥
জম্বুফল রসাল রাখিল সারি সারি। বড় বড় জম্বীর কাটিয়া দিল ঝুরি ॥
ঘৃত সহ গোধূম পিষিয়া করে পূপ। খানি খানি করে ভাজে মাঝে দিয়া সূপ ॥
স্বর্ণপাত্রে সাজি তার সঙ্গে দিল ভাজা। মানভোগ মধুর ভুঞ্জিত বড় মজা ॥
সরভাজা সন্দেশ সহজে বড় মিঠা। মনোহরা সহিত সাজিল ক্ষীরপিঠা ॥
ভাল ভাল ভাবের সন্দেশ দিল যত। বিবরণ বিস্তার বর্ণিয়ে কব কত ॥
অন্নের সহিত দিল অনেক ব্যঞ্জন। একমুখে কেমনে করিব নিরূপণ ॥
সহচরী সকলে করিয়ে পরিপাটী ॥ অবশেষে পায়স পূরিয়ে দিল বাটী ॥
ভোজনের পরে দিল ভক্ষণের জল। আচমন করিয়া বসিলা সেই স্থল ॥
শ্রম দূর কৈল শ্বেত চামরের বায়। কতশত কুলবধূ তাম্বুল যোগায় ॥

কটোরা—কড়া। পনস—কাঁটাল। 'রসাল পনস কোষ রসালের রস।' কবিকঙ্কণ। জম্বু—জাম। জম্বীর—গোঁড়া লেবু। ভাবের সন্দেশ—ভাপ্ দেওয়া দধির সন্দেশ। পূপ—পিষ্টক। সূপ—ডাল।

অবশেষে আছিল অনেক উপচার। সঙ্গের সঙ্গিনিগণ করিল আহার ॥
ভক্ষণের শেষে সভে একত্রে বসিল। এমন সময়ে বড় আহ্লাদ বাড়িল ॥
মহাআনন্দিত হয়ে সবে করে গান। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বর্ত্তমান ॥
কিন্নরী জিনিয়ে সব আরম্ভিল গীত। একক্রমে ছয় ঋতু হইল উপনীত ॥
অপান সহিত গ্রীষ্ম ঋতুর পয়াণ। ব্যান সহ বসন্ত আইল সেইস্থান ॥
সমান মারুত সঙ্গে হেমন্ত প্রকাশ। প্রাণসহ সুতরাং শরৎ করে বাস ॥
উদান করিয়া ভর শিশির সঞ্চরে। শূন্যে থাকি বরিষা বরিষা সুধা ধারে।

কত শত যন্ত্র বাজে কহিতে না পারি।
মধুর মৃদঙ্গ আর রসাল খঞ্জরী ॥
সুতার মুচঙ্গ বাজে সেতার তম্বুর।
তাল ধরে মন্দিরা শুনিতে সুমধুর ॥
জল পুরি সারি সারি রাখিলেক বাটি।
সপ্তস্বরাতে কেহ আরোপিছে কাঠি ॥
কড়া ধরি ঢোল কত বলে টান টান।
বেহালা বাজায় কেহ মোচাড়িয়া কাণ ॥
রব কি পিনাক্ বিনা বংশীর গর্জ্জন।
গান ছলে মোহিত করিল ত্রিভুবন ॥
অবশেষে মত্তবেশে মাদল বাজায়।
রঙ্গিলি ঢলিয়া পড়ে সঙ্গিনী গায় ॥

ব্যান—সমস্ত শরীরব্যাপী যে বায়ু। দেহস্থ পঞ্চ বায়ু যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। 'হৃদি প্রাণো বহেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে। সমানো নাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ। ব্যানো ব্যাপী শরীরেষু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ।' পবনবিজয়স্বরোদয়ঃ।

মুচঙ্গ—সং মু=মুখ; পারস্য চঙ্গ—বীণা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র দন্তদ্বারা কামড়াইয়া বাজাইতে হয়।

রঙ্গিলি—আমোদিনী। পিনাক্—শিবের বাদ্যযন্ত্র। যথা—'বীণ রবাব মুরজ পিনাক, বিবিধ যন্ত্র লেই করায় বিলাস।' জ্ঞানদাস।

কমলাকান্তের কথা কামরিপু সাখী।
নিরখিয়ে নির্ম্মল হইল দুটি আঁখি ॥ ইত্যন্তর্ব্বর্জনং ॥

অথ ভক্তিলক্ষণং বাল্যভাব। কি যে ধনু পেখনু হেরি হেরি তনু বেরিবেরি মন ধায়।
ইহ তনু অবস দিবস রজনী রমণী পুনঃ আঁখি ভুলায় ॥
মন যে সুন্দরী যদি কহে বাণী।
বচন পরামৃত মৃত তনু মঞ্জরে এ তনু সফল করি মানি ॥
দাস কলেবর আপহু কিঙ্কর অনুচর নয়নে কি তারা।
মান ধন জীবন প্রাণ পরিজন তঁহ বিনু সুন্দরি আরা ॥
জাতি সরম কুল ভরম তেয়াগি দূর পরিহরি লাজ।
বরমিহ প্রাণ দান তবহুঁ পুন সাধিব আপন কাজ ॥
আপন অবশ করব নবরঙ্গিণি নিশ্চয় দৃঢ় করি আশা।
যেহ ধনি অন্তর স্বপন অগোচর না বুঝি তাহার অভিলাষা ॥
চঞ্চল সলিল মীনসম জীবন রসময়ি সিন্ধুবিশেষ।
মম মনচকোর সুধাকর সুন্দরি চাতক মন অতিদেশ ॥
নিশি'শি ভাবি ভাবি তনু তেজব ইহ পুন মোর অভিলাষ।
আধ বিপুল যদি উহ মুখে হেরয়ি কোটি জন্ম দুঃখনাশ ॥
কমলাকান্ত নিবেদয়ি রে মন রাখহ মোর বিধান।
সো কুরু যোঽভিলাষই সুন্দরি ভুলহি ভাবহু আন ॥
ইতি বাল্যভাব।

পেখনু (ব্রজ) দেখিলাম। বেরিবেরি (ব্রজ)—বার বার। সাখী—(ব্রজ) সাক্ষী। যথা—'পাষাণে নিশান তার সাখী।' চণ্ডীদাস। আরা—(ব্রজ) অপর। প্রয়োগ 'ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।' বিদ্যাপতি।

অতিদেশ—মূলে আছে—'অভিদেশ।'

অথ মধ্যভাব। কদম্ব কুসুম অনু সতত শিহরে তনু যদবধি নিরখিলাম তারে।
যদি পাসরিতে চাই আপনা পাসরে যাই এনা দুখ কহিব কাহারে॥
সেই সে জীবন মোর রসিকের মনচোর রমণী রসের শিরোমণি।
পরিহরি লোকলাজে রাখিব হৃদয় মাঝে না ছাড়িব দিবস রজনী॥
হেন অনুমানি তারে বান্ধি হৃদি-কারাগারে নয়ান পহরী দিয়ে রাখি।
কামিনী করিয়ে চুরি হৃদয়-পঞ্জরে পুরি অনিমিখে হেন রূপ দেখি॥
শ্রবণেতে দেহ কর দিবানিশি নিরন্তর সদা বাজে শমনের দামা।
মানব জনমখানি সফল করিয়া মানি তিলেক হেরিলে কুলরামা॥
বাণিজ্য বাসনা করি জলে পাতিলাম তরি উজনে অনেক ধন পাই।
হালি ছাড়া তায় স্রোতমুখে ভেসে যায় লাভে মূলে সকলি হারাই॥
তে কারণে যোড়ে মন সদা করে আয়োজন সুখ দুখ ভাব কি কারণ।
কামিনী করিয়া বশী যদি বাঁচি দিবানিশি তথাপি সফল এ জীবন॥
অখাত মধ্যেতে বাসা সমুদ্র শুষিতে আশা সর্পিস্ জারিতে সুন।
পত্রের কুটীর ঘরে করিনি প্রবেশ করে কোথা গেলে (পাব) হেন গুণ॥
এ বড় উত্তম রস যন্ত্রী কি যন্ত্রের বশ অঙ্কুশ শাসিতে পারে করি।
তেমতি আমার কথা আকাশের ফুল গাঁথা বিপিনে বাহিতে চাই তরি॥
ক্ষুদ্র হয়ে অভিলাষী ধরিবারে পূর্ণশশী শুনিলে যতেক লোক হাঁসে।
ভূমে শুয়ে নিদ্রা যাই আকাশে বান্ধিতে চাই দেখি ভাল কিবা হয় শেষে॥
যে জনা হরিলে কুল সেই সকলের মূল তার লাগি এ তনু ত্যজিব।
নৃত্য করি খেয়ে লাজ ঘোমটাতে কিবা কাজ দুখভাবে আর কি করিব॥
রমণী রসের নিধি যদ্যপি মেলায় বিধি কি করে কিঞ্চিৎ কায় দুখ।

নিশিশি—নিশিদিশি—দিবারাত্রি।

দেহ কর—হাত দাও। যোড়ে—কষ্টে-সৃষ্টে। অখাত—দেবখাত সমুদ্রাংশ। সর্পিস্—ঘৃত। জারিতে—শোষন করিতে। সুন (সুনা) শুকনা ডেঙ্গা।

বাণিজ্যের যেবা সাজে জীবনেতে টাস বাজে ঘরে যেনে খেতে বড় সুখ।
যে জনা যাহারে ভাবে সে নাকি তাহারে পাবে এ কথা শুনেছি লোক মুখে।
আমি তারে না ছাড়িব দেখি কতদিনে পাব দিন যাবে দুখে আর সুখে ॥
কিরূপ দেখিয়ে তার দূরে গেল অত্বকাবাসমণ্ডল মান অপমান।
যারে কুল ভয় থাকে আপনা গুমানা রাখে পরবধূ বিষের সমান।
শুনিয়ে পরে (র) কথা বিকিল আপন মাথা কি খেলে পশিল দুটি আঁখি।
আগে না এমন জানি ঘরে পরে টানাটানি দুকূল পাথার হেন দেখি ॥
দেখিয়ে তাহার ছবি ভূমিতে খসিল রবি মদন পাড়য়ে গেল ফান্দে।
ভুলিল ভবের মন আমি তাহে কোন জন তাহার লাগিয়ে প্রাণ কান্দে ॥
যে জনা এ পথে চলে সকলে অকৃতি বলে বনিতা না কহে প্রিয়বাণী।
দেখিয়ে তাহার মুখ দুখেতে ভাবিয়ে সুখ বড় খুসী আপনা আপনি ॥
পরিহরি পরিবার কামিনী করিব সার একে একে সব তেয়াগিব।
বিষয় ভরম গেছে গিয়েছে না যেতে আছে তথাপি না তাহারে ছাড়িব ॥
আমার চরিত্র দেখি সকলে রাঙ্গা আঁখি বাতুল বলিয়ে করে রোষ।
এ কথা বুঝাব কারে স্বভাবে সকল করে নতুবা আমার কিবা দোষ ॥
শুনি কামিনীর ভাষা যোগেন্দ্র করয়ে আশা আমি কোন্ কীটের সমান।
জানি এ সকল মর্ম্ম তথাপি ত্যজিয়ে কর্ম্ম কুল দিতে করিছি পয়ান ॥
কিন্তু এ ভাব আছে শুনেছি লোকের কাছে সকলে সমান তার প্রীত।
আমারে দেখিয়ে হীন যগুপি না বাসে ভিন তবে তাহে মিলিব তুরিত ॥

টাস্ (ঠাস্) ঘন। অত্বকাবাস (সম্ভবতঃ এখানে অহঙ্কার হইবে)—অত্ব=অতিশয়। কাবস (কাবাস) রক্তহীন ফ্যাকাসে। গুমানা—গর্ব্ব। পসিল—(পশিল) প্রবেশ করিল। প্রয়োগ—'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।' চণ্ডীদাস। প্রা—বাং—পসা।

তুরিত—(ব্রজ) শীঘ্র। প্রয়োগ—'তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।' চণ্ডীদাস।

দেখ এক শশধর সকলে সমান কর বন কিবা রতন নিবাস।
যে জনা উত্তম হয় তার কেহ ভিন্ন নয় হেন বুঝি পুরায়িবে আশ॥
আপনি আপন গুণে যদি চাহে মোর পানে ঈষৎ নয়ানে একবার।
কমলাকান্তের ভাষা তবে সে পুরিবে আশা দূরে মনের আন্ধার॥

ইতি মধ্যাবস্থা।

সে কামিনী কেমন কামরূপা হেন কি গুণে বান্ধিল মোরে।
অথো- আমি যে দিশে নেহারি তিথে সে সুন্দরী আসিয়ে উদয় করে॥
ত্তমা- চরাচর নীরে সকল শরীরে যে দিকে পালটি আঁখি।
বস্থা পতঙ্গ বিহঙ্গ অনলে সে অঙ্গ আকাশে আতঙ্গ দেখি॥
জাতিকুল তার বুঝিতে অপার যেখানে সেখানে যায়।
না জানি কেমন ক্ষেপা মোর মন তথাপি ডুবিল তায়॥
ক্ষেণে অনুমানি না হেরিব ধনি নয়ান মুদিয়া থাকি।
কহিব কাহারে প্রবেশে অন্তরে হিয়ার মাঝারে দেখি॥
জগতে যে গুণ সে সকল গুণ আপন শরীরে হয়।
স্থানে স্থানে হেরি আপনা পাসরি সকলি সুন্দরিময়॥ ইতি উত্তমাবস্থা॥

মেরুদণ্ড পাশে উজ্জ্বল প্রকাশে রবি শশী দুই জনা।
অথ নাড়ীনির্ণয়। ইড়া বামস্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে মধ্যে নাড়ী সুষুম্না॥
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী দক্ষিণে যমুনা বয়।
মূলাধারে গিয়ে একত্র হয়িয়ে ত্রিবেণী তাহারে কয়।
তাহার মধ্যেতে ধ্বজমূল হতে বজ্রাখ্যা শিরসাবধি॥
বজ্রাখ্যা অন্তরে চিত্রিণী সঞ্চরে মূলাধারে তার বিধি।

কর—কিরণ। পাসরি—বিস্মৃতি। প্রয়োগ—'পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায়।' চণ্ডীদাস। পতঙ্গ বিহঙ্গ ইত্যাদি—গীতার ১০ম অধ্যায়ের বিভূতিযোগের অনুসরণে রচিত।

কে পারে বুঝিতে তাহার অঙ্গেতে চক্র ছয় করে শোভা ॥
তাহার মাঝারে ব্রহ্মনাড়ী ধরে কোটি দিনকর আভা।
আমূল শিরসি বিহরে ষোড়শী পঞ্চাশ অক্ষরে গাঁথা ॥
তাহার মাঝারে কামিনী বিহরে একি অসম্ভব গতা।
ইতি নাড়ীনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

তত্র প্রথমং মূলাধার নির্ণীয়তে ॥

মেরুদণ্ডমূলে আধার কমলে চারিদল চারিভিতে।
অথ ষট্‌চক্রাদি নির্ণয়ঃ। শোণিত আকার অধোমুখ তার বাদি বেদাক্ষর তাতে ॥
তাহে সমুদিত অপান মারুত গ্রীষ্ম নামে ঋতু।
তাহার উপর চক্র মনোহর পৃথিবী বীজের হেতু ॥
অথ মূলাধার। অপূর্ব্ব গঠন চক্র চতুষ্কোণ আবৃত ত্রিশূল বসু।
তাহার মাঝারে লকার সঞ্চরে অঙ্গে তার এক শিশু ॥
নব দিবাকর কিরণ যাহার সৃষ্টির কারণ তিনি।
শোভা চারিকর কমল শরীর চারিমুখে বেদধ্বনি ॥
বামাঙ্গে প্রকৃতি সমান আকৃতি অতুলনা রূপ দোঁহে।
কোটি দিনমণি জিনিয়া রমণী ত্রিভুবন মন মোহে ॥
ত্রিপুরাক্ষনামা চক্র অনুপমা তদুপরি করে শোভা।
কন্দর্প নামেতে মারুত তাহাতে কোটি দিনকর আভা ॥

'মেরোর্ব্বাহ্য প্রদেশে শশি মিহির শিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে, মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয় গুণময়ী চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপা।' ষট্‌চক্রনিরূপণম্ ॥

ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে—'মেরোর্ব্বামে ইড়া দক্ষে পিঙ্গলাচ স্থিতে উভে ॥' ইতি।

'ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।' হটযোগপ্রদীপিকা ॥

'মধ্যে সুষুম্না তন্মধ্যে বজ্রাখ্যা লিঙ্গমূলতঃ।
তন্মধ্যে চিত্রিণী সূক্ষ্মা বিসতন্তু সহোদরা।
মূলমূলাৎ সহস্রারন্তদন্তর ব্রহ্মনাড়িকা ॥' ইতি—মায়াতন্ত্র।

এ সকল মাঝে স্বয়ম্ভু বিরাজে অঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী।
ব্রহ্মদ্বার মুখে সুধা পিয়ে সুখে বদনে মধুর ধ্বনি ॥
সে ধ্বনি ভাবিতে রমণী তাহাতে আসিয়া উদয় করে।
কামরূপা নারী মন করে চুরি কেমনে পাসরি তারে ॥
না জানি নয়ানে কামিনীর সনে কি ক্ষণে হইল দেখা।
হেন মনে অনুমানি ঘটিল রমণী কপালে আছিল লেখা ॥

অথ স্বাধিষ্ঠানং। ধ্বজমূলদেশে কমল প্রকাশে স্বাধিষ্ঠান যারে কহে।
সিন্দুরের আভা অষ্টদল শোভা বাদি পুরন্দর তাহে ॥
বসন্ত মারুত ব্যান সমুদিত বরুণমণ্ডলে তথি।
বকারসবিন্দু যেন আর্ধবিন্দু অঙ্গে ত্রিভুবনপতি ॥
অখিল পালন পুরুষ রতন কিরণ জিনিয়ে ভানু।
করিকর জিনি বাহুর বলনী নীল ইন্দ্রমণি তনু ॥
ভৃগুপদ হৃদি রসের জলধি চারি বাহু করে শোভা।
বামভাগে রামা দোহে অনুপমা কোটি কাম জিনি আভা ॥
রূপ হেরি হেরি আপনা পাসরি নয়ান রাখিলাম বান্ধা।
কমল ভেদিয়ে কামিনী উঠিল দেখিয়ে লাগিল ধান্ধা ॥

'আধার পদ্মং······চতুঃশোণপত্রম্। অধোবক্ত্রমুদ্যৎ সুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ ॥······ধরায়াশ্চতুষ্কোণ চক্রং সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈরাবৃতং তৎ।······তদঙ্কে সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজম্ (লং) ॥······তদঙ্কে নবানার্কতুল্যপ্রকাশঃ। শিশুঃ ইত্যাদি।' ষট্‌চক্রনিরূপণম্ ॥

তথি—তথায়। প্রয়োগ—'মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি।' চণ্ডীদাস। বলনী-গঠন। যথা—'ভুরুর বলনী কামধনু জিনি ইন্দ্র ধনুকের আভা।' চণ্ডীদাস। 'অষ্টদল'—এখানে 'ষড় দল' হইবে, কারণ 'ষট্‌চক্র নিরূপণে' আছে—'অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং ষট্‌পত্রযুক্তম্। 'বাদি পুরন্দর'—ষট্‌চক্রবিবৃত্তিতে আছে—'বিদ্যুৎপ্রকারৈর্বকাদ্যৈঃ পুরন্দরান্তৈর্বাদিলান্তৈঃ সবিন্দুকং পরিবৃতম্ পদ্মম্।'

যাহার মাঝারে বায়ু না সঞ্চরে চিকুর জিনিয়ে ছেদ।
ভুবনবিদিত নিগম এ পথ কেমনে করিল ভেদ॥
নাভি সরোবরে শিখর মাঝারে জলদ জিনিয়া কায়া।
অথ মণিপূর নবীন কমল শোভে দশদল ঢ ফ দশাক্ষরে তায়া॥
চক্রম্। মণিপূর নামা আছে অনুপমা ত্রিকোণ মণ্ডল সাজে।
জিন দিল বধূ বকারস বিন্দু শোভে বৈশ্বানর বীজে॥
সমান মারুত ঋতু সে হেমন্ত তাহে পরকাশ।
সেখানে বুড়াটি করিয়ে ভ্রূকুটি জগৎ করয়ে নাশ॥
জটা ছটা ফণি শিরে সুরধুনী বিভূতি ভূষণ যার।
তরুণ অরুণ জিনি ত্রিলোচন হরে ত্রিভুবন ভার॥
বামভাগে রামা চতুর্ভুজ শ্যামা উপমা কি দিব তায়।
আসব আবেশে কলেবর খসে বিলসে মদন বায়॥
আহা মরি মরি এরূপ মাধুরী নয়ান পহরি রাখি।
কমল কুহরে কামিনী বিহরে এ কি অপরূপ দেখি॥
যে দিক নয়ানে নিরখি সেখানে কামিনী এ বহুরূপা।
কাহারে কহিব দেখাতে পারিব সহজে হইব ক্ষেপা॥
অথ অনাহত দেখ বক্ষিমাঝে কমল বিরাজে অনাহত অবিধান।
চক্রং। বাণ তিল ফল তাতে অনুকূল কঠদল পরিমাণ॥
প্রভাত অরুণ জিনিয়া কিরণ হেরিলে হরিবে মন।
প্রাণ মারুত সদত উদিত তদুপরি ষট্‌কোণ॥

তায়া—তায়ি (ব্রজ) তাহারই। যথা—'পসারল তায়ি মধ্যত পাঁচবাণ।' বিদ্যাপতি।

অবিধান—শাস্ত্রবিধিরাহিত্য। প্রয়োগ যথা—অবিধানেন যৎ কুর্য্যাৎ তৎসর্ব্বং বিফলং ভবেৎ।' (স্মৃতি)॥ সদত (সতত) যথা 'সম্বোধন করিয়ে সদত ইহা কয়।' শিবায়ণ।

পবন ভবন জিনিয়ে নয়ন স-বিন্দু য়-কার তাহে।
ত্রিকোণ প্রকৃতি তাহে পশুপতি বাণলিঙ্গ যারে কহে॥
মারুত মাঝারে পুরুষ বিহরে বরাভয় করে দান।
বামে বরাঙ্গনা শোভে ত্রিনয়না চপলা জিনিয়া মান॥
মগনা বিহরে চারি বাহু ধরে নৃকপাল করে পাশ।
তহি নিরমল রাহত অনিল জ্যোতি করে পরকাশ॥
তহি পরবিধি কারণ জলধি মাঝে মণিময় পীঠ।
সুরতরুবর তাহার উপর হেরিলে হরিষে দিঠ॥
সেহ তরুমূলে রতনবেদী চিন্তামণি নিবাসা।
অতি সুগঠন জটিত রতন দিনকর পরকাশা॥
ভানুর মণ্ডল তহি অনুকূল সকল দেবের ধাম।
সুরাসুরগণ সেবিত ভবন ত্রিভুবন অনুপম॥
কহিব কাহারে ভবন দুয়ারে বজ্র সমান কপাট।
কঠিন সে অতি কাহার শকতি কেবা করে উৎপাট॥
অনেক যতন করিয়া ভুজন কপাট খুলিয়া দেখি।
তাহার মাঝারে কামিনী বিহরে অমনি ভুলিল আঁখি॥
আহা মরি মরি এরূপ মাধুরী চরণে চান্দের ঘটা।
কেমন কামিনী কোটি দিনমনি জিনিয়ে রূপের ছটা॥
চাঁচর চিকুর শোভে উরুপর তাহে মালতীর মাল।
কটিতট ক্ষীণ ভূষিত ভূষণ বসন মদন জাল॥
তনু বিরচন সব আভরণ কেবা করে পরিমাণ।
মুখ হেরি হেরি কত সহচরী পীযূষ করিছে দান।

মান-প্রণয়কোপ। যথা—'এ ধনি মানিনি মান নিবার।' চণ্ডীদাস। পীঠ—বেদী। দিঠ (দিঠি) দৃষ্টি। যথা—'এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।' চণ্ডীদাস। চাঁচর—কোঁকড়া। বিরচন—গঠন। সব - শব হইবে।

করিয়ে যতন রমণী রতন যে দেখেছ একবার।
হেরিলে এ ধন থাকিতে জীবন সে নাকি ভুলিবে আর॥
যেখানে হেরিব, তহি নিরখিব ইথে কি করিব আর।
কমলাকান্ত হেরি নিতান্ত কামিনী হইল সার॥

অথ বিশুদ্ধ চক্রং।

বিশুদ্ধ নামেতে চক্র বৈসে কণ্ঠদেশে।
ধূম্রবর্ণ ষোলদল তাহাতে প্রকাশে॥
অকারাদি ষোড়শ অক্ষর করে স্থিতি।
ষোলদলে ষোলবর্ণ শোণিত আকৃতি॥
তাহাতে শিশির ঋতু আকাশে স্থান।
উদান মারুত তাহে আছে বিদ্যমান॥
বর্ত্তুল মণ্ডল তাহে পূর্ণকলা শশী।
তাহার নিকটে এক উত্তম সন্ন্যাসী॥
দশবাহু ত্রিলোচন পঞ্চমুখ ধরে।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান সর্ব্বসিদ্ধি করে॥
আদিনাথ সুধার সমুদ্র মাঝে স্থিতি।
বামে চতুর্ভুজা পীতবর্ণা এক সতী॥
মণ্ডল মধ্যেতে মহামোক্ষের দুয়ার।
বিচক্ষণ যেই মনে লাগে তার॥
কামিনী কমলভেদে কাহারে কহিব।
কেবল কথায় কার প্রত্যয় হইব॥
অসম্ভব দেখিলে প্রত্যয় নাহি যায়।
কহিতে এসব কথা কভুনা উয়ায়॥

(ব্রজ) উয়ল। উদিত হইল। যথা—'কনকলতা অবলম্বনে উয়ল। হরিণী-হীন হিমধামা॥' বিদ্যাপতি।

কেবা আছে দোসর ঘুচায় মোর বাধা।
ক্ষেপার কথা ক্ষেপা বুঝে অন্যে লাগে ধান্ধা॥

অথ আজ্ঞাখ্য চক্রং।

আজ্ঞানামে চক্র এক ললাটে নিবাস।
দক্ষিণ বামেতে দুটি দলের প্রকাশ॥
শশীসম কিরণ উত্তম সেই স্থান।
হ-কার ক্ষ-কার দুটি দলের প্রধান॥
তাহাতে বর্ষা ঋতু সতত সঞ্চরে।
লিঙ্গিচিহ্ন মন তাহে সূক্ষ্মরূপ ধরে॥
কমল মধ্যেতে এক প্রকৃতির বাস।
ছয়মুখ রূপেতে তিমির করে নাশ॥
অপূর্ব্ব অক্ষর দুটি চক্রেতে নিবাস।
গুরু উপদেশে তাহা করিব প্রকাশ॥
আর যত কহিলাম গুপ্ত সে কথন।
তাহার মধ্যেতে ব্যক্ত বট এই ধন॥
সর্ব্বঘটে সতত সঞ্চরে এই ধর্ম্ম।
যত দেখ বিধান প্রধান এই কর্ম্ম॥
গুরুবিনা অজ্ঞান অস্থির যত লোক।
না জানি ইহার তত্ত্ব ভুঞ্জে নানা শোক॥
এই সে উত্তম জ্ঞান প্রকাশ করিব।
জগত ভাবিয়ে রস গায়িবারে থোব॥
যতনে করনা সার শ্বাস নিরীক্ষণ।
সদাই মারুত করে গমনাগমন॥
নির্গত হইলে বায়ু হ-কার সঞ্চরে।
স-কার শব্দে পুন প্রবেশে অন্তরে॥

অই দুটি অক্ষর বেদের আদিমূল।
হংস-মন্ত্র জপে জীব হইয়ে ব্যাকুল॥
জপে বটে সর্ব্বদা জ্ঞানের নাহি লেশ।
ইহার কারণ দেহী পায় নানা ক্লেশ॥
গুরু উপদেশে ইহার বিশেষ জানিব।
অল্পে অল্পে সেই বায়ু স্তম্ভিত করিব॥
স্তম্ভিত করিলে বায়ু মন হবে স্থির।
জরামৃত্যু জঞ্জাল ত্যজিবে সে শরীর॥
এ কর্ম্ম করিলে হয় মনের দমন।
অনায়াসে অন্তরে হেরিব নিরঞ্জন॥
এই সব তত্ত্বকথা কহিতে কহিতে।
অকস্মাৎ কামিনী উদয় করে তাতে॥
কেবা জানে কারণ কেমন সেই মায়া।
পরাক্রম করি উঠে কমল ভেদিয়া॥
কামছক্তা কামিনী তিলেক নাহিক ক্ষমা।
একে একে ছয় চক্র ভেদ কৈল বামা॥
নিশ্চয় জানিল এই ব্রহ্মের দুয়ার।
পুনর্ব্বার উঠিল ছাড়িয়া হুহুঙ্কার॥
তাহার উপরে এক কমলের কথা।
অথ ব্রহ্মনিরূপণং। শূন্যদেশে সঙ্গিনী তাহাতে আছে গাঁথা॥
কমল সহস্রদল অধোমুখ যার।
পঞ্চাশৎ অক্ষরে দলের ব্যবহার॥

হংস—'হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।'
'সোঽহং হংসে পদে নৈব জীবে জপতি সর্ব্বদা।'
এই হংস-মন্ত্রকেই অজপা বলে।

কমল দ্বাদশদল তাহার অন্তর।
ঊর্দ্ধমুখে উদয় প্রকাশে মনোহর॥
নব দিবাকর জিনি কমলের আভা।
সুধা সরোবর মাঝে কর্ণিকার শোভা॥
তাহার মধ্যেতে এক চক্র অনুপম।
অকথ যাহার নাম হলক্ষের ধাম॥
হলক্ষমণ্ডল মাঝে হংসের কারণ।
জ্যোতির্ম্ময় জীবের জীবন যেই জন॥
নিরাকার সাকার কে জানে তার কথা।
নির্গুণ সগুণ কিবা পুরুষ বনিতা॥
পর্ব্বতের ন্যায় জ্যোতিঃ জ্বলে দিবারাতি।
কেবল আনন্দময় কে জানে আকৃতি॥
নিরঞ্জন নিরাকার সভে কয় তাঁরে।
কিন্তু যেরূপ যেখানে ভাবে সেইরূপ ধরে॥
একক প্রধান সেই কভু হয় দুটি।
কখন অনেক হয় বাড়ায় ভ্রূকুটি॥
স্থূলসূক্ষ্মরূপ ধরে সর্ব্বঘটে রয়।
ভেদাভেদ জ্ঞান তার কখন না হয়॥
শুদ্ধ কিবা অশুদ্ধ তাহাতে নহে আন।
সর্ব্বময় সকল শরীরে বিদ্যমান॥
মায়াপাশে বদ্ধ হৈয়া জীব নাম ধরে।
আপনার ভেদাভেদ আপনি সে করে॥
পাশবদ্ধ হৈয়া কর্ম্মের শোধে ঋণ।
কার পাশে আপন কাহারে বাসে ভিন॥

বৃহৎ জঞ্জাল জ্বালা বাড়ায় আপনি।
স্ত্রীপুত্র ধন বলে করে টানাটানি ॥
মিছামিছি পাপের পসরা লয় শিরে।
সভেমাত্র যাতায়াত সংযমনপুরে ॥
এইরূপে কতদিন করে আকিঞ্চন।
পুনর্ব্বার আপন আশ্রমে জাতে মন ॥
মায়া খণ্ডিবারে করে অনেক উপায়।
ভক্তরূপে আপনি আপন গুণ গায় ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মপাশ আপনি সংহারে।
আপনি প্রবেশে গিয়ে আপন শরীরে ॥
সৃষ্টির আরম্ভ কালে এই ব্যবহার।
ইচ্ছা আর জ্ঞানরূপা ক্রিয়াশক্তি তার ॥ *
সত্ত্বরজ-তম গুণে হয় তিন জন।
চতুর্দ্দশ ভুবনের পরম কারণ ॥
ব্রহ্ম হয়ে সৃজিয়ে পালন কালে হরি।
সংহার কারণ তম আপনি ত্রিপুরারী ॥
এইরূপে সৃষ্টি করে পালন প্রলয়।
চরাচর জগত দেখ সেই সর্ব্বময় ॥
নিশ্চয় জানিও এই ব্রহ্মের আচার।
ইহাতে যে কহে তারে কোটি নমস্কার ॥

সংযমনপুর—যমপুরী। যথা 'বৈবস্বতঃ সংযমনঃ।' মূলে আছে "সংজমান পুরে"।

* 'গোরক্ষসংহিতায় আছে—'ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতালোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি।'

চতুর্দ্দশ ভুবন—সপ্ত পাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দ্দশ।

কভু গৃহাশ্রম করে কভু হয়
আপনার গুণেতে আপনি অনুরাগী ॥
সেবক হইয়ে করে সাধনবিশেষ।
গুরু হৈয়ে প্রকাশে জ্ঞানের উপদেশ ॥
নিশ্চয় জানিও এই ব্রহ্ম-নিরূপণ।
জ্যোতির্ম্ময় পরম কারণ সেই জন ॥
জ্যোতিশিখা মধ্যে বিন্দু সহ অর্দ্ধশশী।
সর্ব্ব আচ্ছাদন তাহে নির্ব্বাণ ষোড়শী ॥
নির্ব্বাণ শক্তির মাঝে অমৃতের পথ ॥
যোগেন্দ্র জনার করে পূর্ণ মনোরথ ॥
সহস্রার পদ্ম মাঝে পূর্ণ শশধর।
সুধাবৃষ্টি করে সদা জ্যোতির উপর ॥
নিরাকার নির্গুণ হইয়ে গুণবান্।
সদানন্দ সদা মকরন্দ করে পান ॥
ব্রহ্ম নিরূপণ কথা অদ্ভুত কাহিনী।
হেনকালে সিংহনাদ করে সে কামিনী ॥*
কামিনী রূপের ছটা তিমির বিনাশ।
কমলাকান্তের মনে পরম উল্লাস ॥
ইতি ব্রহ্মনিরূপণং সমাপ্তং ॥

অথ সমাধিনির্ণয়। চঞ্চলা চপলা জিনিয়ে প্রবলা অবলা মৃদু মধু হাঁসে।
সুমনি উন্মনি লইয়ে সাঙ্গিনী ধাইল ব্রহ্মনিবাসে ॥
উন্মত্তবেশা বিগলিতকেশা মণিময় আভরণ সাজে।
তিমিরবিনাশী বেগে ধায় রূপসী ঝুনুঝুনু নূপুর বাজে।

* মূলে আছে,—'সেই কালী।'
সুমনি—'সুমনা' হইবে। উন্মনি—শুদ্ধ প্রয়োগ 'উন্মনা' হইবে।

জাতিকুল নাশিয়ে উপনীত আসিয়ে অমৃত সরোবর তীরে।
প্রেমভরে রমণী শিহরে পুলকে তনু মন্দ সমীরে ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়ে আকাশে চড়িয়ে ব্রহ্মদ্বার বিদারে।
আতুর মদনে বিধুবর বদনে পঞ্চম রাগ উগারে ॥
বিসবর ভেদিয়ে রসিকেরে দেখিয়ে ভাসল প্রেমপ্রমোদে।
শতকোটি দামিনী জিনিয়ে কামিনী স্মরহর সহিত বিনোদে ॥
আদি বনিতা রতি বিপরীতা সুখময় সদন নিবাসে।
দিঙ্ময় বসনে বিধুরস আসনে কেলি সমাপন ॥
কামিনীর আগমন হরপুর আদি সরোজে।
কুলপথ ভেদিয়ে মূলাধারে আসিয়ে পুনরপি রমণী বিরাজে ॥
বদন প্রকাশে শশধর বরিষে বিলসয়ি পুরহর অঙ্গে।
কমলাকান্ত হেরি মুখমণ্ডল ভাসই প্রেমতরঙ্গে ॥
পুন রামা চিন্তামণিপুরে করে বাস।
চিন্তিলে চৈতন্য পাই অচৈতন্য হ্রাস ॥
নিত্যধাম সেই স্থান নাম চিন্তামণি।
সুন্দরী প্রকাশ তাহে দিবস রজনী ॥
কামিনী করিয়ে বর্ণিলাম কথা।
নির্ব্বাণ কারণ তিনি বাঞ্ছা সিদ্ধিদাতা ॥
গাণপত্য শৈব কিবা বিষ্ণুপরায়ণ।
শৈব শক্তি সকলের সেই মহাধন ॥

পঞ্চমরাগ—রাগ ছয় প্রকার ঃ—ভৈরব, মালবকোষ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী (শীতে গেয়) ও মেঘ। বিসবর—পদ্মের ডাঁটা, মৃণাল। উগারে—বর্ষণ করে। যথা 'কোকিল উগারে মধু' ইত্যাদি। ঘনরাম।

দিঙ্ময়—মূলে আছে 'দিনময়'। পুরহর-ত্রিপুরারী মহাদেব।

কখন প্রকৃতি কভু পুরুষ প্রধান।
ভাবসিদ্ধি সকলের ইথে নাহি আন॥
নিরাকার সাকার আছয়ে সর্ব্ব ঠাঁই।
ইক্ষুদণ্ড দলে চিবাইলে রস পাই॥
দুগ্ধের সহিত যেন ঘৃতের বসতি।
কাষ্ঠের অন্তরে যেন অনলের স্থিতি॥
লৌহযোগে পাষাণে নির্গত হয় কণা।
এইরূপে সর্ব্বঘটে তাহার ঘটনা॥
আধার বনিয়ে যদি ঘটে ভাব তিনি।
ব্রহ্মজ্ঞানের মতে কন্দুলের চিনি॥
ঘটবস্তু গঠনের মর্ম্মকথা এই।
স্থলজল অনল অনিল শূন্য সেই॥
রে বটে তার তেজ গুপ কভু নয়।
উদয়াস্ত করে সে বেদান্তবাদী কয়॥
ধ্যানগম্য সকল ধ্যানের এই ক্রম।
নিরাকার ভাব্য হইতে সাকার উত্তম॥
ধ্যানসিদ্ধি যে জনার মুক্তি তার ঠাঁই।
কিন্তু চিনি খেতে ভাল হৈয়া কাজ নাই॥ †
যেমন আছে সেই ভাল নির্ব্বাণ কিছু নয়।
মুক্তি হৈতে ভক্তি ভাল কমলাকান্ত কয়॥

বনিয়ে—বানাইয়া, নির্ম্মাণ করিয়া। কন্দুল—পদ্মবীজ। গুপ—(গুপ্ত শব্দ) যথা—'অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা। গুপতে গুমরি মরি মরি।' চণ্ডীদাস।

† প্রসাদ পদাবলীতে আছে—'ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় (মন) তার দাসী। নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল। ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

অথ বিষয়ভঞ্জন। মত্ততা ত্যজিয়ে মন কর সাধুসঙ্গ।
অনায়াসে লভ্য হবে জ্ঞানের তরঙ্গ॥
জ্ঞানের তরঙ্গে আছে ভক্তিরূপা তরী।
শ্রীনাথ গোস্বামী তাহে আপনি কাণ্ডারী॥
জ্ঞানসিন্ধু প্রথম দেখিতে লাগে ভয়।
কাণ্ডারী উদ্দেশে অনায়াসে পার হয়॥
সুখ ভাবিয়ে মন মজেছ ভাল ভবে।
তরী বিনা না জানি কখন ডুবিবে॥
কি কর কি কর মন কাল যায় বয়া।
রাজত্ব পেয়েছ ভাল সংসারে আসিয়া॥
হিতবাক্য শিখাইলে তুমি ভাব আর।
কোথায় শিখাচরে এমন ব্যবহার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম কর মনক্‌ভাগী আমি।
লাগায়ে টাটর বাজী রঙ্গ দেখ তুমি॥
সুন্দরী দেখিলে মন হেসে কহ কথা।
কুরূপা দেখিলে যায় নোয়াইয়ে মাথা॥
অস্থিশুক্রশোণিত শরীরে সভাকার।
দেশাদেশ কর তুমি এ কোন বিচার॥
অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখে তুমি কর লোভ।
কামিনী কটাক্ষ করে তুমি পাও ক্ষোভ।
সকলে প্রধান তুমি কর ঠাকুরালী।
অকারণে চক্ষু দুটা খেয়ে মরে গালি॥

মনক—(মনাক্) ঈষৎ, অল্প। টাটর—সম্ভবতঃ টাট্টু বা ঘোড়া হইবে। শিখাচরে—শিক্ষা করিয়াছ।

ভাগ্যমানে করে ভোগ তুমি পাও ব্যথা।
কর্ম্মের অধীন ফল কে করে অন্যথা ॥
সর্ব্বঘটে এক বস্তু এই কথাটি ধরে।
অনর্থক ভেদাভেদে করে কেন মরে ॥
অন্যের মরণ দেখে শোকেতে অস্থির।
অক্ষয় অমর ভাবে আপন শরীর ॥
পিঠা খেয়ে মিঠা মুখ না গণিলে ফোড়।
জাননা যে আপন মন্দিরে জাগে চোর ॥
এ ধন যৌবন তোর মদ্যের সমান।
রূপগুণ দুটি মদ্য তুমি কর পান ॥
এক মদ্যে মাতিলে মাতাল বলে তায়।
চারি মাতিলে তুমি কি হবে উপায় ॥
বিষয় বিষম বিষে মজিলেরে মন।
শমন শাসিলে তোরে রাখিবে কোন জন ॥
আসিলে যমের দূত হাতে লয়ে দড়া।
বিপরীত বন্ধনে বান্ধিবে পেছে মোড়া ॥
লৌহের মুদ্গর পাবে মাথার উপর।
কাহার দোহায়ি দিবে কে তোর দোসর ॥
কে তোমার কার তুমি চায় মুখ।
ঠেকিলে ঠকের হাতে পাবে বড় সুখ ॥
জন্মিলে মরণ আছে তাহা তুমি জান।
অকারণ শরীর অক্ষয় করে মান ॥

না গণিলে ফোড়—আহারের সুখ পাইয়াছ কিন্তু আগুনের উত্তাপে আস্কের সর্ব্বাঙ্গে যে ছিদ্র হয় সেই ছিদ্র গুণিবার কষ্ট সহ্য হয় নাই। পরিণাম চিন্তা না করিয়া দুরূহ কার্য্যের সূত্রপাতে তাহা সহজসাধ্য মনে করা।

যাতায়াতে একক দেখ দোসর প্রাতে নাই।
তবে কেন জড়াজড়ি করে মর ভাই॥
জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অবশেষ।
ভেবে দেখ সংসারে সুখের নাহি লেশ॥
যখন আছিলে জীব জঠর নিবাসে।
পাসরিলে জঠর যন্ত্রণা দশ মাসে॥
তথাপি তখন তোর তত্ত্বে ছিল মন।
পৃথিবীতে জন্মিয়ে হারাইলি সেই ধন॥ *
বন্ধপাশে পণ্ডিত পড়িয়ে গেলে ভোলে।
পুত্র বলে জননী তুলিয়া নিল কোলে॥
বন্ধপাশে বিধির লিখন বলবান্।
কে খণ্ডিতে পারে ভাই কর্ম্মের বিধান॥
কর্ম্মরেখা সারথি বসিয়ে গেল ভালে।
যে দিকে চালায় রথ সেই দিকে চলে॥
বাল্যের বিষম লেঠা অধিক জঞ্জাল।
অপমান ভঞ্জি পরবশে যায় কাল॥
বিভাচ্ছলে বন্দী করে হাতে দিয়া দড়ি।
লক্ষ মণ লোহার নির্ম্মিয়ে দেয় বেড়ী॥
যখন যুবক তনু যুবতীর খেলা।
মম সম যৌবন যুগিয়ে দেহ ডালা॥
তুমি কর নাগরালি সে করে সংহার।
শেষে হেঁটো ধরে বসিলে উঠিতে পারা ভার॥

---

* পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ড) আছে—
'গর্ভস্থস্য মতির্যাসীৎ সা জাতস্য প্রনশ্যতি।'

অনুরাগ রোগের অঙ্কুর বান্ধে পুড়া।
অনায়াসে পঞ্চাশ বৎসরে হয় বুড়া॥
অন্ত যায় দন্ত যায় বাতে ধরে গাটি।
শেষে কর্ম্মের যোগ্যতা নাই বসে বসে আটি॥
ক্ষণ কাশি বাতাসে কোমর পড়ে খসে।
মিছামিছি চোবল নাড়ে বসে॥
অন্যে বলে বুড়া বুঝি জপ করে কার।
হেথা তার সঙ্গে দায় নাইকো দাড়িনাড়া সার॥
বৃদ্ধকাল বর্ণিতে উপজে উপহাস।
মুখে বড় দাপট অন্তরে বড় ত্রাস॥
ক্ষুধার সময়ে যদি কিছু পায় খেতে।
যেন দৈন্য পাইলে স্বর্ণ কলস পাজাতে॥
যতদিন ধন উপার্জ্জনের শকতি।
তাবৎপর্য্যন্ত হয় পরম আরতি।
যখন যোগ্যতা ছিল হাতে নাহি কড়ি।
কেহ না সম্ভাষে তায় যায় গড়াগড়ি॥
অবশ ইন্দ্রিয়গণ যমে ধরে কেশ।
এখন তখন মরে তনু অবশেষ॥
তথাপি না ভাবে নিজ অবসান দশা।
মানস মার্কণ্ডেয় জিনিতে করে আশা॥
ত্রিদোষ দংশনে তনু হৈল অতি জরা।
কফে কণ্ঠ নিরোধ নিশ্বাস বহে ত্বরা॥

পুড়া—আটি। অন্ত—মনের ভাব। চোবল (গ্রাম্য) ছোবল।

শ্রুতিহীন কর্ণ মুখে বাক্য নাহি আর।
চক্ষু মিলে অনিমিখে দেখে অন্ধকার ॥
নিরখিয়ে জীবের নিঃশ্বাস ঊৰ্দ্ধবাট।
পরম শিবের পথে লাগিল কপাট ॥
সয্যসিত কণ্টক সমান বিন্ধে কায়া।
তথাপি না দূর হয় শরীরের মায়া ॥
ভ্রমণ করয়ে জীব যেথানে যে নাড়ী।
সচান সময় কাল যায় তাড়াতাড়ি ॥
ধন লয়ে ধনী যায় সুত্র যায় পাছে।
মৃত্যুসম যন্ত্রণা জগতে কিবা আছে ॥
প্রাণ লয়া ব্যাকুল বিপাকে পড়ে গাথা।
ইথে বল ঈশ্বর প্রসঙ্গ থাকে কোথা ॥
অতএব যাবৎ যোগ্যতা নহে হীন।
তাবৎ পর্য্যন্ত দেখ আপনার দিন।
কদাচ না মরে জীব মৃত্যুভাগী তনু।
ধৰ্ম্মে কৰ্ম্মে অধৰ্ম্মের সাথী চন্দ্রভানু ॥
পুণ্যকর কৰ্ম্ম কিংবা পাপদেহ মন।
ভেবে দেখ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উভয় বন্ধন ॥
একবার মরিলে আসিবে আর বার।
কহ দেখি এ সব যন্ত্রণা হবে কার ॥
কামনারহিত হয়ে যদি কর কৰ্ম্ম।
কৰ্ম্মফলে কৰ্ম্মনাশে আছে তার মৰ্ম্ম ॥
কাষ্ঠেতে উপজে বহ্নি কাষ্ঠ করে নাশ।
কাম সহি কৰ্ম্মে কাটে মায়াপাশ ॥

কমলাকান্তের কথা না কর হেলন।
কর্ম্মক্ষয় কাটিতে কেবল নিরঞ্জন ॥

অথ যোগপ্রকরণম্।

যোগের বিধান যেবা জানে সেই মহাদেবা জ্ঞানসিন্ধু অনিলের গতি।
আদৌ কিঞ্চিৎ কহিব সার ভবসিন্ধু হইতে পার যাহাতে সুস্থির হয় মতি ॥
আসন- প্রথমে আসন মূল কত আছে নাহি কুল করিতে শরীর সমাধান।
বিধিঃ। যত দেখ জীব-জন্তু সকল আসন কিন্তু তাহে কর একট প্রধান ॥
দক্ষ পদ বাম অঙ্গে বাম পদ দক্ষ অঙ্গে দৃঢ় করি কর আরোপণ।
বুকেতে চিবুক দিয়ে নাসিকাগ্র নিরখিয়ে হৃদিমাঝে সম নিরীক্ষণ।
শুনিয়ে না কর ভয় সাধিলে অসাধ্য নয় যারে কহে বদ্ধপদ্মাসন ॥
আত্মযোগ প্রাণায়াম যদি করে এক যাম সেয়ি জন সাধকের রাজা।
অথ পাত করিয়ে বংশ আপনি পরমহংস দেবলোকে করে তার পূজা ॥
প্রাণা- শুনহ তাহার বিধি শুভ পদ্মাসন বান্ধি মারুত করহ নিরীক্ষণ।
য়ামঃ। পূরকে ষোড়শবার কুম্ভ চতুর্গুণ তার কুম্ভকের অর্দ্ধেক রেচন ॥
পূরকেতে বামনাশা রেচকে দক্ষিণনাশা কুম্ভে রোধ উভয় নাসিকা।
ইথে মূলমন্ত্র বিধি আধরা প্রণব সাধি বোধনে অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা ॥
তিন গুণ তিন দেবা তিন কার্য্য কর সেবা আধরা কেবল নিরঞ্জন।

একট—একমাত্র; একই। 'ঘেরণ্ড সংহিতা' ও 'হঠযোগপ্রদীপিকাতে' আছে—'বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা, দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ম্। অঙ্গুষ্ঠৌ হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েদেতদ্ব্যাধিবিনাশকারি যমিনাং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে।'

প্রাণায়াম তিন প্রকার যথা—

'কনীয়সি ভবেৎ স্বেদঃ কম্পোভবতি মধ্যমে।
উত্তমে স্থানমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ ॥" হঠযোগ।
আধরা—(আধার) ষট্চক্র মধ্যে আদ্যচক্রের আধার।

সত্ত্বরজস্তমগুণে জড়িত করিয়ে তিনে তিন কার্য্য কর নিরীক্ষণ ॥
যথাক্রমে জোট পাই অনুক্রমে কর তাই পূরক কুম্ভক সুরেচন।
মহাবেগে বায়ু ধায় শ্রুতি না শুনিতে পায় তারে কহে উত্তম সাধন।
পুচ্ছিতা পূরকে পাই কুম্ভকেতে বায়ু আই রেচকেতে রোগ বিমোচন ॥
করিতে সাধন বিধি শরীর কাঁপয়ে যদি ঊর্দ্ধগতি উঠিবে আসনে।
মনেরে কর হে স্থির শরীর হইবে ধীর অল্পাহার তাহার ঔষধি ॥
কমলাকান্তের ভাষা অবশ্য পূরিবে আশা যদি কর যে কহিলাম বিধি ॥

সেহ কারণ করিতে সাধন এ বড় মরম কথা।
অথ দুয়ারে আপনি শুয়াছে আপনি পবন সরিবে কোথা ॥
সুষুম্নাদ্বার শুন শুন তার মারুত তাহার মুখানে দুয়ারে দিয়ে।
মোক্ষণম্। সুমেরু গমন করিতে পবন পুন আয়িসে উলটিয়ে ॥
পথ বিমোচন আছে এ কারণ শুনহ তাহার ভাষা।
কহিব যেমন করিবে তেমন পূরিবে মনের আশা ॥
প্রথমে আসন কয়াছি সাধন যতনে করিবে তায়।
বসি ধীরি ধীরি সরু সরু করি পবন পূরিবে কায় ॥
তিন কোন বালি জ্বলিবে আগুনি তাহাতে পড়িবে ফু।
সহিতে না পারি পদ্ম পরিহরি লাগিনি ছাড়িবে মু ॥
সে পথ গমন করিতে পবন তাহাতে উঠিবে ধ্যান।
সে ধ্বনি মাঝারে ভাব আপনারে তবে সে সাধক জান ॥
পুন সেই ধ্বনি উঠিয়ে আপনি যেখানে হইবে লয়।
সেই সে পরম পদ অনুপম কেবল আনন্দময় ॥
প্রথম সাধন করিলে রচন করহ সাধকজন।
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত এই সে পরমধন ॥
রে রে বন্ধো সাধকসিন্ধো যোগ পরম করি জান।

অথ খেচরী মুদ্রা। আসন বান্ধয় আধপল সাধয় অমুচয় দূর পয়ান ॥
সুস্থির নয়ান বিনা অবলোকন বিষধর আপন দেহ।
স্থিরতর অনিল বিনা অবলোকন বরিষব আনন্দ মেহ ॥
মন অতি স্থির বিনা অবধান নিশিদিন সম উজিয়ারা।
বসনে তালুবেন পথ নিরোধব শশধর বিতর ধারা ॥
আপহি মূল মুহ নিরঞ্জন উভয় মূল কুরু এক ;
রে মন সাধয় রিপুকুল নাশয় দূরয় বরণ বিবেক ॥
কিঞ্চিৎ ভেদ শুন পুনজো আকার ব্রহ্ম করি সেবে।
ইহবিধ সকল কিন্তু অচল মরণর যেব নিজ নিজ দেবে ॥
পরং যোগ অবধান যে চরি * * * * *

* * * * *

অণিমাদি গুণ ঊনবিংশতি ভেদনে।
বিংশতি ভেদিয়ে করে যোগ নিরীক্ষণ।
জ্যোতির্ম্ময় দেখ একবিংশতি ভেদন ॥
দ্বিতীয়বিংশতি ভেদ সকল সঞ্চার।
বাক্‌সিদ্ধি হয় ত্রয়োবিংশতি বিচার ॥
চতুর্ব্বিংশতি ভেদিলে মায়ামোহ টুটে।
পঞ্চবিংশে সকল বাঞ্ছিত আসি ঘটে ॥
আর পরিগাঁঠি ভেদ করএ সাধন।
ত্রিশগাঁঠি ভেদিলে সমাধি মহাধন ॥
করবাল কর যদি শুন এই যোগ।
তথাপি পাপের ধ্বংস দূরে যায় রোগ ॥

মেহ—মেঘ। যথা—'মেহ সঘনে বরিখনিয়া।' বলরাম দাস। উজিয়ারা-উজ্জ্বল।

শিবের বচন সত্য মিথ্যা কিছু নয়।
গাঁঠ ভেদের কথা কয়॥

ঘরের ভিতরে লয়ে দুয়ারে কপাট দিয়ে দ্বাদশ আঙ্গুল ভরে পেটে।
অথ যদি পলাইতে চায় দৃঢ় করি ধরে তায়,ঠেলাঠেলি করে লয়ে হেটে॥
মোক্ষবার্ত্তা। রমণী লইয়ে সাথে ধায় পদ্মবন পথে ফলে কপালে হয় কালি।
সাহসে করিয়ে ভর প্রবেশে পরের ঘর ধর্ম্মাধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি॥
সঙ্গীগুলা যুঝে মরে কেবা তার উদ্দেশ করে কেবা তার পায় পরিচয়।
একবার সর্ব্বনাশা একাকী করিয়ে বাস যমেরে দেখিতে লাগে ভয়॥
সদামত্ত মধুপানে আপনারে শ্লাঘ্য মানে আত্মঘাতী বটে সেই প্রাণী।
অথ কৌতুকে কমল কয় শুনিয়ে না কর ভয় সেইজন সাধক চূড়ামণি॥
দশদ্বার যোগের বিধান শুনিতে ভয় করিতে সকলি হয়॥
নিরূপণম্। ভয় করিনা ভবের নাগর।
আপনি হইবে সুখের সাগর॥
আলিস করা নিদ্রা যাই দুঃখের ভার কিছুই নাই॥
হাত পলায়া থাক পড়ে। যোড়া যোড়ায় চড়ে॥
শুনিলে শুন আবার কই। তোমা আমা ভিন্ন নই॥
হিয়া মাঝারে প্রদীপ জ্বলে। হংস মন্ত্র সদাই বলে॥
আনার ঘরে আমি থাকি। তোমার ঘরে তোমায় দেখি॥
যদিনা ঘরত দিন রব। ঘর ভাঙ্গিলে একটি হব॥
ঘর খানি তার একটি খুঁটি। খুঁটির মাঝে শতেক কুটি॥
কুটির ভিতর থাকে যে যত রঙ্গের গোড়া সে কায়ামন্দির দশদ্বার॥
একটি দুয়ার জানা তার দুই চক্ষু দুই নাসা দুই কর্ণ এক ভাসা।
গুহ্য আর লিঙ্গ নয় একদ্বার তপনে বয় সেই দ্বারে মনের বাসা॥
তাই নিলে পূর্ণ আশা॥

কমলাকান্ত কথা জান।
সেই স্থানটির মর্ম্মজ্ঞান॥

অথ বায়ু বিবরণং।

দশদ্বারে চলিলে বায়ুর শুন কর্ম্ম।
দেহমধ্যে দশ বায়ু করে কোন কর্ম্ম॥
সর্ব্বদা অপান বায়ু ফেলাবারে।
শরীরে মলমূত্র বিসর্জ্জন করে॥
স্বাধিষ্ঠান চক্রে থাকে ব্যান বায়ু যেই।
বস্তু নই বাঙ্গা করে সেই॥
সেই বায়ু সমস্ত শরীরে করে বাস।
পাত্রর ঔষধে মস্তকের রোগনাশ॥
মণিপূর চক্রেতে সমান বায়ু থাকে।
সর্ব্বকাল অনল উজ্জ্বল করি রাখে॥
প্রাণবায়ু অনাহত চক্র যার স্থান।
হংস-মন্ত্র সর্ব্বদা সাধয়ে বলবান্॥
জপ যজ্ঞ সনে যোগের অবিধান।
যত কিছু জারত পর্য্যন্ত আছে প্রাণ॥
বিশুদ্ধ বামেতে চক্র উদানে স্থিতি।
ব্রহ্মের দুয়ার খানি রাখে নিতি নিতি॥
প্রাণ আদি পঞ্চবায়ু শুনিলে কারণ।
নাগ আদি পঞ্চ তার শুন বিবরণ॥
নাগ বায়ু শরীরে চেতন করায়।
লোচনে নিমিখ হেতু কর্ম্ম থাকে তায়॥

দশ বায়ু যথা ঃ—প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ। নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।' গোরক্ষঃসংহিতা।

কৃকর বায়ু কর্ম্ম শুন বিবরণ।
সেই বায়ু ক্ষুধা আর তৃষ্ণার কারণ॥
হাঁচে হাই হাস্য দেবদত্তের আচার।
ধনঞ্জয় বায়ু হৈতে শব্দের সঞ্চার॥
ধনঞ্জয় বায়ু থাকে মজ্জার ভিতরে।
মলে তিনদিন থাকে শরীর মাঝারে॥
কদাচ শিবের কথা না হয় অন্যথা।
সব পিণ্ড কোলে তার এই সে মর্ম্মতা॥
অথ দশবায়ু শুনিলে যোগের মহাধন।
তত্ত্ববিবরণ অতঃপর কহি শুন তত্ত্ববিবরণ॥
প্রথমে আকাশ তত্ত্ব অসূক্ষ্মমব্যয়।
মারুতে জন্ম তাহে কহিল নিশ্চয়॥
বায়ু হৈতে বহ্নি হয় বহ্নি হৈতে নীর।
নীর হৈতে উপজিল পার্থিব শরীর॥
যোগীর বিধান পঞ্চতত্ত্বের বিধান।
উৎক্রমে উপজে অনুক্রমেতে সংহার॥
সংহারে যতেক দেব পঞ্চতত্ত্বময়।
পাছে পঞ্চবিংশতি গুণের সৃষ্টি হয়॥
অস্থি মাংস নখ চর্ম্ম লোমের সঞ্চার।
পৃথিবী পঞ্চগুণ জানিবে বিচার॥
শুক্র সর্পি মূত্র লালা শোণিত বিস্তার।
পঞ্চগুণ জলের এমত ব্যবহার॥

নিমিখ—পলক। যথা 'নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।' চণ্ডীদাস। মলে—মরিলে।

ক্লান্তি ক্লেশ নিদ্রা আর ক্ষুধাতৃষ্ণা যত।
পঞ্চগুণ বহ্নির জানিবে অবিরত॥
ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ প্রসারণ।
মারুতের পঞ্চগুণ করিল লক্ষণ॥
কাম ক্রোধ লোভে মোহ লজ্জা অতিশয়।
আকাশের পঞ্চগুণ ব্রহ্মবাদী কয়॥
ব্রহ্মজ্ঞানের তত্ত্ব শঙ্কর কহিল।
ভেবে দেব নিরাকার সাকার জন্মিল॥
এই কথা গোপন করিবে অতিশয়।
তত্ত্বগুণ কমলাকান্ত কয়॥

অথ কার্য্যারম্ভে শুভাশুভ জ্ঞানং।

যথাক্রমে কহিলাম তত্ত্বের আখ্যান।
শুনহ পরমতত্ত্ব কার্য্যের সন্ধান॥
দ্বিসপ্ত গেহ নাড়ী শরীরের মাঝে।
তার মধ্যে দশ নাড়ী প্রধান বিরাজে॥
তিন নাড়ী শুন তাহে প্রধান রচনা।
ইড়া আর পিঙ্গলা কহিব সুষুমনা॥
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন তিনে অধিপতি।
তিনে তিনগুণ তাহে পবনের গতি॥
কোন বায়ু গমনে করিব কোন কর্ম্ম।
বিস্তার করিয়া কহি শুন তার মর্ম্ম॥

অথ ইড়ালক্ষণং।

যাত্রাদান বিবাহাদি শুভ কর্ম্ম যত।
বিদ্যারম্ভ যাত্রাদি ভূষণে হই রত॥
শান্তিপুষ্টি ক্রিয়ারম্ভ বীজের বপন।
যজ্ঞ মঠ প্রতিষ্ঠাদি মন্ত্রসাধন॥

বান্ধবের দর্শন মৈত্রতা করি ইথে।
গৃহ প্রবেশন ধন সংগ্রহ করিতে॥
গৃহাদি আরম্ভ কিবা কূপাদি খনন।
গীত বাদ্য নৃত্য আদি ধনের স্থাপন॥
বাণিজ্য গমন দীক্ষা দাস পরিগ্রহ।
ইষ্টপূজা সর্ব্বকর্ম্ম সাধন করহ॥
ইড়া নামে বামনাড়ী চন্দ্রে বাতাস।
এই সব কর্ম্ম কর পূর্ণ হবে আশ॥

অথ পিঙ্গলা-লক্ষণং।

বজ্রজয় মন্ত্রের অভ্যাস দ্যুতকর্ম্ম।
শাস্ত্রের অভ্যাস কর জানি তার মর্ম্ম॥
গজ বাজী যন্ত্রাদি বাহনে কর ভর।
চৌর্য্যকর্ম্মে বিবাদে প্রশস্ত দিবাকর॥
শিল্পকর্ম্ম যন্ত্রাদি সাধনে এই বিধি।
গীতবাদ্য নৃত্য আর মৈথুন ঔষধি॥
ভূতাদি সাধন কর ক্রয় আর বিক্রয়।
উচাটন মারণ মোহন ইথে হয়॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গে রতি আলিঙ্গন।
শয়ন ভোজন স্নান গাত্র আভরণ॥
স্তম্ভনাদি করহ অঙ্গ না কর বশী।
নদী সন্তরণ ক্রূর মর্ম্ম অভিলাষী॥
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্যের বাতাস।
এই সব কর্ম্ম কর পূর্ণ হবে আশ॥
ক্ষণে ক্ষণে দক্ষিণে ক্ষণে বামে বামে বয়।
সুষুম্নাখ্য নাড়ী সেই জানিবে নিশ্চয়॥

সৌম্য কর্ম্ম ক্রূর কর্ম্ম উভয়ে নৈবাস।
ঈশ্বরের চিন্তা কর পূর্ণ হবে আশ॥
যোগশাস্ত্র অনেক প্রকার নিরখিয়ে।
বর্ণিলাম সার বস্তু সংক্ষেপ করিয়ে॥
যোগের অভ্যাস কিবা মন্ত্রের সাধন।
সকলের ঠাকুর জানিবে সেই ধন॥
অনায়াসে অজ্ঞান তিমিরে কর নাশ।
শিবের সমান জীব কাটে মায়াপাশ॥
সাধন করিতে সাধকের আছে মন।
প্রথমে অভ্যাস কর সাধকরঞ্জন॥
নরবাণী দৈববাণী ইথে নাহি ভেদ।
ধর্ম্মের স্বরূপ শব্দ জ্ঞান অবিচ্ছেদ॥
সাধ বা সাধ যদি পাঠ কর নিতি।
তথাপি হইবে ধ্বংস হংসের দুর্গতি॥
আত্মনিবেদন। অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমাঠ গোপালের স্থান॥
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ॥
নামেতে কমলাকান্ত ভবি ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধকরঞ্জন॥

ইতি শ্রীকমলাকান্ত বিরচিতং সাধকরঞ্জন যোগগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ॥

নামেতে শ্রী শিবরাম চন্নাতে নিবাস।
যোগশাস্ত্রে সাধন করিতে তার আশ॥
সাধকের প্রীতি হয় চক্ষের অঞ্জন।
অতএব লিখিলেক সাধকরঞ্জন॥

ওঁ পরদেবতায়ৈ নমঃ॥

পদাবলী

পদাবলী

পরজ—জলদ্ তেতালা।

দীনে তারিতে, দয়াময়ী নাম ধর, গো ও জননী। আস্থাই ॥

অতিশয় দুরাচার, অন্য গতি নাহি যার,

তারে নিজ গুণে করুণা বিতর ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

চৈতন্যরূপিণি, চিদানন্দস্বরূপিণি,

কালি, জননি কিঞ্চিত যদি নয়নে হের ॥ ২ ॥

কমলাকান্তের এই, নিবেদন কৃপাময়ি,

হে মা অনুগত তনয়ে, সত্বর গো ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥ ১

পরজ—জলদ্ তেতালা।

মা! চরণারবিন্দে হরমোহিনি,

রাখিও করুণয়া গিরিতনয়ে ॥ আস্থাই ॥

মায়াতে মোহিত আমি, পতিতপাবনী তুমি,

হর তম মম বিষয়ে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

সংসারার্ণব তারণ তরণী, চরণ চরম সময়ে।

কালকলুষ কলিকল্মিষনাশিনি,

করুণাঙ্কুরু অভয়ে ॥ ২ ॥ অভোগ ॥

ত্রিভুবনজননি, জন্মপ্রতিপালিনি,

সংহারিণি প্রলয়ে।

কমলাকান্ত কৃতাস্তবারিণি, নৃপতেজশ্চন্দ্র* সদয়ে ॥৩॥ অভোগ ॥ ২

পরজ—জলদ্ তেতালা।

মা! আমারে তারিতে হবে,

আমি অতি হীন দুরাচার।

না ভাবিয়া কারণ মজিলাম ভবে ॥ আস্থাই

পতিত দেখিয়া যদি না তার ভব জলধি,

পতিতপাবনী নামে কলঙ্ক রবে ॥১॥ অন্তরা ॥

কমলাকান্তের মন! বিষয় না ত্যজ কেন,

বৃথা জনম মম ধিক্ মানবে ॥ অন্তরা ॥ ৩

* এই একটী পদাবলীতে সাধক কমলাকান্ত মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুরের নামোল্লেখ করিলেন।

দ্রষ্টব্য—বর্দ্ধমানের বৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত লম্বোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন মহাশয়কে একখানা হাতেলেখা পুথী দেন। পুথীখানায় ১৪৭টী পদাবলী (১—১৪৫ এবং ২২১ ও ২২২ নম্বর পদাবলী) লিখিত আছে। ইহাতে অপ্রকাশিত নূতন পদাবলী পাই নাই। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া মনে হইল এই খাতাখানার গানগুলি সম্ভবতঃ রাজবাটীর সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত। ঐ কয়টী পদাবলীতে আস্থাই, অন্তরা ও অভোগ দেওয়া আছে। এই খাতাখানা প্রাচীন নয়,—অল্পদিন হইল লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার।

পরজ কালেঙ্গড়া—জলদ্ তেতালা।

কেনে মন ভুলিল, শ্যামারূপ হেরিয়ে,
আমিত কিছুই না জানি॥ আস্থাই॥
ধন পরিজন, সুখ বাসনা যত,
আমার ঘুচিল হেন অনুমানি॥ ১॥ অন্তরা॥
সহজে উলঙ্গ অঙ্গ, নাহি সম্বরে,
বামা সজল জলদ তনুখানি।
না জানি কি তন্ত্র মন্ত্র গুণ জানে বামা,
কি গুণে স্ববশ করে প্রাণী॥ ২॥ অভোগ॥
যদি মন চিন্ত্য, চারু চরণাম্বুজ,
সে ধন লইল শূলপাণি।
কমলাকান্ত কিঞ্চিত মন আশা,
কালী নামামৃত মধুরস বাণী॥৩॥ অভোগ॥ ৪

পরজ কালেঙ্গড়া—জলদ্ তেতালা।

কালরূপ হেরি নয়ন জুড়ায় রে,
আরে ও নবীন জলদ॥ আস্থাই॥
মরি মরি সুন্দরি, শ্রীবদন হেরি হেরি,
তিমিরারি তিমিরে মিশায় রে॥ ১॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের অন্তরে ওরূপ জাগে,
দিবানিশি পাসরিলে পাসরা না যায় রে॥ অন্তরা॥ ৫

পাসরা—বিস্মৃতি, ভুল।

পরজ—একতালা।

ইন্দীবর নিন্দি তনু সজল জলদ জিনি কায়া।
নীলাম্বুজ নীল মরকত হিমকর
দিনকর কিবা হরজায়া ॥ আস্থাই ॥
অঞ্জন দলিত স্থগিত জঘনা,
যেন অপরা কুসুম সম, নীলকায়া ॥ অন্তরা ॥ *
কমলাকান্ত আশ মন-মানসে,
শীতল চরণ যুগল ছায়া ॥ অন্তরা ॥ ৬

পরজ—জলদ্ তেতালা।

শ্যামা আজু ধীর,
কলেবরে নৃত্যায় মম হৃদয়ে মা গো ॥ আস্থাই ॥
নূতন জলধর, রূপ মনোহর,
দোলিত মন্দ সমীরে গো ॥১॥ অন্তরা ॥
বিগলিত কুন্তল, জ্বলে ভালে বিধু,
ভূষণ নর কর শির।
ত্রিপুরারি তনু তরণী অবলম্বনে,
সুধাময় সিন্ধু গভীরে গো ॥ ২ ॥ অভোগ ॥
তরুণ বয়সী তরুণ শিব সঙ্গে,
পুলকিত শ্যামা শরীর।
কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি,
বরিষয়ে আনন্দ নীর ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥ ৭

ইন্দীবর—নীলপদ্ম। * 'নীলকায়া'—বর্দ্ধমান রাজবাটী সংস্করণে আছে—"তনুবতা মায়া"।

পরজ—জলদ্ তেতালা।

কেন কি আপনার আছেরে,
শ্যামাধন মিলায়ে দেয় আমারে ॥
ত্যজিয়ে তনুর আশা, প্রাণ দিয়ে তুষিব তাঁরে॥ আস্থাই ॥
আমি ত ইন্দ্রিয় বশে, ভুলে আছি মায়া পাশে,
এমন সুহৃদ কেবা মনোদুঃখ কব কারে ॥১॥ অন্তরা ॥
মন রে! ইন্দ্রিয় রাজ, * এ নহে অন্যের কাজ,
কমলাকান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে ॥২॥ অন্তরা ॥৮

পরজ—একতালা।

তনুতরি ভাসিল আমার, ভব সাগরে ॥ আস্থাই ॥
মনরে সুজন নেয়ে, সাবধানে যাও বেয়ে,
যেন দেখ ডুবাইনা পাথারে ॥১॥ অন্তরা ॥
দশেন্দ্রিয় দাঁড়ি তায়, কুপথে তরণী বায়,
যতনে দমনে রাখ সবারে ॥২॥ অভোগ ॥
কালী নামে ধর হাল্, কুণ্ডলিনী কর প'ল,
বেয়ে দে ভাই, সুধাময় সমীরে ॥৩॥ অভোগ ॥
কামাদি জগাতি ছয়, মহামন্ত্রে কর জয়,
পথে যেন বিড়ম্বনা না করে ॥
কমলাকান্তেরে লয়ে, কালী নামের সারি গেয়ে,
সুখে চল সদানন্দ নগরে ॥৪॥ অভোগ ॥ ৯

* গীতায় আছে—'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।' ৩।৪২

জগাতি—শুল্ক আদায়কারী কর্ম্মচারী। সদানন্দ নগর—শিবপুরী।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা ।

তুমি কার ঘরের মেয়ে কালী গো ॥
আপনার রঙ্গরসে মগনা আপনি ॥ আস্থাই ॥
কে জানে কেমন তব, রূপ নিরূপন,
নিরক্ষিয়ে না বুঝি মা দিন কি যামিনী ॥ অন্তরা ॥
দলিত অঞ্জন জিনি, চিকণ বরণ খানি,
না পর অম্বর হেমমণি ।
আলিয়ে চিকুর পাশ, সদাই শ্মশানে বাস,
তথাপি যে মন ভুলে কি লাগি না জানি ॥২॥ অভোগ ॥
পুরুষ রতন এক, চরণাভিরত দেখ,
তাঁর শিরে জটাজূট ফণী ।
তুমি কে তোমার ওকে, হেরি অসম্ভব লোকে,
হেন অনুমানি যে ত্রিদশ চূড়ামণি ॥৩॥ অভোগ ॥
অশরণ শরণ, জগত মনোরঞ্জন,
অতি ধন চরণ দুখানি ।
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ,
তব রূপে আলো করে গগন ধরণী ॥৪॥ অভোগ ॥১০

পরজ—জলদ্ তেতালা ।

কত রঙ্গ জান গো শ্যামা ।
সুমতি কুমতি গতি, তুমি সে কারণ ॥ আস্থাই ॥
প্রকৃতি পুরুষাকারে, নিরঞ্জনী নিরাধারে,
যে জনা যেরূপে ভাবে, সে পাবে তেমন, গো ॥১॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের মনে, কে আছে তারিণী বিনে,
যা কর আপনার গুণে, লইলাম শরণ ॥২॥ অন্তরা ॥১১

খাম্বাজ—একতালা।

তোমার গুণ তুমি জান,
আর কে জানে গো॥
কিঞ্চিৎ জানে অনাদি,
সদাশিব শরণ লইল চরণে॥ আস্থাই।
বিধি চতুরানন, সহস্রবদন,
হরি তব গুণ যশ কথনে।
তথাপি নখর সীমা, মহিমা না পাইয়ে,
দীনস্তুত কোন গণনে॥১॥ অভোগ॥
ত্বং বিষ্ণু মায়া বিশ্ব বন্ধন কারণ,
বিষ্ণুময়ী বিশ্ব পালনে।
কমলাকান্ত আরাধিত তব পদ,
ভবজলনিধি তরণে॥২॥ অভোগ॥১২

বাহার (খাম্বাজ)—জলদ্ তেতালা।

ওগো তারা সুন্দরি,
তব যশ শুনি কত, ভরসা আমার মনে।
অশেষ পাতকী জনে, তুমি তার নিজ গুণে॥ আস্থাই॥
কদাচিত ভ্রম ভয়, যদি তব নাম লয়,
তবে তার কি করে শমনে।
দূরে তজি অঘচয়, সদা নিত্যানন্দময়,
সেই জীব শিব সম, শ্রম বিনে॥১॥ অন্তরা॥

এ বড় বিষম কাল, প্রবল সে রিপুজাল,
ইথে গতি হইবে কেমনে।
দেখি ভব বিড়ম্বন, কমলাকান্তের মন,
হৈয়া ভীত অনুগত শ্রীচরণে ॥২॥ অন্তরা ॥১৩

সুরট্ মল্লার—তিওট্।

শ্যামা নামের মহিমা অপার, কেনে মন!
মিছে ভ্রম বারে বার, রে মন! ॥ আস্থাই ॥
চঞ্চল রে মানসা মধু আশে, অভয় চরণ কর সার রে ॥অন্তরা॥
মন রে সুকৃতি বট, সদা শ্যামা নাম রট,
রে অনায়াসে নাশ ভব ভার ॥
কমলাকান্তের মন! মিছে ফেরে ফের কেন,
কালী বিনা কে আছে তোমার ॥ অভোগ ॥১৪

সুরট্ মল্লার—তিওট্।

সংসার জলনিধি অনিবার,
তরণী শ্যামাপদ কর সার, রে মন ॥ আস্থাই ॥
ত্বরিত ভবার্ণব পারাবারে, শ্রীগুরুদেব কর্ণধার, রে ॥১॥ অন্তরা ॥
ভুলেছ কি ভ্রান্তিবশে, দিন গেল মিছে আশে,
মন! না চিন্তিলে হিত আপনার।
নিয়ত চঞ্চল তুমি, যন্ত্রণা ভাজন আমি,
অনুচিত তোমার বিচার ॥২॥ অভোগ ॥

মন রে! মিনতি রাখ, কালী কালী বলি ডাক,
মন! অনায়াসে ভবে হবে পার ॥
কমলাকান্তের ইহকালে পরকালে,
কালী বিনা গতি নাহি আর, রে ॥৩॥ অভোগ ॥১৫

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা ॥

তুমি আর কেন কর বিষয় বাসনা রে ॥ আস্থাই ॥
মিছে কাজে গেলো দিন, দিনে দিনে তনু ক্ষীণ,
দূর কর মনের বাসনা রে ॥১॥ অন্তরা ॥
চারি পাশে মায়াজাল, কেশাগ্র ধরিয়ে কাল,
ইহা তুমি জানিয়ে জান না রে ॥
কমলাকান্তের কাছে, এখন উপায় আছে,
কালী ভাব পূরিবে কামনা রে ॥ অভোগ ॥১৬

সুরট্-মল্লার—জলদ্ তেতালা ॥

কেমনে তরিব বল, ও দুটি চরণ বিনে।
ভয়ে চিত কম্পিত, বারে হের ত্রিনয়নে ॥ আস্থাই ॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
ভরসা করেছি তব কৃপাময়ী নাম শুনে ॥১॥ অন্তরা ॥
অপার বিষম ভবে, তোমা বিনা কে তারিবে,
কমল চকোর লোভে, শ্রীচরণ সুধাপানে ॥২॥ অন্তরা ॥১৭

সুরট্—জলদ্ তেতালা।

মন! ভ্রম কেন মিছা, মায়াময় মধু আশে।
দেখনা করুণাময়ী, সুধাংশু বরিষে ॥ আস্থাই ॥
ত্যজিয়ে সঞ্চিত রত্ন, কাঁচ উপার্জ্জনে যত্ন,
একি ভ্রান্তি সুধা ভ্রম, কালান্তক বিষে ॥১॥ অন্তরা ॥
অতুল চরণারবিন্দ, তাহে কত মকরন্দ,
অন্ধসম না দেখ অলসে।
তুমি ত সুকৃতি বট, তবে কেন কর্ম্ম নট, *
কালী রট কমলাকান্তের উদ্দেশে ॥২॥ অভোগ ॥১৮

ঝিঝিট—একতা লা

নয়ন! কি দেখরে বাহিরে, তুমি আগে দেখ আপনারে
এখনি জুড়াবে তনু, রে প্রবিশ অন্তরে ॥ আস্থাই ॥
তড়িত জড়িত ঘন, বরিষে আনন্দ ধন,
সতত ষোড়শী শশী অমিয় বিতরে।
সে রসে বিরস কেন, কর রে আমারে ॥ ১॥ অন্তরা ॥
রবি শশী এক ঠাঁই, দিবস রজনী নাই,
বিনাশে নিবিড় তম, নিবিড় তিমিরে ॥
কমলাকান্তের আঁখি,
এমন দেখেছ কোথারে ॥ ২॥ অভোগ ॥ ১৯

* নট—নষ্ট, বিকৃত।

ঝিঝিট—ঢিমা তেতালা।

ও নব রূপসী ঘনশ্যামা, মরি রে সকল গুণধামা,
নয়ন ভুলেছে মন বেন্ধেছে বামা কেরে॥ আস্থাই॥
কে বলে উহারে কালো, ত্রিভুবন করেছে আলো,
আ মরি অকলঙ্ক ষোড়শী বামা॥ ১॥ অন্তরা॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুমানি, সুচঞ্চল সৌদামিনী,
ক্ষণে নীল কাদম্বিনী, মহেশ উরসি॥
কমলাকান্তের মন, নিগমন শ্যামা রূপে,
ভুবনমোহিনী মুক্তকেশী বামা॥ ২॥ অভোগ॥ ২০

ঝিঝিট—ঢিমা তেতালা।

শ্যামা আমার কালো কে বলে, আরে মন! কি বল।
ঘোর রূপে ঘোর তিমির নাশে,
কামরিপু অমনি ভুলিল, রে॥ আস্থাই॥
কালীরে অনন্ত রবি শশী তেজ,
আরে কোটি ইন্দু সমান শীতল।
কমলাকান্ত ওরূপ হেরিয়ে নাহি দেখে সমতুল, রে॥ অন্তরা॥ ২১

ঝিঝিট—ঢিমা তেতালা।

মন প্রাণধন সরবস।
আমার শ্যামা পরমা পরম শিবমোহিনী।
মম হৃদি সরোরুহে সতত নিবস, মা॥ আস্থাই॥
সুধাময় শ্যামাতনু, অজ্ঞান তিমির ভানু,
সে জন কেমন যার হৃদয়ে প্রকাশ।

ইন্দ্রাদি সম্পদ তাঁরে অতি উপহাস, গো ॥ ১॥ অন্তরা ॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র অজ, সেবি তব পদাম্বুজ,

যার যে বাঞ্ছিত লভে, মন অভিলাষ।

কমলাকান্তেরে তার, তবে জানি যশ, গো ॥২॥ অভোগ ॥ ২২

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

তারা! মম মানস-ভৃঙ্গ, ভ্রময়ে বিফল।

কদাচ না রয়গো! মন চরণ কমলে ॥ আস্থাই ॥

আমি কি করিব বল, গুণে বান্ধিলে,

হে মা গুণময়ি! সকল, কি ক্ষতি তোমার

গো তারা! তনয়ে হেরিলে ॥ ২॥ অভোগ ॥

কমলাকান্ত সুতে, অতি ত্বরিতে,

হে মা! কুরুকৃপা পতিতে,

কেমনে তরিব ভবে, তুমি না তারিলে ॥ ৩॥ অন্তরা ॥ ২৩

পরজ—জলদ্ তেতালা।

তারা বল কি হবে বিফলে দিন যায়, মা ॥ আস্থাই ॥

মন যে চঞ্চল অতি, নিষেধ না মানে,

তবে আমি কি করি উপায়, গো ॥ ১॥ অন্তরা ॥

বিষয়ে আবৃত মন, ভ্রময়ে অকারণ,

সদা সুত দারা ধন, আরাধিতে চায়।

কমলাকান্তের চিত, সদা উন্মত্ত,

শ্যামা! মা যদি রাখ রাঙ্গা পায়, গো ॥ ২॥ অভোগ ॥ ২৪

ঝিঝিট—জলদ্ তেতালা।

তোমা বিনা কে আছে আমার, গো শ্যামা!
মন দুঃখ কারে কব, কিসে প্রাণ জুড়াব, মা ॥ আস্থাই ॥
বিষয় প্রমোদে, ক্রিয়া অনুরোধে,
উভয় সঙ্কট অতি ভার ॥ ১॥ অন্তরা ॥
প্রমত্ত অনিত্য কাজে, অলস চরণাম্বুজে,
কাম ক্রোধ লোভ মোহে ভ্রমি অহঙ্কারে।
রিপু পরিবারে, দুরিত বিস্তারে,
তেঁই মন হলো দুরাচার ॥ ২॥ অভোগ ॥
কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে,
মা! মোরে ভবার্ণবে করিবে নিস্তার।
অকরণ করণ শঙ্করী সব কারণ,
তেঁই পদ করিয়াছি সার ॥ ৩॥ অভোগ ॥ ২৫

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

মা! আমি গো তোমারি অকৃতি তনয়,
আমার গুণাগুণ সম্বর হরসুন্দরি।
বঞ্চনা অধীন জনে উচিত না হয়, মা ॥ আস্থাই ॥
মূঢ় জ্ঞানি অচেতন, আরাধিতে মন নন,
মা! অভয়া চরণে মন, কদাচ না রয় ॥ ১॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের মনে, এই আশা নিশি দিনে,
মা হয়ে কি অকিঞ্চনে, না হবে সদয় ॥ অন্তরা ॥ ২৬

ঝিঝিট—একতালা।

এতদিনে জানিলাম দয়াময়ী কালী, গো।
কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি, মা॥ আস্থাই॥
এই মনে ছিল ভয়, আমি অতি দুরাশয়,
অধম দেখিয়ে জগতে রাখিলি, গো॥* ১॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের বাণী, হেন মনে অনুমানি,
বুঝি শ্রীনাথের কথা, সফল করিলি, মা॥ ২॥ অন্তরা॥ ২৭

কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

শ্যামা রূপে নয়ন ভুলেছে।
অতি নিরুপম রূপ চিকণ কাল তেঁই॥* আস্থাই॥
নিরুপমা রূপ চিকণ কাল হেরিয়ে।
তা নইলে ত্রিলোচন পরম যতনে কেন,
হৃদয় মাঝারে রেখেছে॥ † ১॥ অন্তরা॥
শশী ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী, এসেছে।
হারাইয়ে নিজ মণি, ব্যাকুল হইয়ে ফণী,
রূপ নিরখিয়ে রয়েছে॥ ২॥ অভোগ॥
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু,
বিরহিনী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।
ওরূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি,
কমলে প্রকাশ করেছে॥ ৩॥ অভোগ॥ ২৮

পাঠান্তর,—'অধম তারণ যশ, জগতে রাখিলি গো॥ ১॥ অন্তরা॥
পাঠান্তর—'তাই শিবের নয়ন ভুলেছে।'
পাঠান্তর—'শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে।'

কালাঙ্গড়া—জলদ্ তেতালা।

সদানন্দময়ী সুধানন্দে বিহরে, রে।
চিন্তামণি অন্তঃপুরে ভ্রান্তি দূর করে॥ আস্থাই॥
মূলাধারে সহস্রারে, হৃদয় পঙ্কজবরে,
আরে ইচ্ছাময়ী তিন ধাম,
তিন মূর্ত্তি ধরে, রে॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের মন! তুমি তাঁরে চিন্ত অনুক্ষণ, রে!
পঞ্চাশদ্বর্ণ সার হার করে পর রে॥ অন্তরা॥ ২৯

কালাঙ্গড়া—কাওয়ালি।

কালীজয় কালীজয় করাল বদনা জয়;
হে মন! বদনে বলনা॥ আস্থাই॥
আমি সদাই তোমার বশে, ভ্রমিতেছি মিছা আশে,
একবার আমার মিনতি রাখনা, রে॥১॥ অন্তরা॥
দারাসুত ধন পেয়ে, মিছে উন্মত্ত হয়ে,
আপনি আপনায় চেন না, রে।
বিনি মাহিনার চাকর হয়ে, ভূতের বোঝা মর বয়ে,
এখন চেতন হলো না॥২॥ অভোগ॥
সংসার পাপের শেষ, সুখের নাহিক লেশ,
তুমি তা জানিয়ে জান না।
কমলাকান্তের গতি, কঠিন হইল অতি,
কেন কর এত বঞ্চনা রে॥৩॥ অভোগ॥ ৩০

কালাঙ্গড়া—জলদ্ তেতালা।

বঞ্চনাতে তোর, আমরি, বাজি হৈল ভোর, রে মন।
কালীপদ সুধারসে, না হলি চকোর ॥ আস্থাই ॥
হইয়াছ দশের রাজা, দমনে না রাখ প্রজা,
একি অবিচার দেখি সাধুরে বান্ধে চোর ॥১॥ অন্তরা ॥
কত বা বুঝাব তোরে, আমার কেহ না করে,
ভাবিয়ে করেছি সার নামের ডঙ্কা জোর ॥
কমলাকান্তের মন, তুমি মিছা ফেরে ফের কেন,
ঘরে থাক মারে ডাক মিনতি রাখ মোর ॥২॥ অভোগ ৩১

জঙ্গলা ঝিঝিট—একতালা।

নিশি জাগিয়ে পোহাও জননীর গুণ গেয়ে!
কি সুখ চৈতন্য দেহে, অচৈতন্য হইয়ে, রে ॥ আস্থাই ॥
নিদ্রায় কি আছে ফল, মহানিদ্রা নিকট হৈল, *
মন! তখনি মনের সাধ, পূরাবে ঘুমায়ে রে ॥১॥ অন্তরা ॥
যদি না ঘুমালে নয়, যোগ নিদ্রা উচিত হয়,
শ্যামারূপ স্বপনে দেখ, নয়ন মুদিয়ে ॥২॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের চিত, মিছা সুখে অনুগত,
(মন) সকল সুখের সুধানিধি,
গিরিরাজের মেয়ে রে ॥ অন্তরা ॥ ৩২

* পাঠান্তর—নিশি............... গেয়ে। ইত্যাদি ॥
'নিদ্রাতে কি আছে ফল, মহানিদ্রা নিকট হল,
তখনো ঘুমায়ো তুমি, মনের সাধ মিটায়ে।
যদি না ঘুমালে নয়, যোগনিদ্রা উচিত হয়,
নয়ন মুদে দেখ রে সেই, জলদ-বরণ মেয়ে।'

দ্রষ্টব্য। 'এই গানের শেষ অংশটুকু জানিনা। বিষ্ণুপুরের এক গায়কের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি জীবিত নাই।' শ্রীশারদা প্রসাদ স্মৃতিতীর্থ। মেড়তলা। বর্দ্ধমান। ভাদ্র, ১৩২৮ সাল।

কালাঙ্গড়া—একতালা।

ওরে কিছু পথের সম্বল কর ভাই।
ঐহিকের যত সুখ হলো হলো নাই নাই ॥১॥ আস্থাই ॥
ক্রোশেক দুই ক্রোশ যেতে, গেঁঠে বেন্ধে লও খেতে,
এ বড় দুর্গম পথে, মাথা কুড়ুলে পেতে নাই ॥২॥ অন্তরা ॥
বাণিজ্য ব্যবসায় এসে, মূলে টানাটানি শেষে,
এখন উপায় বল, কল্পতরু মূলে যাই।
কমলাকান্তের মন, তথা আছে মহাধন,
সকল আশায় দিয়ে ছাই,
দৃঢ় করে ধর তাই ॥২॥ অন্তরা ॥ ৩৩

মূলতান—একতালা।

আমার অসময় কে আছে করুণাময়ি!
ও পদে বিপদ নাশে, নিতান্ত ভরস. ওই ॥ আস্থাই ॥
কখন কখন মনে করি, ধন পরিজন;
কোথা রব কোথা রবে, সে ভাব থাকয়ে কৈ ॥
মজিয়ে বিষয় বিষে, দিন গেল রিপু বশে,
আপনারি ক্রিয়া দোষে, অশেষ যন্ত্রণা সই ॥১॥ অন্তরা ॥
সুকৃতি যে জন, সে সাধনে পাবে শ্রীচরণ,
অকৃতি অধম প্রতি, কি গতি তারিণী বই।
কমলাকান্তের আশ, হইতে চায় মা! তব দাস,
কেন হবে মন বশ, আমি যে তাদৃশ নই ॥২॥ অভোগ ॥ ৩৪

ললিত যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

শ্যামা যদি হের নয়নে একবার, গো!
ইথে বল ক্ষতি কি তোমার॥ আস্থাই॥
জননী হইয়ে, এত যন্ত্রণা দেখিয়ে,
দয়া না করিলে এ কোন বিচার॥১॥ অন্তরা॥
আগম নিগমে শুনি, পতিত পাবনী তুমি,
আমি যে পতিত দুরাচার।
অধমতারণ যশ, যদি মনে অভিলাষ,
কমলাকান্তেরে কর পার, গো॥২॥ অভোগ॥ ৩৫

খাম্বাজ—একতালা।

উমে! ত্রাণ দে'মা শিবে ত্রাণ দে।
তৃষিত চাতকী, যেমত নিরখি,
নবঘন তব চরণ গো॥ আস্থাই॥
আমি দুরাচারী, শরণ তোমারি,
নিস্তার এ ঘোর ভবে॥১॥ অন্তরা॥
তুমি জননি, জনম হারিণী,
সৃষ্টি স্থিতি সংহারিণী;
হে কঙ্কালে, শশধর ভালে,
গিরিজা ভবানী ভবে॥
জয়া প্রচণ্ডা, শমন দলনী,
কমলাকান্ত কৃতান্ত ভয়ে॥
ত্রাহি মহেশি, বিগলিত কেশী,
তরি ভবরাণি তবে॥২॥ অভোগ॥ ৩৬

ললিত—একতালা।

এত চঞ্চল হইয়াছ তারা! কি কারণে বল, মা।
শ্মশানে মশানে ফের মা! সেখানে কি ফল, গো॥ আস্থাই
তারা মোর নয়নের তারা, ক্ষণে ক্ষণে হই হারা,
ক্ষেপা মেয়ে হৃদয় মন্দিরে বসি খেল, গো॥১॥ অন্তরা॥
না বুঝি কারণ, বাস না সম্বর কেন,
তোমার তিলেক অবসর নাই
মা! বান্ধিতে কুন্তল, গো॥২॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের এই, কথা রাখ কৃপাময়ি!
তোমার গুণে বান্ধা নির্গুণ
পালঙ্কে বসি দোল, গো!॥৩॥ অভোগ॥ ৩৭

ললিত যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

শ্যামা মা! নয়নে নিবস আমার, গো!।
লোকে জানে অঞ্জন রেখা,
নবঘন ওরূপ তোমার, গো!॥ আস্থাই॥
ত্যজ গো চঞ্চল বেশ, নিবস নয়ন দেশ,
অচঞ্চল হইয়ে একবার।
কমলাকান্তের আশা পূরয় শঙ্করি,
তবে জানি মহিমা তোমার, গো!॥ অন্তরা॥ ৩৮

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মারে বল কালো॥
যদি কালো বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো॥ আস্থাই॥
মা মোর কখন শ্বেত, কখন পীত,
কখন নীল লোহিত, রে!
আমি জানিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেলো॥১॥ অন্তরা॥
মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ,
কখন শূন্য মহাকাশ রে,
আরে কমলাকান্ত ও ভাব ভাবিয়ে,
সহজে * পাগল হলো॥২॥ অভোগ॥৩৯

ললিত যোগিয়া—তাল গৎকরণ।

করুণাময়ি! কাতরে কিঞ্চিত কৃপালেশং কুরু।
পরিহরি মম দুরিত অশেষং॥ আস্থাই॥
অনুগত প্রণত জনং প্রতিপালয়,
বারয় বিপদ বিশেষং॥১॥ অন্তরা॥
নাশয় মানস তিমির তমং, শিবে!
বিলসয় হৃদয় নিবাসং।
কমলাকান্ত ভ্রান্তি চ দূরয়,
পূরয় মন অভিলাষং॥২॥ অভোগ॥৪০

* পাঠান্তর 'মহেশ'।

বেহাগ—একতালা।

চরণ দুটি তোর, গো শ্যামা!
তারণ কারণ কলি ঘোর।
দশনখ চন্দ্র নিরখি পরম সুখী,
মানস মম * চকোর॥ আস্থাই॥
অশরণ শরণ, ভকত মনোরঞ্জন,
মদন দহন মনচোর।
কমলাকান্ত নিতান্ত তমস,
হৃদি কমল নির্ম্মল কর মোর, গো! ॥১॥ অন্তরা॥৪১

মূলতান—জলদ্ তেতালা।

কেহ না সম্ভাষে দাসে, প্রকৃতি বলিয়ে হাসে।
মা! এমন বন্ধন কেন কল্লি মায়া পাশে॥ আস্থাই॥
ধনলোভী পরিজন, সদা লই গঞ্জন,
তত্ত্ব চিন্তা পরানন্দ,
নাশে অনায়াসে।
সতত কুজন সঙ্গ, মম মতি হয় ভঙ্গ,
কমলাকান্তের প্রাণী কাঁপে সদা এই ত্রাসে॥১॥ অন্তরা॥৪২

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

কালি! আজু নীল কুঞ্জ,
তেজঃপুঞ্জ লতা শোণিত নূতন মুঞ্জরী।
কিঙ্কিনী কলরব, মধুকর গুঞ্জরে,
কোকিল বচন সুমাধুরী॥ আস্থাই॥

* 'মম' পাঠান্তর 'নয়ন'।

মুকুট শিখণ্ডী, শ্রবণ বিহঙ্গী,
নাভি সরোজহি পুণ্ডরী।
লোচন খঞ্জন, শ্রীবদন ভ্রমরী,
পিয়ে মকরন্দ কাদম্বরী ॥১॥ অন্তরা ॥
চরণ তমাল ব্যালদ্বয় নূপুর,
শিব রজতাচল তদুপরি।
কমলাকান্ত দেখরে পরমাদ্ভুত,
শঙ্কর উর'পরে শঙ্করী ॥২॥ অভোগ ॥৪৩

খট—একতালা।

তারা-চরণ কর সার, রে মানস। !
বিষয় বিরলে ত্যজ, কেন মজ মিছা ভ্রমে ॥ আস্থাই ॥
এসেছ অসার ভবে, কেন মর মিছা লোভে,
ভেবে দেখ তুমি কার, কে আছে তোমার ॥১॥ অন্তরা ॥
এ ধন যৌবন পরিজন কি তোর সঙ্গে যাবে,
এমন রতন কায়া কোথা রব কোথা রবে।
কমলাকান্তেরে যদি এ সঙ্কটে নিস্তারিবে।
এখন যতনে রাখ বচন আমার, রে ! ॥অভোগ॥৪৪

মুলতান বাহার—জলদ্ তেতালা।

সারদা বিরাজে
শ্বেত সরোজে,
দেখরে নয়ন !
কি আনন্দ করুণাময়ী
ভুবন মাঝে ॥ আস্থাই ॥

বীণাযন্ত্র সুতন্ত্র মঙ্গলধ্বনি,
মধুর মধুর গরজে ॥১॥ অন্তরা ॥
গায়তি হরিগুণা,
নৃত্যতি প্রমগণা,
মণিময় নূপুর বাজে।
কমলাকান্ত মগন মন-ভ্রমরা,
শ্রীচরণ সরোজ রজে ॥২॥ অভোগ ॥৪৫

বসন্ত—জৎ।

সুতন্ত্রী বীণা বাজয়ি রে,
বিহরয়ি মনোহর বেশে।
সুখময় সরোজে ত্রিভঙ্গ তরঙ্গিণী,
নৃত্যয়ি তরুণ বয়সে ॥ আস্থাই ॥
বেণী শ্রেণী ভুজগাবলী নিন্দিত,
লম্বিত উরুযুগ অংশে।
লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জিত,
সিন্দূর তিমির বিধ্বংসে ॥১॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্ত দেখয়ে গগন বিধু,
জলজ কমল বিনাশে।
একি পরমাদ্ভুত পদনখ চন্দ্রে,
হৃদয় কমল পরকাশে ॥২॥ অভোগ ॥৪৬

বসন্ত—ধামার।

কালী কালী কালী তারা বাণী,
আরে রটরে রসনা !
এ দিন যামিনী ॥ আস্থাই ॥
ত্রিভুবন জননী, স্থিতিলয়কারিণী,
নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মপদদায়িনী ॥১॥ অন্তরা ॥
ষোড়শী ভুবনা, ভৈরবী ছিন্না
ধূমাবতী মাতঙ্গিনী।
বগলা কমলা, ইতি দশবালা,
দীনদাস কমলাকান্তমোচনী ॥২॥ অভোগ ॥৪৭

বাহার বসন্ত—জলদ্ তেতালা।

দুটি চরণ সরোজ সরোজোপরে,
আসব উনমত, * অলি গুঞ্জরে ॥ আস্থাই ॥
একি অপরূপ প্রফুল্ল পঙ্কজোপরে,
ও পদ নখর ছলে, শশী বিহরে ॥১॥ অন্তরা ॥
কি শোভা যাবক, † কি শীতল পাবক,
কিবা তরুণ অরুণ আসি উদয় করে।
কমলাকান্ত অনুপ রূপ ভূপ,
নিরখি পুলকে তনু, নয়ন ঝুরে ॥২॥ অভোগ ॥৪৮

* পাঠান্তর "আসব আসয়ে কত।" † যাবক—অলক্তক; আলতা। যথা,
'অঙ্গুলির মাঝে যাবক সাজে মিহির শোভিত জানু।' চণ্ডীদাস ॥

বাগেশ্রী কানেড়া—আড়া।

আগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী করালবদনী,
শবে শিবে হবে ভবে ভবনিস্তারিণী,
তারা কে জানে তোমার কর্ম্ম,
তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম।
ইচ্ছাসুখে কর কর্ম্ম, ইচ্ছারূপিণী।
কমলাকান্তের এই, শুন দীনদয়াময়ী,
চরম কালেতে দিও চরণ দু'খানি॥ ৪৯

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

ওমা পরমেশ্বরী।
কখন পুরুষ হও মা
কখন ষোড়শী নারী॥
অনাদ্যা শক্তিরূপিণী,
ভক্তি-মুক্তি প্রদায়িনী, তারিণী।
কৃতান্ত উপাধি দিয়ে, কোন মতে তারিয়ে,
নিস্তার ভবসাগরে, দিয়ে শ্রীচরণ তরী॥* ৫০

কানেড়া বাগেশ্বরী—একতালা।

দয়াময়ি করুণাময়ি দীনে তার, গো কালি!
এ তনু জীর্ণাতরি স্ববশ নয়,
ভব তরঙ্গ অনিবার, গো॥ আস্থাই॥

* এই পদাবলীর ভনিতা পাওয়া যায় নাই। ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সঙ্গীত-মুক্তাবলীর ৫৭৭ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

সাজাইয়াছি পাপের ভরা, গমনে হইয়াছি ত্বরা,
বিদিত চরণে, যত বাণিজ্য আমার।
কমলাকান্তের গতি ঐ তারা নাম,
ভরসা ভবার্ণবে ভব কর্ণধার, গো॥ ১॥ অন্তরা॥ ৫১

অহং খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

অভয়ে দেহি শরণং করুণাময়ি কাতরে,
অনুগত জন প্রতিপালিনি, গো। আস্থাই॥
ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে,
ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনি! গো॥ ১॥ অন্তরা॥
ত্রিভুবন সৃজনপালনলয়কারিণি,
শ্রুতি স্মৃতি গতিদায়িনি, গো মা।
কমলাকান্ত প্রমোদপ্রদায়িনি,
চন্দ্রচূড় হৃদিচারিণি, গো॥ ২॥ অভোগ॥ ৫২

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

শঙ্করি শিবে শ্যামে ভীমে উমে ভবানি।
বরদে সারদে আশুতোষ হররাণি॥ আস্থাই॥
দুঃখ হর ভয় হর, রিপু হর স্মর হর,
মনোমোহিনি।
চরাচর নাগ নর সুর পালিনি,
ভবে অম্বিকে, অনুগত সুত বিহিতকারিণি॥ ১॥ অন্তরা॥
মৃত্যুঞ্জয় হৃদয় চারিণি, শরণাগত কলুষনাশিনি,
কমলাকান্ত হৃদি বিহারিণি॥ ২॥ অভোগ॥ ৫৩

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

মানব দেহ পেয়েছিলাম ভবে,
তোমার এ তনু তোমারে সঁপিলাম।
যা কর জননি আমি অবসর হইলাম॥ আস্থাই॥
অনিত্য সংসার সুখ, তাহে হইলাম বৈমুখ,
মান অপমান দুখ, দূরে তেয়াগিলাম॥ ১॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ভাবিয়ে চরণাম্বুজে শরণ লইলাম॥ ২। অভোগ॥ ৫৪

মুলতান—জলদ তেতালা।

মা! তব চরণাম্বুজ হেরিয়ে জীবন আছে।
নতুবা যাতনা যত, ইথে কি মানব বাঁচে॥ আস্থাই॥
জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন, বিরত থাকিতে প্রাণ,
অকৃতি বলিয়ে তারা, করতালি দিয়া নাচে॥ ১॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের আর, কে আছে ভুবন মাঝে,
আপনার বলিয়ে আমি,
যাব গো মা! কার কাছে॥ ২॥ অন্তরা॥ ৫৫

খাম্বাজ—একতালা।

তারিণী আমার কেমন,
কে জানে তাঁরে, যেমন তারা তেমনি ভাল।
দুটী অভয় চরণ, ভাব ওরে মন!
অনুমানে তার কি কাজ বল॥ আস্থাই॥

প্রকৃতি পুরুষ অথবা শূন্য,
সেই সে সকলি সকলে ভিন্ন,
ধন্য ধন্য কে জানে অন্য,
ভব যাঁরে ভেবে পাগল হলো ॥ ১॥ অন্তরা ॥
নীল পীত শ্বেত লোহিত বর্ণ,
কিরূপ কি গুণ কে জানে মর্ম্ম ;
সে সহজে প্রবীণা, অতি সুনবীনা,
স্বভাব নির্ম্মল কথায় কালো ॥ ২॥ অন্তরা ॥
যেরূপে যে জনা করয়ে ভাবনা,
সেইরূপে তার পূরয়ে কামনা ;
দ্বৈতভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ,
অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল ॥ ৩॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্ত কি ভাবনা আর,
পেয়েছ যে ধন হেলে হবে পার,
ওপদে বঞ্চিত যে জনা তার,
একুল ওকুল দুকুল গেল ॥ ৪॥ অন্তরা ॥ ৫৬

হোসেনি টোড়ি—একতালা ।

শ্যামা বিনা আর জুড়াইব কিসে,
মনরে ! তাপিত প্রাণ ।
কলুষ ভুজঙ্গে, গ্রাসিত অঙ্গ,
জারিল দারুণ বিষে, রে ॥ আস্থাই ॥

বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ, নিবসন রে ও মন!
পাইয়াছ শ্রীনাথ আদেশে।
তবে কেন মন! ত্যজ এমন ধন,
কেবল কপট অলসে ।। ১।। অন্তরা ।।
কখন্ কি হয়, এতনু আপনার নয়।
প্রলয় আঁখির নিমেষে।
কমলাকান্তের, বুঝিলাম এতদিনে,
ঘুচিল মনের দিশে ।।২।। অভোগ ।। ৫৭

খট্—জলদ্ তেতালা।

যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে ।। আস্থাই ।।
জনম করম দুঃখ, সুখ করি মানি,
জলদ বরণী যদি নিরখি অন্তরে, শ্যামা ।। ১।। অন্তরা ।।
বিভূতি ভূষণ কি রতন মণি কাঞ্চন,
তরুতলে বাস কি রাজ সিংহাসন;
কমলাকান্ত উভয় সম সাধন, জননি!
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে, গো মা ।। ২।। অন্তরা ।। ৫৮

অহং মুলতান—একতালা।

কালীর ইচ্ছা যেমন, রে মন! বৃথা কর বাসনা।
মন! তুমি কি করিবে, কোথা কি পাবে,
কালী না পূরালে কামনা ।। আস্থাই ।।

জন্মান্তর ক্রিয়া অনুচর, জীবের যে কিছু যন্ত্রণা।
তুমি এই কর মন! ভাব শ্রীচরণ,
মহতের এই মন্ত্রণা ॥১॥ অন্তরা ॥
তুমি যে ভেবেছ দেহ অভিমান,
এ সকলি তাঁরই বঞ্চনা।
সেই সে কর্ত্রী ধাত্রী হর্ত্রী,
আর যত সে বিড়ম্বনা ॥২॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্ত মান অপমান, দূরে ত্যজ গুরু গঞ্জনা।
তুমি ভাব ভব গৃহিণী ভবানী,
না রবে ভবের ভাবনা ॥৩॥ অন্তরা ॥ ৫৯

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।
কালী বলে ডাক রে মন!
আর ভার তোমায় দিব না।
তুমি এই কর মন! কথা রাখো,
ঘরের বাহির হইও নাকো ॥ আস্থাই ॥
ঘরে আছে ছজন কুজন,
তাদের সঙ্গী হইও না মন!
কেবল রসনা রঙ্গিয়া বটে,
যত্নে তায় স্ববশে রাখো ॥১॥ অন্তরা ॥
ভবের যাতনা যত, তনু আছে তায় অনুগত,
দুঃখ জানে এদেহ জানে, তুমিতো আনন্দে থাকো ॥২॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের হৃদি, কমলে অমূল্য নিধি,
আমি আপন বলে তোমায় দিলাম,
জ্ঞান-চক্ষু খুলে ত্যাখো ॥৩॥ অন্তরা ॥ ৬০

কাফি—ঢিমাতেতালা।

শিখেছো যতনে যত চাতুরী,
মন! হয়েছ আপনি, রিপু আপনার॥ আস্থাই॥
ধরেছ ভকত বেশ, না দেখি ভকতি লেশ,
কদাচ কপট রীত, গেল না তোমার॥১॥ অন্তরা॥
ওরে মন দুরাচার! তুমি হ'লে কর্ণধার,
ডুবাইতে তরণী আমার।
কমলাকান্তের প্রতি, কঠিন হয়েছ অতি,
না মজিলে সুধাময় চরণে শ্যামার, রে॥ অভোগ॥ ৬১॥

লুম্ ঝিঝিট্—একতালা।

দীন গো জননি! অতি দীন, ওমা!
আমি অতি ভজন বিহীন॥ আস্থাই॥
অসিত সময় শশী, দিনে দিনে যাদৃশী,
তাদৃশী হতেছি মলিন॥১॥ অন্তরা॥
পুরাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল ভাজন,
ক্ষণে ক্ষণে পরমায়ু ক্ষীণ।
কমলাকান্ত ভরসা ভবমোচিনী, মা!
নাম শুনে হয়েছি অধীন॥২॥ অন্তরা॥ ৬২

অহং মুলতান—কাওয়ালী।

করুণাময়ি! দীন অকিঞ্চনে, বারেক হের মা॥
সদা মগনা সুধানন্দে কালী,
তনয় ত্রাসিত ভব বন্ধনে॥ আস্থাই॥

আমি যে শুনেছি তুমি পতিত পাবনী, মা!
দয়াময়ী দীন তারণে।
কমলাকান্ত ক্রিয়াহীন পতিতে,
ত্রাহি কৃপা অবলম্বনে ॥১॥ অন্তরা ॥ ৬৩

সিন্ধু কাফি—একতালা।

মনের বাসনা কতদূর, কে জানে।
মন পেয়েছে মনের মত অভয় চরণ হেরিয়ে গো ॥ আস্থাই ॥
ঐহিকের যত সুখ, তৃণ করি মানে ॥১॥
ব্রতাদি নিয়ম যত, তাহে নহে অনুগত,
কদাচ না হলো রত তীর্থ গমনে।
কমলাকান্তের মন, এত উন্মত্ত কেন,
চরণ কমল মধুপানে ॥২॥ অন্তরা ॥ ৬৪

সিন্ধু কাফি—ঢিমাতেতালা।

ভ্রময়ে মন, তারা। তোমারই বশে।
এই দেহ যন্ত্র তুমি যন্ত্রী,
তব গুণে বাঁধা গুণময়ি, হে মা!
আমি দোষী হই কি দোষে ॥ আস্থাই ॥
দুর্গম নহে অতি সুখাশ্রয় দুর্গানাম,
তাহে কেন তনু অলসে, মা!
দুর্জ্জয় বিষয় কঠিন, কমলাকান্তের মূঢ় মানসা,
সদা লোভী সেই বিষে ॥১॥ অন্তরা ॥ ৬৫

সিন্ধু কাফি—ঢিমাতেতালা।

তারা! বল, কি অপরাধে, অঘ অনুরোধে,
বঞ্চনা করিলে আমায়॥ আস্থাই॥
এ ছার মানব জাতি, সতত চঞ্চলমতি,
তায় ক্রোধ কেমনে জুয়ায়॥১॥ অন্তরা॥
শ্রুতি স্মৃতি পরিহরি, যা মানস তাই করি,
ভরসা দিয়াছি তব দায়।
কমলাকান্তের আর কে আছে ভুবন মাঝে, মা!
এ তনু সঁপেছি রাঙ্গাপায়॥১॥ অভোগ॥ ৬৬

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

সদানন্দময়ি কালি!
মহাকালের মনমোহিনী, গো মা!
তুমি আপন্ সুখে আপ্নি নাচ,
আপ্নি দেও মা করতালি॥ আস্থাই॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা!
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥১॥ অন্তরা॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমনি রাখ, তেমনি থাকি,
যেমন বলাও, তেমনি বলি॥২॥ অন্তরা॥

অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশি, ধ'রে অসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম * দুটই খেলি ॥৩॥ অন্তরা ॥ ৬৭

কালাংড়া—ঢিমাতেতালা।

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি ত্যাখ আমি দেখি,
আর যেন ভাই কেউ না দেখে ॥ আস্থাই ॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সেও যেন মা বলে ডাকে ॥১॥ অন্তরা ॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে ॥ ২॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের মন, ভাই।
আমার এক নিবেদন, দরিদ্র পাইলে ধন,
সেও কি অযত্নে রাখে ॥৩॥ অন্তরা ॥ ৬৮

কাফি—ঢিমাতেতালা।

মোরে বঞ্চনা কেন কর তারিণী, গো মা!
ত্বমসি ভবার্ণব তারণ তরণি,
সুমতি কুমতি গতি দায়িনী ॥ আস্থাই ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত জ্ঞান নাহি মম,
মিছা কাজে গেল দিন যামিনী।
কমলাকান্ত নিতান্ত শরণাগত, বারেক হের,
আশুতোষ গেহিনি ॥১॥ অন্তরা ॥ ৬৯

* ঠাকুর বলিতেন "ধর্ম্মাধর্ম্ম কি জান? এখানে "ধর্ম্ম" মানে বৈধী ধর্ম্ম। যেমন দান কর্ত্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালী-ভোজন, এই সব। এই ধর্ম্মকেই বলে কর্ম্মকাণ্ড। এ পথ বড় কঠিন। কথামৃত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এই গানটী গাইতেন।

পাঠান্তর—'ব্রজেতে বালিকা হয়ে, যশোদাকে মা বলিলি। আবার কৃষ্ণ হয়ে মাটী খেয়ে মুলে ত্রিভুবন দেখালি ॥'

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

কালি! তুমি কামরূপা, কেমনে রহে ধ্যান।
আমি কোন কীট মানুষ, মানসে কত জ্ঞান॥ আস্থাই॥
বেদশাস্ত্র পুরাণাদি, কি করিছে সাংখ্যবাদী,
যার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের অসাধ্য অনুমান॥ ১॥ অন্তরা॥
যদি নির্ব্বাণ উত্তম বটে,
তবে অণিমাদি কিসে খাটে,
ইথে বিদ্যা কি অবিদ্যা বটে, কে জানে সন্ধান।
কমলাকান্তের চিত্ত, অনুভবে এক সত্য,
যার যে শ্রীনাথ দত্ত,
সে তত্ত্ব প্রধান, মা॥ ২॥ অভোগ॥ ৭০

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

যন্ত্রণা কত সব, আর গো বল মোরে, মা!
ভবে প্রজ্বলিত, পতঙ্গের মত,
বারে বারে পড়ি বিষয় ঘোরে॥ আস্থাই॥
গমনাগমন করি অকারণ,
অভয় চরণ না ভাবি কখন;
অমৃত ত্যজিয়ে, গরল ভুঞ্জিয়ে,
মৃতপ্রায় ভাসি ভবের নীরে॥ ১॥ অন্তরা॥
মহামায়া যুক্ত মানব দেহ,
মৃতকায়া হেরি করয়ে স্নেহ।
অসার আপনি, না ভাবয়ে প্রাণী,
বিপদে ভাবনা করে অন্তরে॥ ২॥ অন্তরা॥

নিতান্ত পতিত কমলাকান্ত,
নিবেদন করে চরণোপান্ত।
আমার মন অশান্ত বিষয় ভ্রান্ত,
হেরি কৃতান্ত ভয় না করে॥ ৩॥ অন্তরা॥ ৭১

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তেঁই শ্যামারূপ ভালবাসি,
কালি! জগমনোমোহিনী এলোকেশী।
তোমায় সবাই বলে কালো কালী,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥ আস্থাই॥
বিষম বিষয়ানলে মা! দহে তনু দিবানিশি।
যখন শ্যামার রূপ অন্তরে জাগে,
আনন্দ সাগরে ভাসি॥ ১॥ অন্তরা॥
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে, মায়ের করের অসি।
মায়ের বদন শশী, মধুর হাসি,
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি॥ ২॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের মন, নহে অন্য অভিলাষি।
আমার শ্যামা মায়ের যুগল পদে,
গয়া গঙ্গা বারাণসী *॥ ৩॥ অন্তরা॥ ৭২

---

* পাঠান্তর—'কমল বলে কাশী যেতে কভু নাহি ভালবাসি।
শ্যামা মায়ের পদযুগে গয়া গঙ্গা বারাণসী।'



রামপ্রসাদী স্থর—একতালা।

আর কিছুই নাই শ্যামা, মা তোর।
কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
দেখে হ'লাম সাহস ভাঙ্গা॥ আস্থাই॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,—
বিপদকালে কেউ কোথায় নাই,
ঘরবাড়ী ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা॥ ১॥ অন্তরা॥
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দ্যাখো,
নইলে জপ্ করি যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা॥ ২॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা, ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥ ৩॥ অন্তরা॥ † ৭৩

রামপ্রসাদী স্থর—একতালা।

তোমার ভাল চিন্তা সদা,
করিগো! তোমার নিকটে।
দুঃখে যাক্ সুখে যাক্ জেনেছি,
যে আছে লিখন্ ললাটে॥ আস্থাই॥
বারে বারে ভ্রমণ করি মা!
আমার এই কর্ম্ম বটে॥
কিন্তু দীন্ দেখে যদি দয়া কর,
তবে দীন্ দয়াময়ী নামটী রটে॥ ১॥ অন্তরা॥

† পাঠান্তর—কিছুই—'কিছু'। মা তোর—'তোমার'। দেখে—'অতেব'। বিপদকালে—'কিন্তু বিপদকালে'। টাঙ্গা—'ঠাঙ্গা'।

আমার বাপের শীল হৈলে মা!
তোমার বাপের নিন্দা ছোটে।
তোমার বাপের স্বভাব হৈলে মা!
উভয় কুলে প্রমাদ ঘটে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্ত হাটের হেটো,
হাট সইছে বেড়াই হাটে।
তুমি যদি করবে না পার তবে কেন,
নৌকাখানি লইয়ে ঘাটে ॥ অন্তরা ॥ ৭৪

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

জানিগো! দারুণ শমনে, যাবনা মা! তার ভবনে।
তারে দিয়াছ বিষয় পেয়েছে এখন,
তোমার দোহাই মানে না মানে ॥ আস্থাই ॥
হে মা! আমি জানি নিজ কর্ম্মাকর্ম্ম,
বিশেষে কর্ম্মফল সে জানে।
তোমার যা হয় উচিত, কর মা বিহিত,
আপন সম্মুখে আপন গুণে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
লঘু দোষে করে অধিক দণ্ড,
অন্যথা কে করে ত্রিভুবনে।
সে তোমার বল পেয়েছে এখন,
দীনের কথা শুনিবে কেনে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
হুজুরে বিচার হলে একবার,
নাহি মানি তার পদাতিগণে।
যেন, কমলাকান্ত বলে কৃতান্ত
স্বপনে কখন না করে মনে ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৭৫

খাম্বাজ—ঠুংরি।

আচার বিচার নিত্য নয়।
সে সাধকের দাঢ্য ভাব, সে সত্যময়॥ আস্থাই॥
দেখ এক বস্তু নানামত, সে পঞ্চ তত্ত্বে অনুগত,
যাহাতে উপজে পুনঃ, তাহাতেই প্রলয়॥ ১॥ অন্তরা॥
ধ্যান স্থির যে জনার, সেই ব্যক্তি সদাচার,
সে ব্রহ্মরূপ ভাবিয়ে, আনে ব্রহ্মময়।
কমলাকান্তের চিত, তটেতে তরণী পাত,
নানা দেশ ভ্রমণ, কেবল দুঃখ চয়॥ ২॥ অভোগ॥ ৭৬

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন! চল শ্যামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সেখানে সকলই ঘটে॥ আস্থাই॥
অল্প পুণ্য ভরা, সাজিয়ে পশরা,
এনেছ ভবের হাটে।
যা কর উপায়, পাঁচে মিলি খায়,
কলঙ্ক তোমারই রটে॥ ১॥ অন্তরা॥

'মন! ... নিকটে' পাঠান্তর 'এখন, চল ... নিকটে'।
'যা ... উপায়' ঐ 'তুমি, যা ... উপায়।'
'জমি ... লাটে' ঐ 'রাজ্য ... লাটে।'

কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে,
রাজত্ব করবে পাটে।
আছে একজনা, লইতে খাজনা,
জমি যে বিকাবে লাটে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্ত কি ভাবনা ভাব, দাঁড়ায়ে নদীর তটে।
দেখ দুকূল পাথার, না জান সাঁতার,
তরণী নাই যে ঘাটে ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৭৭

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তুমি মিছে ভ্রমণ করো নারে, মন-তুরঙ্গ ! পথে চল।
তুমি সুকৃতি সুমন্ত্রী বট, কুমন্ত্রণায় কেন ভোল ॥ আস্থাই।
তুমি যে শুনেছ ভাই, ভোগ মোক্ষ এক ঠাঁই,
যার গাছ হলো না ফল পাবে কি,
সে সব আশা শিকায় তোল ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
দেখিয়ে না দেখ দিঠে, * বিপক্ষ চড়েছে পিঠে ;
তোমার রথী সে সারথি হারা,
কি সঙ্কট ঘটাবে বল ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের মন, তুমি পরের বশে মর কেন,
কালীনাম ব্রহ্ম তীক্ষ্ণ অস্ত্রে,
মায়ার লাগাম কেটে ফেল ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৭৮

* দিঠে—দৃষ্টিতে।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন ! ভ্রমে ভুলেছো কেনে,
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।
শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাঢ্য কর সেই চরণে ॥ আস্থাই ॥
যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে।
তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গ্যালো,
চিদানন্দ রয় কেমনে॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
তন্ন তন্ন করি মোলে, কি পেলে ছয় দরশনে।
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্যা আরাধনে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি অন্ত মধ্য নাই,
সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৭৯

নট বেলোয়াল—ঢিমা তেতালা।

আমার মন ! ভুল না,
মন ভুল না লোকেরই কথায়।
ওরে ! অনিত্য সংসার,
নিত্যভাব শ্যামা মায় ॥ আস্থাই ॥
কে বলে মা নিদ্রা গেছে,
নিদ্রার কি নিদ্রা আছে ;
যে নিজে অচৈতন্য,
অচৈতন্য ভাবে তাঁয় ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

যুগাচারী যে জন হয়,
তার কাছে কি কলির ভয় ;
সত্য আদি চারি যুগ, বান্ধা রাঙ্গা পায় ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের মন ! ত্যজ অন্য আলাপন ;
তুমি আপন সুখে আপনি মজ,
কারে কে সুধায় ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৮০

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

পরের কথায় আর কি ভুলি।
কত ভ্রমিয়া দেশ, পেয়েছি শেষ,
যা কর দক্ষিণা কালী ॥ আস্থাই ॥
যত ইতি নাম, আদি শিব রাম,
সকলের কর্ত্তা মুণ্ডমালী।
মায়ের চরণ কমল, অতি নিরমল,
মন ! গিয়ে তায় হওনা অলি ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
কালীনাম সুধাপান কর রে মন।
নাচ গাও দিয়া করতালি।
নীল শশধর করেছে আলো,
মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
ত্যজিয়ে বসন, বিভূতি ভূষণ,
মাথায় লও কালীনামের ডালি।
কমল বলে দেখ্ দেখি মন,
কত সুখে সুখী হলি ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৮১

সিন্ধুকাফি—ঢিমা তেতালা।

আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন! কারু ঘরে।
যা চাবে এই খানে পাবে. খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥ আস্থাই॥
পরম ধন পরশ মণি, যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥১॥ অন্তরা
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো নারে।
তুমি আনন্দে ত্রিবেণীর স্নানে, *
শীতল হও না মূলাধারে॥ ২॥ অন্তরা॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে।
ওরে! বাজিকরে চিন্‌লে না সে,
তোমার ঘটে বিরাজ করে॥ ৩॥ অন্তরা॥ ৮২

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে,
শ্যামা মারে পাবে।
এ ছেলের হাতের লাড়ু নয়,
যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥ আস্থাই॥
সাতগেঁয়ে আর মামুদা বাজী, †
কেবা কারে ফাঁকি দেবে।
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া,
আপনার গণ্ডা বুঝে লবে॥ ১॥ অন্তরা॥

* পাঠান্তর—'ঘাটে'।

† হিন্দু প্রধান সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম) চতুর ও ক্ষমতাবান্ লোকবহুল গণ্ডগ্রাম বলিয়া

আইন স্বুরৎ গঙ্গাজলি,
করেছ সাবধান হবে।
তুমি মধ্যে মধ্যে মুখ পুছে খাও, *
একথা কি জান্‌তে হবে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের মন! এখন কি উপায় করিবে।
কালীনাম লও সত্বর হও,
নামের গুণে ত'রে যাবে ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৮৩

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

(মন) তুমি কি ভাবনা ভাব, ওরে আমার অবোধ মন।
সময় পেয়েছ ভাল, সাধনারে শ্যামা ধন ॥ আস্থাই ॥
সৃজন পালন লয়, যে তিন হইতে হয়;
তারা তোর ভাবনা ভাবে, বিধি হরি ত্রিলোচন ॥ ১॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের মন, অনিত্য এই ত্রিভুবন;
নিত্য কেবল নিত্যানন্দময়ীর দুটী শ্রীচরণ ॥২॥ অন্তরা ॥ ৮৪

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম্ তুলে ॥ আস্থাই ॥

প্রসিদ্ধ ছিল। উভয় গ্রামের লোকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সপ্তগ্রামের নিকট মামুদাবাদের সকল চাতুর্য্য ব্যর্থ হইত। ইহা হইতেই প্রবাদের সৃষ্টি।

স্বুরৎ—ঘটনাস্থলে এজাহার গ্রহণ।

গঙ্গাজলি—গঙ্গাজল স্পর্শদ্বারা শপথ।

* পাঠান্তর—"মষ্টে মষ্টে'।

মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ;
সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥ ১॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গর তোল দুর্গা কোয়ে ;
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গ্যাবি সবাই মিলে ॥২॥ অন্তরা ॥৮৫



পুরবি—একতালা ।

মন্ গরিবের কি দোষ আছে ।
তারে কেন নিন্দা কর মিছে ॥
বাজিকরের মেয়ে তারে,
যেমন নাচায় তেম্নি নাচে ॥ আস্থাই ॥
শুনেছ দীনদয়াময়ী,
লোকে বলে বেদে আছে ।
আপনাকে যে আপনি ভোলে,
পরের বেদন কি তার কাছে ॥১॥ অন্তরা ॥
আপ্নি যেমন শঠের মেয়ে,
তেম্নি সঙ্গ ভাল মিলেছে ।
সে লেংটো থাকে, ভস্ম মাখে,
লোকে ভাল বলে পাছে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ সঁপেছে ।
তাতে ভিন্ন, নাম্মি অন্য,
নৈলে কেন সার করেছে ॥৩॥ অন্তরা ॥৮৬

বিভাস—একতালা।

এছার দেহের কি ভরসা ভাই!
আরে মন! তোরে আমি সুধাই তাই ॥ আস্থাই ॥
তুমি কি বুঝিতে পার,
দেহ কখন আছে কখন নাই ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
তোমায় আমায় ঐক্য হোয়ে, রসনারে সঙ্গে লয়ে,
দেহ যদিন আছে তদিন রোয়ে,
সুখে শ্যামার গুণ গাই ॥২॥ অন্তরা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা পাখি, তারা কেবল মাত্র আছে সাক্ষি;
এসো কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
কল্পতরুর মূলে যাই ॥৩॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের ভাষা, মন! পূর্ণ কর আমার আশা।
এসো বিশ্বময়ীর নাম লৈয়ে,
বিশ্বনাথের বিষয় পাই ॥ ৪ ॥ অন্তরা ॥৮৭

সুরট মল্লার—একতালা।

সুখের বাসনা করোনা কদিন।
ত্যজি অন্য বোল, * কালী কালী বল,
মানব জনম যদিন ॥ আস্থাই ॥
পাবে ব্রহ্মপদ, অক্ষয় সম্পদ,
স্মরণ করিবে এ দীন।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যা হইতে হয়,
সে হবে তোমার অধীন ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥

* পাঠান্তর 'ফল'।

যখন যেমন, বিধির লিখন,
সেইরূপে যাবে সেদিন।
ভাবিলে বিষাদ, ঘটিবে প্রমাদ,
কালী না বলিবে যেদিন ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত,
ভুলেছ ন মাস ন দিন।
বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি,
যাতনা সবে কত দিন ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৮৮

মুলতান—তিওট।

কি হৈল মোর অন্তরে কালো কামিনী।
আমারে বুঝাও ওরে মন!
তুমিও যে ভুলেছ হেরিয়ে ভামিনী ॥ আস্থাই ॥
না ভাবিতে আপনি ভাবিত কর,
হৃদি মাঝে নিবস, দিবস যামিনী ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
ঐ বামা * শম্ভু সাধন করে,
অথচ শম্ভু হৃদে পদ ধরে;
ভ্রময়ে উলঙ্গ গলিত চিকুরে,
তথাপি ত্রিভুবন মন প্রমোহিনী ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
ঐ মেয়ে ভুবন পালন করে,
অথচ প্রলয়ে পঞ্চম হরে;
কমলাকান্ত মানস বিহরে,
কুলপথ ধ্যান মানস মণি ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ৮৯

* পাঠান্তর—'মেয়ে'।

টৌড়ি—কাওয়ালী।

তবে কেন হইল মানব দেহ,
গুরু চরণে মতি হইল না।
যে কারণে এই তনু ধন্য,
কেন সে পথে আমার মন গেলো না॥ আস্থাই॥
আমার ধন, আমার পরিজন,
আমার সুত দারা;
এই কোরে হৈলাম পথহারা,
সারাৎসারা পরাৎপরা, তারা নাম লইলে না।
কমলাকান্ত হইলে নিতান্ত উন্মত্ত,
কুপথ ভ্রমণে ক্ষমা দিলে না,
সুপথ মনেরে শিখাইলে না॥ ১॥ অন্তরা॥ ৯০

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

শ্যামা! ভাল ভেবেছো মনে।
যে ওপদে আশ্রয় লয়,
তারে বিষয় বিষে রাখ্‌বে কেনে॥ আস্থাই॥
কিঞ্চিত করুণাময়ি,
কালি যদি চাও নয়নে।
তবে নিরানন্দ দূরে যায় মা!
সদানন্দ সুধাপানে॥ ১॥ অন্তরা॥

বিষয় পথের পথি যারা,
সে চল্‌বে কেন তাদের সনে।
সে একাকী বিরলে বসে,
হেঁসে হেঁসে চায় যাত্রিগণে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের এই, নিবেদন মা! শ্রীচরণে ॥
আমার একুল গেল ওকুল রাখ,
সকুল হও নাথের বচনে ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥৯১

আলেয়া—জলদ্ তেতালা।

শঙ্কর মনোমোহিনী তারা ত্রাণকারিণী,
ত্রিভুবন অঘ বিদারিণী, * ভবজননী।
ভবানী ভয়ঙ্করী, ভীমে বাণী ভয়হারিণী তারিণী ॥ আস্থাই ॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অসিতা অভয়া নিত্যানন্দদায়িনী।
বৃন্দাবন রস রসিকবিলাসিনী।
ব্যাস ভাষ খলু রাসপ্রকাশিনী,
কমলাকান্ত হৃদি কমলে,
তিমির হর বরজ রমণী ॥ † ১ ॥ অন্তরা ॥ ৯২

---

* পাঠান্তর—'নিবারিণী।'

† ব্রজাঙ্গনা। অনুরূপ প্রয়োগ—'গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে রমিতে বরজ ধনী।' চণ্ডীদাস।

জোয়ান্ পুরীয়া টোড়ী—আড়া চৌতাল।

তুমি যে আমার, নয়নের নয়ন,
মনেরি মন, প্রাণেরি প্রাণ, শ্যামা!
এ দেহের দেহী, জীবনের জীবন॥ আস্থাই॥
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ পর ধাম প্রাপ্তি গতি,
অগতির কারণেরি কারণ।
কমলাকান্ত, কুলকান্ত,
প্রবল কৃতান্ত ভব তারণ॥ ১॥ অন্তরা॥ ৯৩

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

যেমন কলি তেমনি উপায়,
কালীনামের জোর ডঙ্কা, বাজেরে।
তারা নামের বলে, যে জনচলে,
সে কারে করে শঙ্কা॥ আস্থাই॥
উত্তম মধ্যম দীন্, তুমি কারে না ভাবিও ভিন্;
তোরে লোকে যদি বলে হীন, ক দিন সে কলঙ্কা॥ ১॥ অন্তরা॥
যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদে রটে, সে নাম শূন্য জনে বটে;
কিন্তু কমলাকান্তের ঘটে, মিছা সে আতঙ্কা, রে॥ ২॥ অন্তরা॥ ৯৪

ইমন্ বেলাওল—তিওট্।

ত্বাং প্রণমামি শিবে! করুণাময়ী গো কালি!
কিঞ্চিত কুরু করুণা, অবলম্বনে দীনে, মা!॥ আস্থাই॥
মা দেহি দেহি অখণ্ড মতি, অব চরণারাধনে॥ অন্তরা॥

কলুষান্বিত চেতো নিয়ত,
অতি চঞ্চল বঞ্চিত হিত সাধনে।
ওমা শ্রীনাথ দত্ত সুতত্ত্ব পথ, হত বিষয়ালম্বনে ওমা! অভোগ॥
মায়াময় দেহ সতত অলসান্বিত,
দিন গত বৃথা ভ্রমণে।
কমলাকান্ত অশান্ত, শান্তয় কৃপাঁবলোকনে॥অভোগ॥ ৯৫

মুলতান—জলদ তেতালা।

ভবে কত না দিয়াছি ভাঁর, আসিয়া এবার।
এখন কামনা ছুটি চরণ তোমার॥ আস্থাই॥
আসি আশা হলো আশা, আশায় আশ নৈরাশা,
আমার আসার আশা, আশা মাত্র সার॥ ১॥ অন্তরা॥
বেদাগমে অসম্মত, কুকর্ম্ম করেছি কত,
অপরাধ শত শত ক্ষম মা! আমার।
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি!
এইবার করুণা করি, ভবে কর পার॥ অভোগ॥ ৯৬

মুলতান—একতালা।

আরে ও শুন! তব ভবানী ভাবনা গেল দূর।
তোমার অভয় চরণারবিন্দে, ভরসা প্রচুর॥ আস্থাই॥
উঠেছিল বিষয় তরু, মা! ভাঙ্গিলে অঙ্কুর।
এখন নিতান্ত ভরসা হলো, চিন্তামণিপুর॥ ১॥ অন্তরা॥

কালী নামামৃত ফল, মা! শীতল মধুর।
আমায় কয়ে দিলে এ মন্ত্রণা, মাথার ঠাকুর ॥
কমলাকান্তের পাট্টা মা! দাখিল হজুর।
দেখে ভয়ে পলাইল, কৃতান্ত মজুর ॥ ১ ॥ অভোগ ॥ ৯৭

---

*

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন, আছে যেমন,
রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা ॥ আস্থাই ॥
তোমার যা'রে কৃপা হয়, তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন যোড়ে না,
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণিকোঠা।
আপ্‌নি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচ্‌লনা তাঁর সিদ্ধি ঘোঁটা ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
দুঃখে রাখ, সুখে রাখ, কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ্ দিয়ে পরেছি আর,
পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ † কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা ॥ ৪ ॥ অন্তরা ॥ ৯৮

---

† পাঠান্তর—'রটেছে'।

* এই গীতটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত হইয়াছে।

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা! ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে,
প্রাণ কাঁপে মা! থাক্‌তে গাছে ॥ আস্থাই ॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা,
ছটা আগুন বিগুণ আছে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটী উপায় আছে।
জন্মজরা মৃত্যুহরা,
তারা নামে ছেঁচ্‌লে বাঁচে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥ ৯৯

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কেন আর অকারণ, কিসের চিন্তা কর মন!
তুমি সাধিলে সাধিতে পার, শিবের সাধের ধন ॥ আস্থাই ॥
এসো না বিরলে বসি, ভাবি শ্যামা মুক্তকেশী;
গয়া গঙ্গা বারাণসী, মায়ের শ্রীচরণ ॥ ১॥ অন্তরা ॥
ভাবিলে ভবানী ভবে, ভবের ভাবনা যাবে,
তোর পাপপুণ্য কোথা রবে, শমনের দমন ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের আশা, নাম ব্রহ্ম কর্ম্ম নাশা,
সেতো কঠিন নয়, কেবল মুখের ভাষা,
সুসাধ্য সাধন ॥ ৩॥ অন্তরা ॥ ১০০

যোগিয়া—একতালা।

যদি পার্ যাবি মন! ভবার্ণবে, বেয়েদে তরণী।
তাহে শ্রীনাথ কাণ্ডারি রে! মাস্তুল শ্রীভবানী॥ আস্থাই॥
দুর্গা বার কালী তিথি, রে মন!
তাহে নক্ষত্র তারিণী।
আমার মন! কর রে, শুভযোগ মাহেন্দ্র তখনি॥ ১॥ অন্তরা॥
বাতাসে যদি ভাসে, তরি না চলে উজানে।
তাহে বাদাম খাটায়ে দেরে, কুলকুণ্ডলিনী॥ ২॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের তরি, রে মন! তরিবে আপনি।
ওরে ভয় কোরোনা ভরসা বান্ধো, ব্রহ্ম সনাতনী॥৩॥ অন্তরা॥ ১০১

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন! তুই কাঙ্গালি কিসে।
কালী নামামৃত সুধা, পান্ কর মন ঘরে বোসে॥ আস্থাই॥
ভবার্ণবে মায়া তরি, কত ডুব্‌ছে উঠ্‌ছে যাচ্ছে ভেসে।
ওরে! আনন্দ ধামেতে রোয়ে,
রঙ্গ দ্যাখ হেঁসে হেঁসে॥ ১॥ অন্তরা॥
অনিত্য ধন উপার্জ্জনে, ভ্রমণ কর রে দেশে দেশে।
তোর্ করে যে অমূল্য নিধি,
চিন্‌লি না রে! সর্ব্বনেশে॥ ২॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের মন্, সুধাভ্রম হয়েছে বিষে।
তুই! অভয় চরণ, কর্‌না স্মরণ,
ঘর পাবি আর ঘুচ্‌বে দিশে॥ ৩॥ অন্তরা॥ ১০২

ঝিঝিট—একতালা।

যতন্ কোরে ডাকি তোরে, আয়্ আয়্ মন শুয়া পাখি !
কালী পাদপদ্ম পিঞ্জরে, পরমানন্দে থাক দেখি ॥ আস্থাই ॥
সদা শুন কুমন্ত্রণা, নিত্য নূতন বিড়ম্বনা।
মায়ের নাম সুধায় ভাঙ্গ ক্ষুধা, কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকি ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
পাইয়া পরম ধাম, সুখে ডাক মায়ের নাম ;
এসো অনিত্য বাসনা ত্যজি, নিত্য সুখে হওনা সুখী ॥ ২॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের মন ! ত্যজ অন্য আরাধন ;
এসো কালী নামে ডঙ্কা দিয়ে,
শঙ্কা ত্যজে বসে থাকি ॥ ৩॥ অন্তরা ॥ ১০৩

যোগিয়া—একতালা।

তুমি ভুলনা বিষয় ভ্রমে, মন রে ! আমার।
শ্রীদুর্গা অমৃত বাণী, সদা কর সার ॥ আস্থাই ॥
ধনজন গৃহ জায়া, এসকল মিছা মায়া, মন রে !
ভেবে ছাখ নিজ কায়া, নহে আপনার ॥ ১॥ অন্তরা ॥
পেয়েছ পরম নিধি, এসো না যতনে সাধি, মন রে !
কমলাকান্তেরে যদি, করিবে নিস্তার ॥ ২॥ অন্তরা ॥ ১০৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

তেঁই বলি সাবধানে চল।
এযে দখিনে ভায়ার লাটরে বাবা।
চলে সিক্কে কল জলুসি সেথা।
না চলে আড় কাট্‌রে বাবা ॥ আস্থাই ॥

তুমি কর যার ভরসা, সেতো বড় কঠিন আশা ;
সেথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাঁর, মাথায় করে
থাটুয়ে বাবা ॥ ১॥ অন্তরা ॥
সে যা বলে তাই হয়, সে কথা অন্যথা নয় ;
সেথা কেউ শুনে না কারু কথা, কাল্য কালীর
হাটরে বাবা ॥ ২॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটি উপায় আছে।
কালীনাম লইয়ে যে ধাম চলে,
তার শমন ছাড়ে বাটরে বাবা ॥ ৩॥ অন্তরা ॥ ১০৫

ইমন্ জলদ্ তেতালা।

কেন মিছে ভ্রমে ভুলে রৈলি, মন রে !
আপনার আপনার কর, কে তোমার কার তুমি। আস্থাই ॥
নলিনী দলগত নীর সম জীবন,
না জানি কি হইবে কথন ॥ ১॥ অন্তরা ॥
সৃজন পালন লয়, সাধিলে সকলই হয়,
সে ফল তাজিয়ে কেন, বিফলে ভ্রমণ।
পুরাকৃত পুণ্য, জন্য ফল মানব,
এ তনু মজালে অকারণ ॥ ১॥ অভোগ ॥
যাহার লাগিয়ে কত, করেছ কঠিন ব্রত,
পেয়ে সে পরম নিধি না কর যতন।
কমলাকান্ত ভ্রান্তি বশ হইয়ে,
বুঝি হেলায় হারাবি শ্যামাধন ॥ ২॥ অভোগ ॥ ১০৬

গাওরা—তিওট।

সুগম্ সাধন বলি তোরে, ওরে !
আমার মূঢ় মন ! সাধ রে।
যখন যাহাতে সুখে থাক, মন ! তাতেই ভাব মারে॥ আস্থাই॥
যদি না থাকিতে পার, মন !
চিন্তামণি পুরে।
চরাচরে শ্যামা মা মোর, সকলে সঞ্চরে॥ ১॥ অন্তরা॥
স্থলে অনলে শূন্যে আছে,
মা মোর, সলিলে সমীরে।
ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী শ্যামা, মারে জান না রে॥ ২॥ অন্তরা॥
ঘটে আছে পটে আছে,
মা মোর সকল শরীরে।
কামিনীর কটাক্ষে আছে, তেঁই জগতের মন্ হরে॥ ৩॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের মন ! ভয় করেছ কারে।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি, ঘটেছে তোমারে॥ ৪॥ অন্তরা॥ ১০৭

চেতা গৌরী—জলদ তেতালা।

দুটী নয়ন ভুলেছে।
ও নিবিড় ঘন রূপে॥ আস্থাই॥
যার যে মরম ব্যথা, সেই তা জানে গো !
না বুঝিয়ে লোকে চরচে॥ ১॥ অন্তরা॥
কুল শীল লাজ ভয়, কদাচ না মনে লয় ;
মান অপমানে, তৃণাঞ্জলি দিয়েছে॥ ২॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের চিত, সেই হোতে উন্মত্ত ;
যে অবধি কাল রূপ, অন্তরে লেগেছে॥ অন্তরা॥৩॥ ১০৮

টোড়ি—একতালা।

করকাঞ্চী তোমার কটিতটে, গো শ্যামা!
একি অপরূপ, নয়নে হেরিলাম ॥ আস্থাই ॥
কতকুণ্ডলা নরমুণ্ড পরেছ গাঁথিয়ে, গো শ্যামা!
শবোপরে নাচ মা উলঙ্গ হৈয়ে।
খসিল অম্বর; বাস না সম্বর,
কালি! পাগলী হোলি বটে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
চামর গঞ্জিয়ে, চাচর চিকুর মা!
ধরণী লম্বিত ধূলায় ধূসর।
কমলাকান্তের সভয় অন্তর,
যাইতে জননী নিকটে ॥ ২॥ অন্তরা ॥ ১০৯

ভেটিয়ারি—খেম্‌টা।

নব জলধর কায়। *
কালরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায় ॥ আস্থাই ॥
কপালে সিন্দূর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়
হাসিতে হাসিতে কত,
দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥ ১॥ অন্তরা ॥
অতি সুশীতল, চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমল প্রায়।
কমলাকান্তের, মন নিরন্তর, †
ভ্রমর হইতে চায় ॥ ২॥ অন্তরা ॥ ১১০

* পাঠান্তর 'নব সজল জলদ কায়।'

† পাঠান্তর 'ও চরণে।'

রামপ্রসাদীসুর—একতালা।

তারা মা! যদি কেশে ধোরে তোল।
তবে বাঁচি এ সঙ্কটে॥
আমার একুল ওকুল দুকুল পাথার,
মধ্যে সাঁতার বিষম হলো॥ আস্থাই॥
সঙ্গীগুলো হ'লো ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই;
ধর্‌তে গেলে আমায় ধরে, ডোবে ডুবায় প্রাণ্‌টা গেল॥ ১॥ অন্তরা॥
করেছিলেম যে ভরসা, না পূরিল সে সব আশা।
ভুলালে তখন ডুব্‌লে এখন,
আর কখন্‌ কি কর্‌বে বল॥ ২॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর।
ওমা! চরণতরি শরণ দিয়ে,
সঙ্গে লৈয়ে দেশে চল॥ ৩॥ অন্তরা॥ ১১১

পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

ওগো নিদয়া! তোরে, দয়াময়ী লোকে কয়।
তারা, জানে না পাষাণের মেয়ে, হৃদয় পাষাণময়॥ আস্থাই॥
ও দুটী চরণ বিনে, অন্য কিছু যে না জানে,
এত দুঃখ তার প্রাণে, তোমার উচিত নয়॥ ১॥ অন্তরা॥
তুমি আপনার সুখে সুখী, পর দুখে নও দুখী,
তবে কি কারণে ত্রিভুবনে, তব আশ্রয় লয়॥
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি
তোরে কে সেবিত, যদি না থাকিত যম ভয়। অভোগ॥ ১১২

পারাভৈরবী—ঢিমাতেতালা।

মা! আর না সহে, ভব যাতনা।
অকৃতি সন্তানে দেহি, নিজপদ ছায়া॥ আস্থাই॥
কি করিতে কি না হয়, মন মোর বশ নয়;
যা হইল সেই ভাল, বিষয় কামনা॥ ১॥ অন্তরা॥
ও পদ আনন্দময়, যে জন শরণ লয়;
ইহকালে পরকালে, কিসের ভাবনা।
কমলাকান্তের প্রতি, কেন মা বঞ্চনা অতি;
না জানি জননীর মনে,
কি আছে বাসনা॥ অভোগ॥ ১১৩

বেহাগ—একতালা।

ও নিস্তারকারিণি তারা, গো!।
ত্রাহি মাম্ ভাবে ভয়হারিণি॥ আস্থাই॥
ওমা! পড়েছি পাথারে, না জানি সাঁতার;
জননি! দুকুল হয়েছি হারা, গো!॥
ওমা! বাঁধি নিজ পাশে, ভ্রমাইলে দাসে,
মায়ের কি এমন ধারা, গো!॥ ১॥ অভোগ॥
এ মা সুখের ভাজন ধন পরিজন, মা!
ঐহিক বান্ধব যারা, গো!।
ওমা! কমলাকান্তের, যে দুঃখ অন্তর,
মা বিনে জানিবে কারা, গো॥ ২॥ অভোগ॥ ১১৪

টোড়ি ভৈরবী—একতালা।

এখন আর করোনা তারা! বঞ্চনা আমায়।
নিকট হইল স্থাথ! শমনেরি দায়॥ আস্থাই॥
যে করিলে সেই ভাল, সয়েছিলাম সয়েছিল,
এখন ভাবিতে হৈলো, দীনের কি উপায়॥ ১॥ অন্তরা॥
না হৈলো শমন জয়, তাহাতে না করি ভয়,
এই ভাবি নামের মহিমা পাছে যায়॥ ২॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের দুঃখ, হইলে হাসিবে মুখ;
লোকে কবে শ্যামা সুখ, না দিলে ইহায়॥ ৩॥ অন্তরা॥ ১১৫

পরজ—পঞ্চমসোয়ারী।

আমার গো ওমা! গতি কি হবে,
তারা জানে, মা জানে॥ আস্থাই॥
তারা বিনে আর, ইহকালে পরকালে,
আর যত কে জানে॥ *১॥ অন্তরা॥
আমিত নিপুণ অতি সাধনে,
বিদিত জননীর দুটি শ্রীচরণে।
কতদিনে হবে ত্রাণ, কমলাকান্তের এ ঘোর ভব বন্ধনে॥ ১॥ অভোগ॥ ১১৬

* পাঠান্তর—'আর যত ভরসা মনে।'

বেহাগ—একতালা।

কালি! কত জাগিয়ে ঘুমাও, গো।
আমি কেমনে, তোমারে জাগাইব ॥ আস্থাই ॥
তুমি সুমতি কুমতি, পুরুষ প্রকৃতি,
তুমি শূন্য সঙ্গেতে মিশাও। ১॥ অন্তরা ॥
কারে রাখ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে,
কারে ভ্রান্তি রূপেতে ভ্রমাও ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কারে দেহ যন্ত্র সাধনা মন্ত্রণা, কারে যন্ত্রণা যোগাও।
কমলাকান্ত নিতান্ত অনুগতে,
নাম রসে বিরমাও ॥ অভোগ ॥ ১১৭

কালাংড়া - ঢিমাতেতালা।

যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী,
তার বাহ্য সাধন কিছুই নয়।
অচিন্ত্য চিন্তিলে অন্য চিন্তা, আর্ কি মনে লয় ॥ আস্থাই ॥
যেন কুমারী কন্যারি খেলা, নানাভাবে নানা হয়।
তাদের স্বামীর সঙ্গে মিলন হোলে,
সে সব খেলা কোথা রয় ॥ ১॥ অন্তরা ॥
কি দিয়ে পূজিবে তাঁরে, সেই সর্ব্ব তত্ত্বময়।
দেখ! নির্গুণ কমলাকান্ত,
তাঁরেও করে গুণাশ্রয় ॥ ২॥ অন্তরা ॥ ১১৮

পরজ—জলদ্ তেতালা।

মা তারা!

আমার কি, এতদিনে হৃদি সরোজ প্রকাশিল।
পতিত তনয়ে কি তোর্ মনে ছিল॥ আস্থাই॥
শ্রীচরণাম্বুজ হৃদয় অম্বুজ মাঝে,
নিরখি তিমিরচয় দূরে গেল॥ ১॥ অন্তরা॥
মণিময় মন্দির মাঝে বিরাজে,
শ্যামা নীলকান্ত জিনি তনু নিরমল।
কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি,
মানব জনম সফল হলো॥ ১॥ অভোগ॥ ১১৯

ভূপালী—জলদ্ তেতালা।

অনুপমা রূপ অনুপ শ্যামা তনু,
হেরি নয়ন জুড়ায়, রে॥ আস্থাই॥
সজল কাদম্বিনী জিনিয়ে কুন্তল,
তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়॥ ১॥ অন্তরা॥
অঞ্জন অধরে আতসে মুকুতা ফল,
নীলকমল ভ্রমে অলি-কুল ধায়।
ক্ষণে ক্ষণে হাস্য কটাক্ষ কামিনী করে,
শিবের মন সহজে ভুলায় য়ে॥ ১॥ অভোগ॥
মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ নখ কিরণে,
রক্তোৎপল জিনি পদতল তায়।
কমলাকান্ত! অনন্ত না জানে গুণ,
শ্রীচরণ মানবে কি পায়॥ ২॥ অভোগ॥ ১২০

যোগিয়া—ঢিমাতেতালা।

ভাল প্রেমে ভুলেছ হে ভোলা ! মহাদেবা ॥ আস্থাই ॥
পাইয়ে চরণচিহ্ন, কদাচ না কর ভিন্ন,
নিরখি নিরখি কর সেবা ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
জিনি ঘনপরিবার, নিকর চিকুর ভার,
আলুয়ে পড়েছে অঙ্গে, অপরূপ শোভা।
ষোড়শী দিগম্বরী, দিগম্বর ত্রিপুরারী,
তোমার মহিমা জানে কেবা ॥ ১ ॥ অভোগ ॥
আনন্দে নাহিক ওর, মদনের মনচোর,
রমণী অলসে বশ, রণ রস লোভা।
রসনা রসিক মুখে, রমণী রময়ে সুখে,
কমলাকান্তের কমলে বা ॥ ২॥ অভোগ ॥ ১২১

পরজ-কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

হায় গো আমার কি হইলো, হৃদি সরোরুহ দলে।
কালো কামিনী লুকালো। আস্থাই ॥
যখন নয়ন মুদিয়াছিলাম, তখনি ছিল,
চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে, পলকেতে মিশাইল ॥ ১॥ অন্তরা
আমরি কি সুন্দরী, অতুল পদ রাওল,
আন্ধ যামে হংস যেমন অংশুতে উজ্জ্বল।
কমলাকান্তের মন ! মিছে ভাব অকারণ,
যদি পাবে শ্যামা ধন,
নয়ন মুদে থাকা ভালো ॥ ১॥ অভোগ ॥ ১২২

———

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা! কখন কি রঙ্গে থাক, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।
তোমার মায়াজাল ভাল করাল,
নৃকপাল মাল বিভূষণী॥
কভু লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা, অসিকরা করালিনী।
কভু অঙ্গভঙ্গি অপাঙ্গে,
অনঙ্গ ভঙ্গ দেয় জননী॥
অচিন্ত্য অব্যয়রূপা, গুণাতীতা নারায়ণী।
ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা,
ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছাপূর্ণ, কর নানা রূপ ধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাচ,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥ * ১২৩

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এই কথা আমারে বল।
তোমার কেবা মন্দ কেবা ভাল॥ আস্থাই॥
বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারে কর পরিত্রাণ;
কারে অবিদ্যা আবৃত কোরে,
মোহ গর্ত্তে টেনে ফ্যাল॥১॥ অন্তরা॥

* ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব এই গানটী গাইতেন।

জীব মাত্র শিব বটে, একথা অনেকে রটে ;
যে সদানন্দ তারে কেন,
নিরানন্দ হ'তে হৈলো ॥২॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের কালি ! মনের কথা মায়ে বলি,
কারু সুখের উপর সুখ,
কারু দুঃখে কেন জনম গ্যাল ॥৩॥ অন্তরা ॥ ১২৪

ঝিঝিট্ খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

শ্যামা মায়ের ভব-তরঙ্গ, কেমন কে জানে।
আমি উজান্ উঠ্‌বো মনে করি,
কে পাছু পানে টানে ॥
কৌতুক দেখিব বলে, মা মোর দিয়েছে ফেলে ;
একবার ডুবি আর বার ভাসি,
হাসি মনে মনে ॥
দূর নয় নিকটে তরি, অনায়াসে ধর্‌তে পারি ;
এ বড় দায় ধরিবো কি তায়,
মন নাহি মানে ॥
কমলাকান্তের মন ! ইচ্ছা অতি অকারণ ;
তবে তরি যদি তারা !
তার নিজ গুণে ॥ ১২৫

ললিত যোগিয়া—একতালা।

সামান্য নহে মায়া তোমার, পার হব কিসে।
আমি করি সুধা ভ্রম, মিছা পরিশ্রম,
বিষম বিষয় বিষে, গো॥
আগে যে ছিল না, সে শেষে রবে না,
মা! অসময় কেহ কথাও কবে না।
দুদিনের দেখা, তারে ভাবি সখা,
কেবল কর্ম্মদোষে॥
ঐহিকের সুখ দুখ কিছু নয়,
আমি জানি গো জননি জগ মিছা ময়;
কমলাকান্ত তথাপি ভ্রান্ত,
কেবল তোমার বশে॥ ১২৬

মূলতান—তিওট্।

শিবে! চাওগো তারা তুমি,
ওমা পাষাণের মেয়ে।
এ তনু সফল কর মা! বারেক হেরিয়ে॥ আস্থাই॥
ধরেছ বাপের রীতি, কঠিন হয়েছ অতি,
তেঁই দয়া না উপজে, গো!
দীনের মুখ চেয়ে॥১॥ অন্তরা॥
যদি বা কুপুত্র হয়, মায়ের বৈ আর কারো নয়;
কে কোথা তনয়ে ত্যজে, জননী হইয়ে।
কমলাকান্তের ভার, বল কে লইবে আর;
কিঞ্চিৎ করুণা কর, মা!
কাতর দেখিয়ে॥ ১॥ অভোগ॥ ১২৭

যোগিয়া—একতালা।

ও জননি গো! যেন ডুবাওনা সাধের তরি মোর।
বড় ভয় পেয়েছি, কাতর হয়েছি, শরণ লৈয়েছি তোর॥
মন-বায়ু না হয় সখা, গুণ টানে কর্ম্মরেখা;
দাঁড় ধরে অনঙ্গ, তরঙ্গ অতি ঘোর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোঝাই করি, যতনে সাজালাম তরি,
বদলে পাইব জ্ঞান, বাণিজ্য কঠোর॥
কমলাকান্তের আর, কে আছে মা! আপনার,
মা! তুমি হওগো কর্ণধার,
কাট কর্ম্ম ডোর॥ ১২৮

মুলতান—তিওট।

জানি জানি গো জননি! যেমন পাষাণের মেয়ে।
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে॥
প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক কায়া,
বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে।
কার প্রতি সুমতি, কুমতি হও মা কার প্রতি,
আপনারো দোষ ঢাক, কারে দোষ দিয়ে॥
মা! না করি নির্ব্বাণে আশ,
না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি!
তাহে বিড়ম্বনা কর, মা!
কি ভাব ভাবিয়ে॥ ১২৯

গারা ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

আমার আর কবে এমন দিন হবে, গো জননি!
দুটি নয়নে হেরিব, তব শ্রীচরণ দুখানি॥
যে রূপ অন্তরে দেখি, দেখিবারে চায় আঁখি;
পূরাও দেখি কামনা, করুণা তবে জানি॥
কমলাকান্তের আশা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মনাশা;
তবে শ্রীনাথের ভাষা, ধন্য কোরে মানি॥ ১৩০

গৌরী—চিমাতেতালা।

মা! মোরে লয়ে চল ভবনদীপার; গো তারা।
আমি অতি অকৃতি অধম দুরাচার॥
সম্বল আছিল যার, অনায়াসে হৈলো পার;
কিছু ধন নাহিক আমার, যে নাবিকে দিব মা।
প্রদোষ সময়ে, ধরম তরি বায় নেয়ে;
চেয়ে আছি চরণ তোমার, গো তারিণি॥
অজ্ঞানে হয়েছি অন্ধ, পথে নানা প্রতিবন্ধ;
ভবসিন্ধু অনিবার, কিসে পার হবো মা!
কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে,
তারা! মোরে করিবে নিস্তার॥ ১৩১

ভৈরোঁ—একতালা।

লয়েছি শরণ, অভয়-চরণ,
যা ইচ্ছা তাই কর মা এখন।

আগো করুণাময়ি ! করুণাধনে,
কৃপণতা কর এ আর কেমন ॥
পেলে দেবাশ্রয়, পরকালে হয়,
সুখ মোক্ষ শিবে ! স্বর্গাদি গমন।
কিন্তু তব কৃপায়, ইহকালে পায়,
ভোগ মোক্ষ আর অণিমাদি ধন ॥
জীব নহে জন্য, সদা সচৈতন্য,
ধন্য অগ্রগণ্য, বেদে নিরূপণ।
কিন্তু তব মায়া পাশে, বিজ্ঞান বিলাসে,
মিছা ভ্রম আশে, ভ্রমি অকারণ ॥
ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা, কালে বিবসনা,
সচেতনে কর অতি অচেতন।
কিন্তু কমলাকান্ত, হইলে ভ্রান্ত,
তব নামে রবে অযশ কথন ॥ ১৩২

সোহিনী—একতালা।

কেমন কোরে তরাবে তারা ! তুমি মাত্র একা।
আমার অনেক গুলা বাদী, গো !
তার নাইকো লেখাজোকা ॥ আস্থাই ॥
ভেবেছ মোর ভক্তিবলে, লোয়ে যাবে বলে ছলে ;
অভক্তের ভক্তি যেন পেত্নীর হাতের শাঁখা ॥১॥ অন্তরা ॥
নাম ব্রহ্ম বটে সার, সেওতো আমার অতি ভার ;
মনের সঙ্গে রসনার, খাবার সময় দ্যাখা।

কমলাকান্তের কালি ! হৃদে বোস উপায় বলি ;
এ বিষয়ে উচিত হয়, চৌকি দিয়ে থাকা ॥ ১ ॥ অভোগ ॥ ১৩৩

যোগিয়া—জলদ্ তেতালা ।

কালী নামের কত গুণ, রসনা কি জানে ।
জানিলে মজিত কেন, ভ্রম রস পানে ॥ আস্থাই ॥
আর দ্যাথ ত্রিলোচন, সদানন্দ সনাতন ;
সদা সে মগন, শ্যামানাম গুণ গানে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
কালীনামামৃত সুধা, না রাখে বিষয় ক্ষুধা ;
নাশিয়ে সকল বাধা প্রলয় প্রধানে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
রসনার যেমত মত, মন তাহে অনুগত ;
অবোধে বুঝাব কত, বুঝালে না মানে ।
কামাদি ছ জনা অতি, অনুকূল তার প্রতি,
কমলাকান্তের গতি, হইবে কেমনে ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥ ১৩৪

ইমন্—জলদ্ তেতালা ।

মা ! আমি কি করিলাম ভবে আসিয়ে ।
সফল মানব দেহ, বিফলে খোয়ালাম ॥
সবে মাত্র এই হলো, মিছে কাজে দিন গ্যালো ;
আপনি পাইলাম দুখ, জননীরে দিলাম ॥
শ্রীনাথ নিকটে নিধি, যদি মিলাইল বিধি ;
পাইয়ে পরম ধন, হেলায় হারালাম ।
নামের মহিমা রেখো, কমলাকান্তেরে দেখো,
অসময়ে নিকটে থেকো, এই নিবেদিলাম ॥ ১৩৫

পরজ কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

নাচগো শ্যামা! আমার অন্তরে।
সদানন্দময়ি নাচ! চিদানন্দ উপরে॥
নাচগো নাচগো শ্যামা! নাচন দেখি;
তোমার দিগবাস অট্টহাস, গলিত চিকুরে॥
মণিময় মন্দির, সুরতরু মূলে,
শ্রীধাম আবৃত, সুধা-সরোবরে॥
কমলাকান্তের এই, কামনা করুণাময়ি!
এতনু সফল কর মা! দুখ যাউক দূরে॥ ১৩৬

সুরট্ মল্লার—তিওট্।

আলুয়ে পড়েছে বেণী, জিনি নব মেঘ শ্রেণী।
আর তাহে সুচঞ্চল, শ্যামা নীল সৌদামিনী॥
আরে হুহুঙ্কার গরজে, গভীর নিনাদিনী।
হরিষে বরিষে সুধা, সুধানন্দ তরঙ্গিণী॥
আরে! অতি নির্ম্মল চরণ, প্রফুল্ল নীল নলিনী।
নখর মুকুর কর, হিমকর কর জিনি॥
আরে! চরণারুণ কিরণে, আবৃত কত দিনমণি।
কমলাকান্তের হৃদি, কমল সুপ্রকাশিনী॥ ১৩৭

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মনে ইচ্ছা আছে।
এবার কালী বোলে, বাহু তুলে,
যাব শ্যামা মায়ের কাছে॥ আস্থাই॥

কালীনাম সারাৎসার, নিঃসরে বদনে যার ;
সেজন ভক্ত জীবন মুক্ত,
দোহাই দিয়ে শিব কয়েছে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
যার কালীনাম আপ্তসার,
কালের ভয় কি আছে তার ;
তুমি এই কোরো সতর্কে থেকো,
কালোবরণ ভোল পাছে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
কমলাকান্তের কথা, ঘুচিল আমার মনের ব্যথা ;
এবার নাম জেনেছি, ধাম চিনেছি,
পথ বড় সুগম হয়েছে ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ১৩৮

ভৈরোঁ—একতালা।

জাননা রে মন ! পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হয়ে এলোকেশী করে লোয়ে অসি,
দনুজ তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন,
করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা,
যতনে এভব যাতনা সয় ॥

যেরূপে যেজনা, করয়ে ভাবনা ;
সেরূপে তার, মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে,
কমল মাঝারে করে উদয় ॥ ১৩৯

ঝিঁঝিট্—একতালা।

ভাল ভাব ভেবেছ, রে মন!
তোর ভাবের বালাই যাই।
তোর ভাবে ভব-ভবানী, ভবনে বসে পাই ॥
ঐ ভাবে ভুলে থাকো, ভাবান্তর হয়ো নাকো ;
মন! ভাবিলে রে! ভবের ভাবনা কিছুই নাই ॥
কমলাকান্তের মন! এত যদি তুমি জান রে!
তবে কেন আমারে বঞ্চনা কর ভাই!। ১৪০

খাম্বাজ—একতালা।

আমার মনে কত হয়, মন যে স্ববশ নয়।
শ্রীচরণ-সুধাময়ে, স্থিরতা না রয় ॥
ঘটে না উপজে জ্ঞান, মিছা দেহ অভিমান ;
তুমি কর কি নাকর ত্রাণ, শমনেরি ভয় ॥
কমলাকান্তের এই, ভাবনা গো ব্রহ্মময়ি!
পাছে তোমায় ভুলে রই, চরম সময়, (গো) ॥ ১৪১

মুলতান—একতালা।

তবে চঞ্চল হয়েছ আমার মন! কেন অকারণ।
কর পূর্ণ আশা, দুঃখনাশা,
মায়ের দুটি শ্রীচরণ॥
অপার সঙ্কটে, কত বার্ বার্ পোড়েছ বটে;
যখন বিপদ ঘটে, কালী করে নিবারণ।
কমলাকান্তের মন! সদা থাক অচেতন;
তুমি বিজ্ঞান হীন, তোমার
বুদ্ধি অতি সাধারণ॥ ১৪২

ঝিঁঝিট্—জলদ্ তেতালা।

তুমি কি ভাবনা ভাব, ওরে আমার মূঢ় মন!
সময় পেয়েছ ভাল, সাধনা সেই শ্যামাধন॥
সৃজন পালন লয়, সুকৃতি এই তিন জন।
তারা তোর ভাবনা ভাবে, বিধি-হরি ত্রিলোচন॥
যারে ভাব আপনার, ভেবে দেখ কে তোমার;
কেবল সুখের ভাগী, জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন॥
কমলাকান্তের চিত, অনিত্য এই ত্রিভুবন।
নিত্য সেই নিত্যানন্দময়ীর, দুটি শ্রীচরণ॥ * ১৪৩

সিন্ধু—পোস্ত।

মজিল মন-ভ্রমরা, কালীপদ নীল-কমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে॥

* ৮৪নং পদাবলী দ্রষ্টব্য। দুটী গানই এক, তবে 'যারে পরিজন'—এই পদটী ৮৪নং পদাবলীতে নাই।

চরণ কালো ভ্রমর কালো,
কালো কালোয় মিশে গ্যালো ;
দ্যাখো সুখদুখ সমান হোলো,
আনন্দসাগর উথলে ॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদিনে ;
দ্যাখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত,
রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ * ১৪৪

ঝিঁঝিট্—জলদ তেতালা।

মন রে ! মরম দুঃখ কয়ো শ্যামা মারে।
অঘট ঘটনা কেন, ঘটে বারে বারে ॥
আমি ভাবি নিজ হিত, হয়ে কেন বিপরীত ;
পুরাকৃত কর্ম্ম বুঝি, দূরে গ্যালনা রে ॥
তুমিত সুকৃতি বট, কোন কাজে নহ খাট ;
সে কারণে শ্রীচরণে সঁপেছি তোমারে।
কমলাকান্তের আর, যাতায়াত কত বার ;
সাধিয়ে সুধায়ে সুখী, কর না আমারে ॥ ১৪৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মন ! ভাব ভোলারে।
যা ইচ্ছা কর দিতে পারে ॥
ত্রিপুরারি দয়াময়, কখন ভুলিবার নয় ; মন রে !
পুরাকৃত পাপ যত, হর বিনে কে হরে ॥

* যুগাবতার পরমহংস দেব এই গানটী গাইতেন।

শুন মন ! দুরাচার, শিবনাম সারাৎসার ;
ত্যাখো ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জটার ভিতরে ॥
কমলাকান্ত বলে, পোড়ো কালীর পদতলে ;
মন্‌রে ! সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী, ঘরণী যার ঘরে ॥ ১৪৬ ॥

ললিতযোগিয়া—জলদ্ তেতালা ।

ভুলনা বিষয়ভ্রমে, মনরে ! আমার ।
শ্রীদুর্গা অমৃত-বাণী, সদা কর সার ॥
ধন জন গৃহ জায়া, এ সকল মিছা মায়া ;
ভেবে দ্যাখ নিজ কায়া, নহে আপনার ॥
পেয়েছ পরম নিধি, এসোনা যতনে সাধি ;
কমলাকান্তেরে যদি, করিবে নিস্তার ॥ ১৪৭

ভৈরোঁ—একতালা ।

কালী কেমন ধন, খেপা মন ! চিনিতে না পারিলি ।
কেবল খেয়ে শুয়ে খেলায়ে,
খেপাটা ! কাল কাটালি ॥
বাণিজ্য বাসনা করি, ভবের হাটে এলি ।
কি হবে ব্যাপার, এবার বুঝি মূল হারিয়ে গেলি ॥
পুরাকৃত পুণ্যের মানব দেহ পেলি ।
যদর্থে গমন ভবে, এসে তার কি করিলি ॥
কমলাকান্তের মন ! এমন কেন হলি ।
মন ! আপনি কুকর্ম্মে মজে,
আবার আমারে মজালি ॥ ১৪৮

মল্লার—ঝাপতাল।

আমার মন রে!

যতন করি রট রে শ্রীদুর্গা নাম বদনে॥

ত্যজ রে অনিত্য কাম, ভজ রে শ্রীদুর্গানাম,

চল রে আনন্দময় সদনে॥

একে সে কঠিন কাল, তাহে বাদী রিপুজাল,

সদা চিত বিষয় আরাধনে।

অনায়াসে রট মন! পাবে রে পরম ধন,

কি কাজ কঠিন ব্রত সাধনে॥

দারা সুত আরাধনে, অতুল আনন্দ মনে;

জান না প্রবল রিপু শমনে।

কমলাকান্তের মন! নিয়ত চঞ্চল কেন,

তিলেক না রহে রাঙ্গা চরণে॥ ১৪৯

টোড়ি—চৌতাল।

কেমন বেশগো, ওগো শ্যামা সুন্দরী!

সুন্দর হৃদয় বিহারিণি॥

নগনা নিতম্বদেশ, চরণারবিন্দ শেষ;

এলোকেশ ভালে নিশেষ;

গিরিরাজ নন্দিনী॥

ব্রহ্ম নিরূপণে নিরূপমা তব নাম ধাম;
শম্ভু মূলাধার মহিমা না জানে।
কমলাকান্তের ভ্রান্তে, ভ্রময়ে মন;
শান্তয় শান্তয় রিপুভয়বারিণি॥ ১৫০

লুম্—ছেব্‌কা।

বামার বাম করে অসি।
বামার অসি তিমির বিনাশী॥
শ্রীবদন নিরমল, তাহে মৃদু হাসি॥
গগনে উদয় যেন, ষোল কলা শশী॥
বুঝিলাম অনুভবে, হরের মহিষী।
কমলাকান্তের মন, চরণাভিলাষী॥ ১৫১

ভেটিয়ারি—ঠুংরি।

আগো মা! শ্যামা শিব মনমোহিনি।
একবার করুণা নয়নে চাও গো।
হে হে শিবে! পাষাণ তনয়া,
হইয়ে সদয়া, অভয়া অভয়ে বিলাও গো॥
শীতল চরণ পাইয়ে, মা! সুখী ত্রিপুরারি।
যার বরণ কালো, ভুবন আলো,
রূপের বলিহারি, গো॥
কি কাজ ভ্রমণ করে, মা! গয়া গঙ্গা কাশী;
যার অন্তরে জাগিছে, ব্রহ্মময়ী এলোকেশী॥
কারে দিলে ইন্দ্রপদ, হেম হার মণি।
কমলাকান্তেরে দ্যাও, রাঙ্গাচরণ দুখানি॥ ১৫২

টোড়ী ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

যদি তারিণি তারো, ভজনবিহীনে ॥
তুমি না তারিলে বল, তরিব কেমনে, মা ! ॥
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়,
বঞ্চনা উচিত হয় কি, অধীন জনে, মা ! ॥
কমলাকান্তের প্রতি, কিঞ্চিত না হের যদি ;
পতিতপাবনী নাম, রাখিবে
কি গুণে, গো ! ॥ ১৫৩

পরজ বাহার—পঞ্চম সোয়ারী।

তারা ! আমি কি করিব গো !
মন আমার হোলো না বশ, আশুতোষ প্রিয়ে।
স্বভাব চঞ্চল যার, তারে তুষিব কি দিয়ে ॥
এই ছিল আশ, মন বশ করি রূপ হেরি।
শ্রীচরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে, গো।
কমলাকান্তের আশা, না পূরিল জননি !
জনম মোর, বৃথা গ্যালো গো ! বহিয়ে ॥ ১৫৪

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা—তাল ফেরতা।

তারার বুঝি ইচ্ছা নয় মা !
তোমার বুঝি ইচ্ছা নয়, গো !
এ দীন ভবে মুক্ত হয়,
নতুবা আমারে কেন বিড়ম্বনা অতিশয় ॥
(জলদ তেতালা)

দিয়েছ দুখ আর্ বার্ দিবে,
সয়েছি মা আর্ বার্ সবে ;
অকলঙ্ক তারা নামে,
লোকে পাছে কিছু কয় ॥ (একতালা)
শরীর সাধন, মিছা যতন,
হয় পুরাতন আবার নূতন ;
হোচ্ছে যাচ্ছে আবার আস্‌ছে,
ভ্রান্তি মাত্র কিছুই নয়।
কমলাকান্তের ঠাঁই, আর কিছু কামনা নাই
মুদ্‌লে আঁখি যেন দেখি,
কালো বরণ সুধাময় ॥
(জলদ্ তেতালা) ॥ ১৫৫

ঝিঝিট্—জলদ্ তেতালা।

চাহিলে না ওমা ! কেন, একবার সুনয়নে।
পতিত পাবনী নামে তারো গো ! ভজন-হীনে ॥
বঞ্চিত হয়েছি আমি, ও পদ সাধনে।
অকৃতি তনয়ে হয় মা ; তারিতে আপন গুণে ॥
কতশত দুরাচার, অনায়াসে কর্‌লে পার ;
এবারে জানিব মোরে, নিস্তার কেমনে।
কমলাকান্তেরে যদি, ত্রাণ কর ভবনদী ;
তবেতো জানি তারিণি !
তার গো পতিত জনে ॥ ১৫৬

সুরট মল্লার—জলদ্ তেতালা।

ময়ি দীন হীন জনে, গো! কুরু কৃপা এইবার।

সুকৃতি অকৃতি সুত, মায়ের সমান প্রীত,

না ত্যজিও ভজন বিহীনে॥

বিষয় বাসনা অতি, না জানি মা! শ্রুতি স্মৃতি,

মম গতি হইবে কেমনে।

কমলাকান্তের মনে, বিতরি করুণাধনে,

নিজ গুণে যদি চাও নয়নে, গো! ১৫৭

টোড়ী-ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

তারা! তবে তোমার, ভরসা বল কে করে।

যদি আপনারি কর্ম্মফল, ফলিবে আমারে॥

যেরূপে ভ্রমাও তুমি, সেইরূপে ভ্রমি আমি;

মিছা সুখ দুঃখভাগী, করগো! আমারে॥

কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি,

শমন-সঙ্কট যদি, না থাকিত নরে॥ ১৫৮

যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

তথাচ জননি! তব, তারা নামে তরিব।

যখন যেমন রাখ, সেই মতে রহিব॥

অঘটন ঘটনা যদি, ঘটেতো কি করিব, মা॥

পাপ করি পুণ্য করি, ঐ নামে সম্বরিব॥

কমলে বঞ্চনা কর, এইবারে তা বুঝিব।

কেমনে ত্যজিবে তুমি, আমি যে না ত্যজিব॥ ১৫৯

হাম্বীর—জলদ্ তেতালা।

করুণাময়ি শ্যামা গো মা!
ময়ি দীনে, ক্ষতি কি হেরিলে, নয়ন কোণে॥
হে মা! হেরিলে হইব পার,
এ কোন তোমারে ভার, মহিমা জানে জগজনে॥
সঙ্কট বারিণি, তারয় তারিণি!
দুর্গে দুর্জ্জয় নিবন্ধনে।
হে মা! বারে বারে যন্ত্রণা কমলাকান্তের, শ্যামা!
মা হৈয়ে গো! দ্যাখ কেমনে॥ ১৬০

টোড়ী—কাওয়ালি।

জননি তারিণি! ভব ঘোরে,
আমি যে ভজন বিধি না জানি॥
মহাপাপী দুরাচারী, আমি যদি ভবে তরি,
তবে জানি তারানাম তরণী॥
দুরাশয় দেখে মোরে, কেহ না নিস্তার করে,
শুনেছি পতিতে, তারে তারিণী।
উপায় না দেখি আর, দিয়েছি তোমারে ভার,
যা কর ত্রিপুর-হর ঘরণি॥
অসার করিয়ে সার, ভ্রমি ভবে বারে বার,
মিছে কাজে গ্যাল দিন যামিনী।
কমলাকান্ত নিতান্ত শরণাগত,
বারে হের আশুতোষ রমণি॥ ১৬১

সুরট মল্লার—একতালা। †

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী সার, রে।
(আমার) মন কালী, ধন কালী,
প্রাণ কালী আমার, রে॥
(কেহ) সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে,
পেয়েছে রাজ্যভার।
(আমার) দরিদ্রের ধন, দুখানি চরণ,
হৃদয়ে পরেছি হার, রে॥

---

† ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের 'সাধক সঙ্গীত' গ্রন্থের (১ম সংস্করণ) ৫৬ পৃষ্ঠায় এই পদাবলীটি অন্যভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে ভনিতা নাই। যথা—

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।
"কিছু নাই সংসারের মাঝে।
কেবল শ্যামা সার রে।
মন কালী ধন কালী প্রাণ
কালী আমার রে॥
আসিয়া ভুবনে এতনু ধারণে।
যাতনা না হয় কাররে।
একবার হেরিলে ওকায়,
সব দুঃখ যায় এই গুণ শ্যামা মার রে॥
কেহ আসিয়া সংসারে নানা সুখ করে।
পাইয়ে রাজ্যভার রে॥
আমার (দরিদ্রের) ধন ও রাঙ্গা চরণ
গলায় পরেছি হরেরে॥"

এতনু ধারণে, এতিন ভুবনে, যাতনা নাহিক কার।
কিন্তু হেরিলে শুমুখ, দূরে যায় দুখ,
এই গুণ শ্যামা মার, রে॥
কমলাকান্ত হৈয়ে ভ্রান্ত, বেড়াইছে বারে বার।
(এবার), অভয় চরণ, লয়েছে শরণ,
অনায়াসে হবে পার, রে॥ ১৬২

লুম্ খাম্বাজ—একতালা।

দেখো ত্রাণ কর মা! এ সঙ্কটে পাষাণের বেটি।
ভেবে পেটে শুল্ম হোলো,
প্রাণ শুখায়ে কুলের আঁটি॥
আমি অতি অভাজন, না জানি ভজন সাধন,
করি মা এক নিবেদন,
মরণ কালে হয় না যেন, যমের সঙ্গে লুটাপাটি।
আমি তোমার ক্ষেপা পাগল,
কোরে বেড়াই মিছে গোল;
না বল্লাম মুখে দুর্গা বোল, কমলের ভরসা কেবল,
মায়ের রাঙ্গা চরণ দুটি॥ ১৬৩

সুরট মল্লার—জলদ্ তেতালা।

হে গিরি নন্দিনি, ভব ভয় ভঞ্জিনি,
হর গৃহিণি শিবে পরমেশানি,
স্মরহর মনমোহিনি॥

জগত জননি, জগদানন্দদায়িনি,
সৃজন পালন লয় কারিণি তারিণি,
বিধিহর ধরণীধর বন্দিনি ॥
ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণি, ব্রহ্মময়ি সনাতনি,
চরাচর নাগনর সুর প্রতিপালিনি।
কমলাকান্ত কৃতান্ত নিবারিণি,
ত্রিগুণ ধারিণি, ত্রিপুরে পরমাত্মনি,
কলিভব কলুষ নিচয় খণ্ডিনি ॥ ১৬৪

পূরবী—একতালা।
নারায়ণি ! সুমতি দেহি মে শিবে।
অপরাধ সম্বর হরঘরণি ॥
ত্রিগুণ ধারিণি, শমন বারিণি,
গণেশ জননি মহেশ রাণি ॥
উমে দিগম্বরি, শঙ্করি সুরেশ্বরি, ভৈরবি ভবানি বাণি ॥
ত্রিপুরে বরদায়িনি, দিতিসুত কুলনাশিনি,
অভয়াসি বর নরকর শির হার ধারিণি।
শঙ্কর মনমোহিনি, শ্যামে ভীমে শিবানি,
কমলে বিমলে ত্রিনয়নি ॥
কালিকে কপালিকে, শুভদে গিরিবালিকে,
শুভঙ্করি শিবে, শম্ভুনাথসঙ্গিনি।
কমলাকান্ত পতিতে, ত্রাহি দুর্গে ভবার্ণবে,
পতিততারিণি কলুষহারিণি ॥ ১৬৫

ভৈরোঁ—কাওয়ালি।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনি গিরিজে অম্বে অম্বুজলোচনি।
ভবজননি, ভবসাগরতরণি, ভবরমণি ভয়হারিণি॥
পরমে পরমেশানি, স্মর-হর-ঘরণি,
উমে শিবানি।
ত্রিভুবন তারিণি, ত্রিপুরবিনাশিনি
মদনদহন-মনমোহিনি॥
বগলে বিমলে বালে, হিমকর ভালে,
উমে করালে।
মণিপুর বিবর নিবাসিনি কমলে,
কমলাকান্ত বিমোচনি॥ ১৬৬

টোড়ী ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

শিবসুন্দরি গো মা! স্তুতিং ন জানামি।
কর বা না কর পার, তবু তোমারি আমি॥
তৃষ্ণা নিদ্রা ক্ষুধা মায়া, শক্তিরূপা শিবজায়া;
নির্গুণা সগুণাত্মিকা সর্ব্বরূপিণী॥
হে কালি! ত্বং শান্তি ভ্রান্তিভয়হারিণী,
হরবধূ হেরম্ব জননি, প্রণমামি॥
সুরাসিন্ধু সরসিজে, সদানন্দ নিত্যং ভজে,
পঞ্চাশন্মাতৃকা রূপা, চন্দ্রার্দ্ধ ধারিণি, মা।
কমলাকান্ত তব মহিমা কি জানে,
তোমাময় ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডময় গো তুমি॥ ১৬৭

কালাংড়া—একতালা।

শ্যামাধন কি সবাই পায়।

অবোধ মন! বুঝনা একি দায়॥ *

শিবেরো অসাধ্য সাধন,

মন! মজনা রাঙ্গা পায়॥

ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায়।

সদানন্দ সুখে ভাসে,

শ্যামা যদি ফিরে চায়॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায়।

নির্গুণ কমলাকান্ত,

তবু সে চরণ চায়॥ † ১৬৮

কানাড়া—জলদ্ তেতালা।

ভৈরবী ভবভয়হরা ভবদারা ভৈরবী ভৈরববরা॥

অমিতাঙ্গ ধরা, হে গিরিনন্দিনি!

ত্রিগুণাধারা ত্রিতাপবিনাশিনী

তারা, হে নারায়ণি আগো শ্যামা,

অসীম মহিমাগুণ, তারা॥

অসি মুণ্ড বরাভয় করা, অজরা অমরা সুরেশ্বরী ত্রিপুরা।

ভুবনাকারা, ত্রিভুবনসারসারা, করুণাময়ি কুরু কৃপা,

কমলাকান্তেরো হৃদিপরা॥ ১৬৯

---

* পাঠান্তর—'মন বুঝেনা একি দায়।'

† ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এই গানটী গাহিতেন

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

বল আর কার তারানাম আছে, গো জননি।
এমন নাম আর কার আছে, গো বিপদনাশিনি ॥
আগমে শুনেছি নাম, পূরাও মনেরি কাম,
পঞ্চমুখে পঞ্চনাম, জপেন শূলপাণি ॥
মূলাধারে সহস্রারে, কমল বিরাজ করে,
কমলাকান্তেরই হৃদে, কমলবাসিনী ॥ ১৭০

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

দীন হীন অতি কাতর নিরাশ্রয়,
আশ্রয় তব চরণাম্বুজ ব্রজ ॥
সংসার সৃজন লয় পালন কারিণী,
শ্রীচরণে আশ্রিত যার হরিহর অজ ॥
মম তনু অনুগত কৃত শত দুষ্কৃত,
সে ভয়ে সভয় করে তপন তনুজ।
কমলাকান্ত কাল ভয় দুরয়,
পূরয় নিজদাস আশ মনসিজ ॥ ১৭১

কেদারা—জলদ্ তেতালা।

কিঞ্চিৎ কৃপা অবলোকন কর কালি!
কালভয় হারিণি ॥
ত্বমসি গতির্মম ইহ সংসারে,
সংসারার্ণবতারিণী, তারিণি ॥

কলিজ কলুষহরা, ত্রিগুণহারিণী তারা,
সৃজন পালন লয় কারণ কারিণী।
কমলাকান্ত হৃদয় তম নাশিনী,
সর্ব্বদা সদানন্দ হৃদিচারিণী॥ ১৭২

ঝিঝিট—একতালা।

তরণী মাঝি মেয়ে, রে! চল দেখে আসি গিয়ে।
এভব তরঙ্গ দেখে কি কর বসিয়ে॥
দশ মহাবিদ্যা রোয়েছে ঘেরিয়ে।
তার মাঝে বসে আমার শঙ্কর যোগিয়ে॥
বাজিছে মৃদঙ্গ মাদল, তাতা থেয়ে থেয়ে।
দেব সারি গায় কমল, অতুল ভাবিয়ে॥ ১৭৩

সরফদরা—জলদ্ তেতালা

কলুষ নিবারয়, গো শ্যামা!
ফিরে চাও নয়ন কোণে, ওগো হররমা॥
দীন হীন কাতরে, কুরু কৃপা শঙ্করি,
খলু ভবার্ণব তরি তব নামা॥
হরবধূ হর, তামস কমলের,
এই মানস পূরয় মনোগত অভিরামা॥ ১৭৪

ভৈরোঁ—একতালা।

বার বার মন এবার, শমনে ভয় কি আর, রে॥
একবার দিনে, যদি ভাব মনে,
শ্যামাচরণ সার, রে॥

জনমে জনমে হইয়ে দৈন্য, গতায়াত কর চরণ ভিন্ন ;
যে দেখ অন্য সকল শূন্য,
কেবল অন্ধকার, রে ॥
কিবা নীচ জাতি কিবা দ্বিজরাজ,
প্রকাশে সকল হৃদয় মাঝ ;
জ্ঞান নয়নে দেখে যেই জনে,
সে ধরে ভুবন ভার, রে ॥
কমলাকান্ত করে নিবেদন,
কালীর তনয়ে কি করে শমন ;
ভুলনা রে মন ! অভয় চরণ,
মিনতি রাখ আমার, রে ॥ ১৭৫

খট্—জলদ্ তেতালা।

কালী কালী রট, কালী কাল নিবারিণী।
কালী জানে গতি তোর, রে মানসা ॥
কলি কলুষার্ণব তারণ তরণী।
দীন জননী শরণাগতপালিনী ॥
জন্ম মৃত্যু জরা, ব্যাধিহরা শিবকরা,
তারা ব্রহ্মময়ী পরা, পরমানন্দদায়িনী।
কমলাকান্ত মানস তম নাশিনী !
ত্রাণ কারিণী জানি, ভবভয়হারিণী ॥ ১৭৬

গৌরী—জলদ্ তেতালা।

ওরে মধুকর রে! মজিলে কি রসে।
হেরিয়ে না হের মা মোর, সুধা বরিষে॥
ত্যজি পরম রস, হইয়ে ইন্দ্রিয় বশ,
আপনার অলসে।
অচেতন মূঢ় সম, মিছা আশে সদাভ্রম,
কমলে নির্ম্মল প্রেম, রাখিবে কিসে॥ ১৭৭

বাহার—জলদ্ তেতালা।

মন রে! শ্যামাচরণ কর সার, আরে মন!
দেখি ভাল রবিসুত কি করে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি, শ্রীচরণে সঁপিলাম,
দেখি কিসে পরাভব করে আমারে, রে!
রবি শশী অনল অচল অনিলে যদি,
যোজয় দিবানিশি কাল গণনা কে করে।
দণ্ড অখণ্ড সদৃশ পরমানন্দে তোর
অন্তরে আনন্দময়ী বিহরে॥
কমলাকান্ত অলস যদি সাধনে,
অনায়াসে সারে কালীনামব্রহ্ম রটরে।
বিরমত্ত রঙ্গে সঙ্গে অণিমাদয়,
তৃণ গণি শমন সঙ্কটে রে॥ ১৭৮

খট্ যোগিয়া—জলদ্ তেতাল।

আমার মন উচাটন কেন হয়, মা!
স্থিরত না রহে তব শ্রীচরণে।
মাতিল মাতঙ্গসম গো! অঙ্কুশ না মানে॥
জনমে জনমে কত, করিয়ে কঠিন ব্রত,
পেয়েছি পরম পদ, মা! পরম যতনে॥
পাইয়া অমূল্য নিধি, হেলায় হারালাম যদি,
কি কাজ ঐহিক সুখে মা! ধিক্ এ জীবনে, গো॥
না জানি সাধন বিধি, হৈয়েছি মা অপরাধী;
সে কারণে মম মন, চঞ্চল সঘনে।
কাতর হোয়েছি অতি, স্থির কর মম মতি,
কমলাকান্তের প্রতি মা!
হের গো নয়নে॥ ১৭৯

পরজ—জলদ্ তেতালা।

নীলকান্ত কান্তি * কলেবর শ্যামা!
কুরু তাণ্ডব মম হৃদয়ে, গো মা।
সুরতরু মূল, রতন ময় ভবনে,
পরমানন্দ নিলয়ে, গো॥
নব কুসুমালয়, কুঞ্জ প্রকাশয়,
নাশয় তিমির চয়ে॥
কমলাকান্ত সফল কুরু মানস,
ত্রাণ কর এভব ভয়ে, গো॥ ১৮০

* পাঠান্তর—'কান্ত'।

মুলতান—একতালা।

তারা! অকিঞ্চনের ধন, তব শ্রীচরণাম্বুজ।
হে মা! চেয়েছে যেজন, পেয়েছে ওধন,
আমি তা পাব না কেন?
আমার বোলে আমি চাই,
নইলে ভার দিতাম নাই।
পিতামহ ধন, ত্যজে কোন জন,
পুরাণে একথা মান॥
কমলেরে বারে বার, বঞ্চনা না সহে আর;
এ বড় প্রমাদ, শিব সঙ্গে বাদ,
সে ভয়ে কাঁপিছে প্রাণ॥ ১৮১

গুজ্জরি টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

অভয়ে! দেহি শরণং, করুণাময়ী! কাতরে,
অনুগত জন প্রতিপালিনি, গো॥
ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে,
ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনি, গো॥
ত্রিভুবন সৃজন পালন লয় কারিণি,
শ্রুতি স্মৃতি গতি দায়িনি।
কমলাকান্ত প্রমোদ প্রদায়িনী,
চন্দ্রচূড় হৃদি চারিণি, গো॥ ১৮২

খাম্বাজ—একতালা।

মা! গুণময়ি গুণময়, করুণাময়ি করুণাময়,
দীন দয়াময়ি দীন দয়াময়॥
সদানন্দময়ী চিদানন্দময়, * প্রেমময়ি প্রেমময়,
জ্ঞানময়ি জ্ঞানময়, কৃপাময়ি কৃপাময়॥
ত্রিজগতময়ি ত্রিজগতময়, ত্রিভুবনাশ্রয়ি ত্রিভুবনাশ্রয়,
সুখময়ি সুখময়, ভুবন বিজয়িনি, ভুবন বিজয়।
পরব্রহ্মময়ি পরব্রহ্মময়, মনোময়ি মনোময়,
কমলাকান্ত কমল হৃদয়,
প্রকাশয়, কুরু জ্ঞানারুণোদয়॥ ১৮৩

অহং খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

করুণাময়ি! দীন অকিঞ্চনে বারেক হের, মা॥
তুমিত যশদা, মগনা সুধানন্দে,
কালীতনয় ত্রাসিত এভব বন্ধনে॥
আমি যে শুনেছি তব, পতিত পাবনী নাম,
দয়াময়ী দীন তারণে।
কমলাকান্ত ক্রিয়াহীন পতিতে,
ত্রাহি কৃপা অবলম্বনে, গো॥ ১৮৪

সুরট—জলদ্ তেতালা।

করুণাময়ি কালি! করুণাধন কোথা থুলে
দীন হীন দেখে, দয়াময়ি! দয়া পাসরিলে॥

---

* পাঠান্তর—'সদানন্দময়া'।

পুরাণ সম্মত যত কলিযুগ বর্ণন,
যতনে করেছি আমি সব প্রতিপালন।
কলিজয়ী কালীনাম, চরণে পরম ধাম,
এ যদি প্রমাণ তবে কেন কৃপা না করিলে॥
পেয়েছি পরম ভয়, হৈয়েছি মা নিরাশ্রয় ;
খেয়েছি বিষয় মধু, রয়েছি মা ভ্রমে ভুলে।
কমলাকান্তের গতি, বুঝিলাম কঠিন অতি ;
পতিতপাবনি যদি, পতিতে নিদয় হৈলে॥ ১৮৫

রামকেলী—একতালা।

কালি ! কেনে করিলে এ কাল যন্ত্রণা, গো !
আশুতোষ জায়া, হইয়ে নিদয়া,
পরিহরি করুণা॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি গো আদি,
সগুণাগুণ তুমি অনাদি ;
তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান যন্ত্র, তোমারি মন্ত্রণা॥
বিষয় আশে মনসি ত্রাস,
পরমালয় সুখ নিবাস ;
দুখ বিনাশ সুখ প্রকাশ, পূরয় বাসনা॥
কমলাকান্ত ওপদে নম্র,
তব সাধন না জানে মর্ম্ম ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটালে কর্ম্ম, একি প্রবঞ্চনা॥ ১৮৬

পরজ কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

আনন্দময়ি ! তার,
গো সকরুণ নয়নে চাও, মা !
এতনু দহে বিষয়ানলে,
তাপিত তনয়ে জুড়াও, গো ॥
ত্রিভুবন তারণ কারণ তারানাম,
নিজগুণে পতিতে তরাও ॥
কমলাকান্তে ক্রিয়া বিহীনে আর,
কেন মিছে ভ্রমণে ভ্রমাও ॥ ১৮৭

অপ্রকাশিত পদাবলী *

১

মূলতান—কাওয়ালি।

এই সময় ভজরে মন তারা।
গেলে এ সময়, হবে অসময়,
তখন স্থূলে ভুলে মূলেরে হইবি দিশেহারা॥
সময়ে সকলি হয়, অসময় অনর্থময়,
রিপু ছয় মাঝে আছ ঘেরা;
কাল ফিরিছে অনু, § জীর্ণ করিছে তনু,
বয়ে গেলে দিন, হবি পরাধীন,
তখন হবি ভ্রান্ত নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ে সারা॥
সম্পদে বাড়িবে সুখ, কালি বই পরশু দুখ,
দুখের উপর দুখ যবে জরা;
এখনো উপায় আছে, কমলাকান্তের কাছে,
রঙ্গে রসনা, মা'রে ডাকনা,
তবে পাবে মুক্তি, শিব-উক্তি, ভজিলে ভবদারা॥ ১৮৮

* বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেড়তলা নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ তিতার্থ মহাশয়ের নিকট হইতে এই দুইটী পদাবলী ১৩২৮ সালের ১৫ই ভাদ্র তারিখে ইয়াছি। গ্রন্থকার।

§ অনু—পশ্চাৎ।

২

মুলতান—কাওয়ালি।

মন, কি ভয় ভব-সঙ্কটে।
কর সম্পদ, মায়ের শ্রীপদ, যে ভাবে তারাপদ,
তার আপদ কি ঘটে॥
হর-আরাধিত ধন, শরণ লওরে মন,
না যাবে শমন সন্নিকটে ;
কর, কালীপদে দেহ দান, কালীনামামৃত পান,
হলে কালাকাল, কি করিবে কাল,
কালে যদি রসনাতে কালী কালী রটে॥
ভেবনা ভব দুস্তার, দুস্তার হইতে পার,
কর্ণধার কালী আছেন তটে ;
তিনি, দিয়ে শ্রীচরণ তরি, তরাইবেন ত্বরা করি।
তরিবে রঙ্গে, ভব-তরঙ্গে,
কমলাকান্তের মন থাকো অকপটে॥ ১৮৯

৩

কালী কি তোর সকলই ভ্রান্ত,
ঐ দেখ পদতলে তোর পড়িয়ে কান্ত।
ভিক্ষা মাগি মা যুড়িয়ে কর,
নৃত্য করোনা শিবের (ই) উপর,
ওমা, বুঝি মল ত্রিপুরারি,
ত্রিপুরা সুন্দরি, ক্ষেমঙ্করি,
একবার হওমা ক্ষান্ত॥

ওগো পতিহন্ত্রী হ'লি,
নিজ পতি মা (র) লি,
পশুপতির বুঝি হ'ল প্রাণান্ত ॥
শিবনিন্দা শুনে করেছিলে রাগ,
(ওমা) অনুরাগে তনু করেছিলে ত্যাগ,
(ওগো) সেই ত্রিলোচন,
কর বিলোকন,
দিগম্বরে একবার হওমা শান্ত ॥
কমলাকান্তের মনের বাসনা,
সকলইত জান ওমা শবাসনা,
কেন বা এসব করিছ ছলনা,
এইবার বুঝি হ'ল চূড়ান্ত ॥ * ১৯০

সমরসঙ্গীত

মালকোষ—জলদ্ তেতালা।

আগো শ্যামা গো ! আপনি হয়েছ দিগম্বরী শ্যামা,
দিগম্বর হরোপরে, মা ॥ আস্থাই ॥
এ কেমন পাগলীর বেশ, আলায়ে পড়েছে কেশ,
কত নাচ লম্বিত-চিকুরে, গো আগো মা ॥ ১॥ অন্তরা ॥

---

* এই গানটী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত মৃজাপুর গ্রাম নিবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় বহুপূর্ব্বে জনৈক প্রাচীন গায়কের মুখে শুনিয়াছিলেন। বিগত ২৫শে পৌষ (১৩২৮ সাল) তিনি আমাকে ইহা পাঠাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার।

বুঝিলাম ব্যবহার, যত দেখি পরিবার,
উন্মত্ত হইয়া নাচে, বাস না সম্বরে।
কমলেরে এই বিধি, নিকটে রাখিবে যদি,
তবে দিগম্বর কর মোরে, গো ॥ ২ ॥ অভোগ ॥ ১৯১

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

আজ্ কেন লোল রসনা বিবসনা
শবাসনোপরে,
হর উরে কি কর জননি।
গলিত অম্বর কেশ, ধরেছ মা কেমন বেশ,
পদভরে কম্পিতা ধরণী ॥ আস্থাই ॥
নরকর শির হার,
একি তব অলঙ্কার,
কি কারণে না পর অম্বর হেমমণি।
ত্যজি মণি মন্দির,
কেন মা শ্মশানে ফের,
উন্মত্তা যেন পাগলিনী ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
ক্ষণে ক্ষণে হুহুঙ্কার,
ধরাতে না সহে ভার,
কম্পিত হয়েছে সহকরি কূর্ম্ম ফণি।
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি,
হর উরে ধীরে ধীরে নাচ, গো জননি। ২ ॥ অভোগ ॥১৯২

ঝিঝিট্—ঢিমা তেতালা।

আসব অলসে দিগবাসে, নাচে কার মেয়ে।
এ নব বয়সে, কে সমর বেশে, খল খল হাসে,
ভাষে মাভৈ মাভৈ রব ॥
আবৃত কুন্তল জালে, নরকর শির মালে ;
কি কারণ পদতলে, শব ছলে সদাশিব ॥
জিনি দলিত অঞ্জন, তনুরুচি নবঘন ;
বালারুণ জিনি, ত্রিনয়নীর ত্রিনয়ন।
কমলাকান্ত আরাধিত শ্রীচরণ, কামিনী কেমন,
নৃপ ! কর দেখি অনুভব ॥ ১৯৩

খট্—জলদ্ তেতালা।

ও রমণী কালো এমন রূপসী কেমনে।
বিধি নিরমিল নব নীরদ বরণে ॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, দশনে দামিনী খসে,
কত সুধা ক্ষরে বামার ও বিধুবদনে ॥
সিন্দূর বর দিনকর সম শোভা,
অম্বুজ বদন মদন মনোলোভা।
তপন দহন শশী, উদয় হয়েছে আসি,
সত্ত্ব রজ স্তম গুণ অরুণ নয়নে ॥
নাভি সরোবর নীরজ বিহারে।
ঈষদ বিকচ কমল কুচভারে ॥
গলিত কুন্তল জাল, গলে নর মুণ্ডমাল।
শবশিশু শোভে মায়ের যুগল শ্রবণে ॥

চারুচরণ যুগ আভরণ বৃন্দে,
নখর মুকুর কর হিমকর নিন্দে।
কমলাকান্ত হেরি, রূপ অতি মাধুরী,
শরণ লইল শ্যামার সুনির্ম্মল চরণে॥ ১৯৪

ভেটিয়ার—ঠুংরি।

কালোরূপে রণভূমি আলো করেছে;
মোহিনী কে রে!
সমরে রে! কার বালা, নয়ন বিশালা;
বদন করালা, নরশির মালা পরেছে॥
শবাসবে ঘোর রবে শিবা নাচিছে।
তার মাঝে মায়ে অট্ট অট্ট হাসিছে॥
শিবসম শবহৃদে পদ থুয়েছে।
নিকর চিকুর জাল, আলুয়ে দিয়েছে॥
কমলাকান্তের মন, মগন হয়েছে।
অনিমিকে দুটি আঁখি, ভুলিয়ে রোয়েছে॥ ১৯৫

পরজ—জলদ্ তেতালা।

কি আগো শ্যামাসুন্দরী, মন মোহিলে,
অপরূপ দেখ ভূপ বামা কে সমরে॥ আস্থাই
ষোড়শী মনসি নিবসন্তে বামা,
গুণময়ি গুণে বান্ধিলে॥ ১॥ অন্তরা॥

কমলাকান্ত দিতি * কুল আকুল,
দিবানিশি সমর † করিলে।
কিম্পর সুরগণ, হরিলে হরের মন,
চরণ হৃদয়ে ধরিলে ॥২॥ অভোগ ॥ ১৯৬

ভেটিয়ার—ঠুংরি।

কেমন বেশ ধরেছ, জননি!
হর উরোপরে উলঙ্গ মোহিনী, মা ॥
আসব আনন্দ হ্রদে মগনা হয়েছ, গো মা! আস্থাই
চমরী গঞ্জিত কেশ, আলুয়ে দিয়েছ।
নব জলধর কায়, রুধিরে ঢেকেছ ॥১॥ অন্তরা ॥
আপনার রঙ্গরসে, আপনি মজেছ।
নরকর শিরোহার, ভূষণ করেছ ॥ ॥২॥ অন্তরা ॥
ভূতপ্রেত দানা সেনা সঙ্গেতে লয়েছ।
কমলাকান্তেরে কেন, পাসরে রয়েছ, গো মা!
॥৩॥ অন্তরা ॥ ১৯৭

কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

কে রে বামা! হর হৃদিপরে নগনা।
আনন্দে নাচিছে কত বাজিছে বাজনা ॥ আস্থাই ॥
ভুবন আলো নীল চান্দে,
মুক্তকেশ নাহি বান্ধে,
আপনার রঙ্গরসে, আপনি মগনা ॥১॥ অন্তরা ॥

---

* পাঠান্তর—'তিমির'।
† " —'সম'।

কে কোথা দেখেছ ভাই,
নয় বশ * এক ঠাঁই,
চঞ্চলা কি ধীরা কিছু জানা গেলনা।
কালো কি উজ্জ্বল তনু,
শশী কি নির্ম্মল ভানু,
ওরূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা ॥২॥ অভোগ ॥
বিধুমুখে মৃদু হাসে
সদা সুধানন্দে ভাসে,
হেরিলে না রহে যম জনু † যাতনা।
ওরূপ অন্তরে রাখি,
হৃদয় মাঝারে দেখি,
কমলাকান্তের এই মনের বাসনা ॥৩॥ অভোগ ॥১৯৮

খট্ কালাংড়া—পোস্ত।

কেরে ! পাগলীর বেশে, দিগবাসে,
কার রমণী।
চিকুর আলুয়েছে, হইয়াছে বিবসনী ॥ আস্থাই ॥
নরকর কোমরে, বাম করে অসি ধরে ;
দশনে চমকিত, লোল রসনা বদনী ॥১॥ অন্তরা ॥
ও বিধুবদনে হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি ;
ঐ বেশে নিস্তারিবে, কমলেরে গো জননি ॥২॥ অন্তরা ॥১৯৯

* পাঠান্তর—'নবরস'।
† " 'যম তনু'।

মুলতান—আড়া।

বামা কেরে এলো চিকুরে,
বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদিপরে।
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে টলে প'ড়ে আসব ভরে।
যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হস্তদিতি সুতচয়,
স্পর্শমাত্র শিব হয় সমর মাঝারে।
কমলাকান্তের ভাষি, সর্ব্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে॥ ২০০

ইমন্—একতালা। *

কে রে রণমাঝে, এ কার বামা রণ-সাজে।
আলুলিতকেশী বিবসনা বামা।

---

* এই পদাবলীর ভণিতা পাওয়া যায় নাই। ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত "সঙ্গীত মুক্তাবলীর" ৫৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 'সাধক সঙ্গীতের' (১ম সংস্করণ) ৪০ পৃষ্ঠায় এই গানটী এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

'আলুলিতকেশী বিবসনা বামা।
শবশির মালা গলে অনুপমা,
শবশির করে নাচে শবোপরে.
শ্রুতিমূলে শবশিশু শোভিছে॥
রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত আঁখি,
সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি।
বিদ্যুৎ আকার শোণিতের ধার,
জলদবরণী সাজে।'

(ভণিতা নাই)

নরশির মালা গলে অনুপমা।
শব শির করে নাচে শবোপরে।
শ্রুতিমূলে শবশিশু শোভিছে॥
রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত আঁখি,
সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি,
বিদ্যুৎ আকার শোণিতের ধার,
জলদ বরণী সাজে॥ ২০১

আড়ানা—জলদ্ তেতালা।

গিরিরাজনন্দিনী, অসুরনাশিনী,
অভয় দায়িনী, সুরগণে:
তিনলোকপালিনী, মহিষমর্দ্দিনী,
পাতিততারিণী, ত্রিভুবনে॥ আস্থাই॥
অতি গম্ভীর নাদ বিবাদ সুররিপু,
দৈত্যসুত, সব রিপু সনে।
সুরাসুর নাগ নরগণ চরণ সেবিত,
সমর ক্ষেত্র সুজঘনে॥ * ১॥ অন্তরা॥
ত্রিগুণধারিণী, তুমি তারা ত্রিনয়নী,
ত্রিজগত শুভে শুভদায়িনী।
প্রমথ সঙ্গ, বিরাজ ভবভয়,
ঘোর তিমির বিনাশিনী॥২॥ অন্তরা॥

* পাঠান্তর—'সমররঙ্গিনী বিবসনে।'

কমলাকান্ত পতিতে নিতান্ত,
শরণ দেহি শিবে! তব শ্রীচরণে।
শমন দুরন্ত, অতি বলবন্ত,
মিনতি অনন্ত, হের তারা!
ত্রিনয়নে ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥ ২০২

গৌরী—জলদ্ তেতালা।

জলদবরণী কে রে! ও বামা নয়ন ভুলায়, রে।
সদাশিব হৃদে চরণ দোলায় রে॥
দিগম্বরী এলোকেশ, তথাপি মোহিনীবেশ,
নিরখিলে জীবন জুড়ায়।
কমলাকান্তের চিত্ত, কালোরূপে অনুগত,
পাশরিলে পাশরা না যায়, রে! ॥২০৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

তোমার গলে জবা ফুলের মালা,
কে দিয়াছে তোমার গলে:
যত সমর পথে, নেচে যেতে,
রয়ে রয়ে রয়ে দোলে ॥ আস্থাই ॥
রণতরঙ্গ প্রমথ সঙ্গ,
চিকুর আলায়ে উলঙ্গ,
কি কারণে লাজ ভঙ্গ, শিব তব পদতলে ॥ ১ ॥ অন্তরা
অভয় বরদ সব্য হস্ত,
বাম করে শিরসি অস্ত্র,

দেখে সুরগণ হয়ে ব্যস্ত, রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলে ॥২॥ অন্তরা ॥
মুকুট গগনে ঘোর বরণ,
খল্ খল্ হাসি তিমির হরণ,
কমলাকান্ত সতত মগন, শ্রীচরণ কমলে ॥ ৩ ॥ অন্তরা ॥ ২০৪

মল্লার—একতালা।

দেখনা! সমর আলো করে কার কামিনী।
কেরে সজল জলদ জিনিয়ে কায়, দশন মধ্যে * দামিনী ॥ আস্থাই ॥
আলিয়ে চাঁচর চিকুর পাশ,
সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে, দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু,
ঘন তনু ঘেরি কুমুদ বন্ধু,
অমিয় সিন্ধু, হেরিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন্ মোহিনী ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
একি অসম্ভব, ভবপরাভব,
পদতলে শবসদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে
বটে ও গজগামিনী ॥ † ৩ ॥ অভোগ ॥ ২০৫

পুরবী—একতালা।

পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে, রে! আস্থাই
বিবসনা সমরে, নরকর কোমরে,

* পাঠান্তর 'দশনে প্রকাশে।'

† ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এই গানটি গাইতেন।

অসিবর বাম করে ধরে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজে,
হরহৃদি পরে শ্যামা বিরাজে,
রণ সমাজে, না করে লাজে,
কুল রমণী বামা কে এলো রে ॥
মৃদু মৃদু হাসে, চপলা প্রকাশে,
কমলেরি আশ পূরে ॥ ১ ॥ অভোগ ।২০৬

পরজ —একতালা ।

বামা কেরে দেখনা চাহিয়ে, সমরে শঙ্করোপরে ।
প্রকৃতি অসিতাঙ্গধারিনী, সমরে বিহরে ॥ আস্থাই ॥
অশ্রুতি পথ গত তরঙ্গ,
অসি শিরধৃত বাম অঙ্গ,
প্রমথ সঙ্গ বামা উলঙ্গ, অভয় সঞ্চরে ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
আনন্দে অনাদি হৃদয় নিবসয়ে বিবস্ত্র,
কালী কেন সমর ঘোরে, অমর শরণাগত নথরে ॥ ২ ॥ অন্তরা ॥
দিগ দিগন্তে সম কৃতান্ত,
হেরি বামা শ্যামারূপ নিতান্ত,
হেরি বয়ান মুদি নয়ন, নিরখি অন্তরে ।
কমলাকান্ত আশ্রিত চরণারবিন্দ হেরি কৃতার্থ,
রণ অসার্থ কর অনর্থে চরণে শরণ লহরে ॥ ৩ ॥ অভোগ ; ২০৭

পরজ—জলদ্ তেতালা।

বামার বয়স নবীন।
না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ ॥ (স্থায়ী) আস্থাই ॥
সুচারু অঙ্গেরি শোভা কটিতট ক্ষীণ।
সুরাসুরগণ মাঝে বসন বিহীন ॥ ১ ॥ অন্তরা ॥
বুঝি এলো দয়াময়ী হইয়ে কঠিন।
চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভদিন ॥ ২
তনু দিয়া তরে কত শত ক্রিয়াহীন।
কমলাকান্তের হরে মনের মলিন ॥ * ৩॥ অভোগ ॥২০৮

মল্লার—জলদ্ তেতালা।

বারে বারে শ্যামা! কত নাচ গো।
বিবসনী বাস না সম্বর, ও মা হরোপরে
নগনা হইয়ে আছ, গো ॥
খরতর অসিবর বাসকরে ধৃত,
কুন্তলভার কি কারণ লম্বিত;
পদভরে ধরাধর থর থর কম্পিত,
অমরে আনন্দ বর যাচ, গো ॥
শুভবর প্রার্থিত সুরনর মুনিগণে,
দনুজতনয় কুল কম্পিত জীবনে;
কমলাকান্ত নিবেদন শ্রীচরণে,
কাতর তনয়ে কালি ভুলেছ, গো ॥২০৯

---

* বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত "কমলাকান্ত পদাবলী" গ্রন্থে এই পদটী বর্দ্ধমানে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থকার।

বসন্ত—ধামার।

ভৈরবী ভৈরব জয় কালী কালী বলি নাচত সমর সুধীর।
সমর তরঙ্গ বিরাজয়ি শঙ্করী, সুখদ বসন্ত সমীর॥ ১॥ আস্থাই॥
যেই ব্রহ্ম ভূমিপতি ব্রহ্মবধূগণ দেয়ত শ্রীঅঙ্গে আবীর।
সেই তনু শ্যামারূপা যোগিনী সঙ্গে, খেলত রঙ্গ রুধির॥ ১॥ অন্তরা॥
বিপরীত রঙ্গে, শ্রম জল অঙ্গে, সুধাময় সিন্ধু গভীর।
তরুণ বয়সি তরুণ শিব তরিপর পুলকিত শ্যামা শরীর॥ ২॥ অন্তরা॥
ক্ষিতিতল চুম্বিত কেশ দিগম্বরী, ভূষণ নরকর শির।
কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি, বরিষয়ে আনন্দ নীর॥ ৩॥ অভোগ। ২১০

কালাংড়া—একতালা।

রঙ্গিণী রণমাঝে, বিহরে শ্যামা, গো॥ আস্থাই॥
রতন নূপুর, বাজে সুমধুর, হর হৃদি চরণ বিরাজে॥ ১॥ অন্তরা॥
বাজি ধরি ধরি, বয়ানেতে পূরে,
গরাসে বারণ দারুণ সমরে।
সঙ্গে সহচরী, নাচে দিগম্বরী,
রণজয়ী মাদল বাজে॥ ২॥ অভোগ॥
নব জলধর, বরণ সুন্দর,
ধরণী চুম্বয়ে লম্বিত চিকুরে।
কমলাকান্তের, মন মধুকর,
মগন চরণ সরোজে॥ ৩॥ অভোগ॥ ২২১

সিন্ধু—পোস্ত।

রঙ্গে নাচে রণ মাঝে, কার কামিনী মুক্তকেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি॥ আস্থাই॥
কে রে! তিমির বরণী বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥ ১॥ অন্তরা॥
বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি।
স্থাথ শবছলে চরণতলে, আশুতোষ পড়িল আসি ২॥ অন্তরা॥
কে রে! ডাকিনী যোগিনী, মায়ের সঙ্গে ফেরে অহর্নিশি।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, দিতির নন্দন নাশি॥ ৩॥ অন্তরা॥
কমলাকান্তের মন, অন্য নহে অভিলাষি।
আমার কালিরূপ অন্তরে ভেবে, সদানন্দ সদা খুসী॥ ৪॥ অন্তরা॥ ২১২

পুরবী—একতালা।

শঙ্কর উরে বিহরে শ্যামা রঙ্গিণী।
সৌদামিনী সহিত,
সুধাংশু মিলিত,
নীল কাদম্বিনী॥ আস্থাই॥
না বাঁধে চিকুর না পরে বাস,
ও বিধুবদনে মধুর হাস,
চিন্তামণি নিলয়ে প্রকাশ,
সশিব শিব নিতম্বিনী॥ ১॥ অন্তরা॥
তারণ কারণ চরণ যন্ত্র,
যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত,
ও নিতান্ত শান্ত করে কৃতান্ত,
কমলাকান্ত বন্দিনী॥ ২॥ অন্তরা॥ ২১৩

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

শিব হৃদে নাচিতে নাচিতে, চিকুর এলুলো।
প্রেমাবেশে শ্যামাতনু অবশ হইল ॥ আস্থাই ॥
কে রে অকলঙ্ক বিধুমুখী,
সুধাপানে অতি সুখী,
নিরখি জীবন জুড়ালো।
আসব অলসে শ্যামার বসন খসিল ॥ ১॥ অন্তরা ॥
সুধাময় সিন্ধু শিব উরে,
অখণ্ড আনন্দ-নীরে,
সুখের তরণী ভাসিল।
হেরিয়ে নয়নমন, ভুলিয়ে রহিল ॥ অন্তরা ॥
একি অপরূপ নিরূপমা,
নিরঞ্জনী নিরাকারা,
নিজ গুণে প্রকাশ হলো।
কমলাকান্তের মনস্কামনা পূরিল ॥ ৩॥ অন্তরা ॥ ২১৪

ভৈরবী—একতালা।

শিব উরে বিহরে শ্যামা সমরে।
মরি বাম করে ধরি অসিবরে,
বিগলিত চিকুরে, রে ॥ আস্থাই ॥
নূতন জলধর রূপ ধরে,
কত সুধাকরে উদয় করে,
পদ নখরে।
কমলাকান্তের হৃদি কমলবরে,
তিমির হরে ॥ অন্তরা। ২১৫

ঝিঝিট্‌—ঢিমে তেতালা।

শুনি সুমধুর নূপুর ধ্বনি, শ্রবণে।
হর হৃদিপর নাচে ত্রিগুণ জননী॥ আস্থাই॥
আসব আনন্দ ভরে, নিজ তনু না সম্বরে,
বিহরে শঙ্কর উরে শঙ্করমোহিনী।
যেন সুধাসিন্ধু নীরে নীল কমলিনা॥ ১॥ অন্তরা॥
গগন ত্যজয়ে বিধু, পিয়ে পদাম্বুজ মধু,
শ্রীচরণ নখারুণে হৈয়া দশখানি।
কমলাকান্তের গতি জলদ বরণী॥ ২॥ অন্তরা॥ ২১৬

সুরট্‌ মল্লার—একতালা।

সমরে বিহরে, রে! কার্‌ বামা রিপু নাশে, রে।
বামা লম্ফ দিয়ে দম্ফ কোরে, ক্ষেপা পারা হাসে, রে। আস্থাই॥
এলোথেলো চাচর চুল, তায় দিয়েছে জবাফুল;
নাশিছে দানব কুল, সুধায় দুকুল ভাসে, রে॥ অন্তরা॥
সঙ্গে যত সহচরী, এলোথেলো দিগম্বরী;
কাটামুণ্ড তুণ্ডে করি, বেড়ায় পাশে পাশে, রে!॥ অন্তরা॥
কমল কহে কাজল বরণ,
অভয় পদে যে লয় শরণ;
কালীনামে কাঁপে শমন,
ত্রাসে না যায় পাশে, রে॥ অন্তরা॥ ২১৭

আগমনী

ঝিঝিট্—জলদ্ তেতালা।

কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি
কি আনন্দ আমার।
হিমগিরি হে! জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে;
আধ আধ মা বলে, বচন সুধাধার।
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার।
গিরিরাজ॥
ভিখারী যে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখন মনে, কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখর মণি;
বিলম্ব না কর আর, হে গৌরী আনিবার।
দূরে যাবে সব দুঃখ, মনেরি আন্ধার।
(গিরিরাজ)॥ ২১৮

টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

যাও গিরিবর হে! আন যেয়ে নন্দিনী,
ভবনে আমার॥
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘরে,
কি কঠিন হৃদয় তোমার, হে॥
জানত জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত,

পরিধান বাঘাম্বর
শিরে জটাভার।
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তাঁরে,
কত আছে কপালে উমার॥
শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা ছাই;

গলে ফণি হার।
একথা কহিব কায়, সুধা ত্যজি বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন বিচার॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল শিরোমণি,
শিবের যেমন রীতি, বুঝিতে অপার।
চরণে তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার,
এনে উমা না পাঠাব আর॥ ২১৯

সুরট্ সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

ওহে গিরিরাজ! গৌরী অভিমান করেছে;
মনোদুঃখ নারদে কত না কয়েছে॥
দেব দিগম্বরে,
সোঁপিয়া আমারে,
মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে॥
হরের বসন বাঘ ছাল, ভূষণ হাড় মাল,
জটায় কাল ফণি দুলিছে।
শিবের সম্বল, ধুতুরারি ফল,
কেবল তোমারি মন্ ভুলেছে।

একে সতিনের জ্বালা, না সহে অবলা,
যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।
তাহে সুরধুনী, স্বামী সোহাগিনী,
সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে॥
কমলাকান্তের নিবেদন ধর,
একথা মোর মনে লৈয়েছে।
তুমি শিখর মণি, তোমার নন্দিনী,
ভিখারীর ভিখারিণী হয়েছে॥ ২২০

বেহাগ—তিওট।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে
এই, এখনি শিয়রে ছিল,
গৌরী আমার কোথা গেল,
হে! আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃত রাশি, সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি,
চেতনে হারালাম্ গিরি,
হে! ধৈরয না ধরে মম জীবনে॥
আর শুন অসম্ভব, চারিদিকে শিবা রব;
হে! তার মাঝে আমার উমা,
একাকিনী শ্মশানে।

বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার,
হে ! না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে ॥
কমলাকান্তের বাণী,
পুণ্যবতী গিরিরাণি, গো !
যেরূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে ।
ও পদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী, গো !
হর হৃদিমাঝে রাখে, অতি যতনে ॥ ২২১

কেদারা—একতালা ।

গিরি ! প্রাণগৌরী আন আমার ।
উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক,
এঘর লাগে আন্ধার ॥
আজি কালি করি দিবস যাবে,
প্রাণের উমারে আনিবে কবে ;
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে,
একি তব অবিচার ॥
সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে,
সে শোকে রোয়েছি পরাণে ধরে ;
ধিক্ হে আমারে, ধক্ হে তোমারে,
জীবনে কি সাধ আর ॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত,
কেন্দনাকো রাণি হও গো ! শান্ত ;
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত,
তুমি কি ভাব অসার ॥ ২২২

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

কবে যাবে বল গিরিরাজ! গৌরীরে আনিতে
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে, হে॥
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥১॥ অভোগ॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে! পাষাণ তাহে, না কর মনেতে॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি!
কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে॥২॥ অভোগ॥ ২২৩

বাগেশ্বরী—জলদ্ তেতালা।

বল আমি কি করিব, কামিনী করিল নিদারুণ বিধি,
পরবশ পরের অধিনী।
আমার মন যাতনা কে জানিবে অন্তে,
আপনার মনোদুঃখ আপনি সে জানি॥
দিবানিশি বারে বার,
কতনা সাধিব আর,
শুনিয়ে শুনেনা গিরি শিখরমণি।
উমার লাগিয়ে, আমার প্রাণ যেমন করে,
কারে কব কেবা আছে দুঃখের দুঃখিনী॥
সুখে থাকুন গিরিরাজ, তাঁহার নাহিক কাজ!
আমিত ত্যজিব লাজ, শুন সজনি।

কমলাকান্তেরে লৈয়ে, বলগো কৈলাসে যেয়ে;
আপনি আনিব আমি, আপন নন্দিনী ॥ ২২৪

ললিত—জলদ্ তেতালা।

তাঁরে কেমনে পাসরে রয়েছো, গো গিরিরাণি !
সেতো সামান্ত মেয়ে নয় কনক প্রতিমা ॥
আমরা পরের নারী,
তাঁরে না দেখিলে মরি।
তুমি তাঁর জননী তাঁয় উদরে ধরেছো।
দেখেছি দিয়েছো যারে, জটিল দিগম্বরে,
তার কি ধন দেখিয়ে ঘরে, মেয়ে সঁপেছো।
পাষাণ শিখররাজ, তিলে না বাসয়ে লাজ ;
তুমি সেই পাষাণ দিয়ে, হিয়ে বেঁধেছো ॥
জনমে জনমে কত, করেছো কঠিন ব্রত,
অনেক যতনে গৌরী ধন পেয়েচো।
কমলাকান্তের বাণী, জাননা শিখরাণি,
ত্রিলোক জননী, তার জননী হয়েছো ॥ ২২৫

পরজ কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

বারে বারে কহ রাণি ! গৌরী অনিবারে।
জানত জামাতার রীত, অশেষ প্রকারে ॥ আস্থাই !
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী ;
ততোধিক শূলপাণি, ভাবে উমা মারে।

তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদিপরে ;
সে কেন পাঠাবে তাঁরে, সরল অন্তরে ॥ ১ ॥ অভোগ ॥
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান ;
দারুণ বিষের জ্বালা, না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্কর কায়া ;
সে অবধি শিব জায়া, বিচ্ছেদ না করে ॥ ২॥ অভোগ ॥
অবলা অলপ * অতি, না জান কার্য্যের গতি,
যাব কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ ;
তার্ মা বটে মানায়ে যদি,
আনিবারে পারে ॥ ৩ ॥ অভোগ ॥ ২২৬

বিভাস—ঢিমাতেতালা ॥

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে ॥ আস্থাই।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে,
ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে ॥
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব,
আজি তনু জুড়াইব, আনন্দ সমীরে ॥
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,
ঘরে আসি কি কব রাণীরে॥
দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা,
পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেমনীরে।

অলপ—পালি 'অপ্পো' হইতে। পদ্যে কোমল রূপ অলপ।

মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়,
উমারে আনিতে হবে ঘরে ॥
প্রবেশ কৈলাসপুরী, না ভেটিয়ে ত্রিপুরারি ;
গমন করিল গিরি, শয়ন মন্দিরে।
হেরিয়ে তনয়া মুখ, বাড়িল পরম সুখ ;
মনের তিমির গেল দূরে ॥
জগতজননী তায় প্রণাম করিতে চায় ;
নিষেধ করয়ে গিরি, ধরি দুটি করে।
কমলাকান্ত সেবিত তব শ্রীচরণ,
মা ! আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে ॥ ২২৭

যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর !
কর অনুমতি হর, যাইতে জনক ভবনে ॥
ক্ষণে ক্ষণে মম মন, হইতেছে উচাটন,
ধারা বহে তিন নয়নে ॥
সুরাসুর নাগ নরে, আমারে স্মরণ করে ;
কত না দেখেছি স্বপনে, যোগনিদ্রা ঘোরে।
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
মা দুর্গা বোলে ডাকে সঘনে ॥
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি,
কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ কব কায়,
বল প্রাণ ধরি কেমনে ॥

হউক্ নিশি অবসান, রাখ অবলার মান,
নিবেদন করি চরণে।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ! অনুচর,
বোল্যে যাই আসিব ত্রিদিনে ॥ ২২৮

ললিত যোগিয়া—তিওট।
ওহে হর গঙ্গাধর!
কর অঙ্গীকার,
যাই আমি জনক ভবনে।
কি ভাবিছ মনে মনে,
ক্ষিতি নখ লেখনে,
হয় নয় প্রকাশ বদনে ॥
জনক আমার গিরিবর, আসি উপনীত, আমাদের লইতে
আর তব দরশনে।
অনেক দিবস পর, যাইব জনক ঘর,
জননীরে দেখিব নয়নে ॥
দিবানিশি অবিরত, কান্দিছে জননী কত;
হে! তৃষিত চাতকীর মত, রাণী চেয়ে পথ পানে;
না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুঃখ,
না কহিলে যাইব কেমনে ॥
নাথ! পুর মন আশ।
না করহ উপহাস।
বিদায় করহঁ হর! সরল বচনে, হে।
কমলাকান্তেরে দেহ নাথ! অনুচর,
বলে যাই আসিব তিনদিনে, হে! ২২৯

মালসী—আড়া চৌতাল।

গিরিরাণী যন্ত্র সাধন মন্ত্র পড়ে, নানা তন্ত্র করিয়া বিচার।
বলে আজ্ আসিবে, আমার গৌরী গজানন,
কি শুভদিন গো আমার॥
কনক নির্ম্মিত কুম্ভ দিছে তাহে কুসুম চন্দন সার, গো রাণি।
আমন্ত্রি সুরগুরু, পূজয়ে নবতরু, যেমন আছে কুলাচার॥
মৃদঙ্গ মোহিনী, দুন্দুভি দরপিনী,
বাজিছে বিবিধ প্রকার গো গিরিপুরে।
নগর রমণী, উলু উলু ধ্বনি,
আনন্দে দিছে বারেবার॥
বিজয়া হেন কালে, আসি রাণীরে বলে,
বিলম্ব কেন কর আর গো রাণি।
কমলাকান্তের জননী ঘরে এলো, প্রাণের গৌরী তোমার॥ ২৩০

ছায়ানট—তিওট।

ওগো হিমশৈল গেছিনি, গো রাণি!
শুন মঙ্গল বচন,
এলো গিরি লয়ে প্রাণ উমারে॥
কি কর কি কর রাণি! শুন গো জয় জয় ধ্বনি,
আজি কি আনন্দ গিরিপুরে॥
দেখে এলাম রাজপথে. তোমার তনয়া দাঁড়ায়ে রথে,
গো! শ্রমবিন্দু মুখবরে!
বারেক সে মুখ চেয়ে, অমনি আইলাম ধেয়ে,
পুণ্যবতি! লইতে তোমারে॥

জয়া ! কি বলিলে আরবার বল,
আমার গৌরী কি ভবনে এলো
গো ! মরেছিলাম না দেখিয়ে তাঁরে।
কহিতে কহিতে রাণী, ধাইল যেন পাগলিনী,
কেশপাশ বাস না সম্বরে, গো ! ॥
দেখিয়ে সে চাঁদমুখ, রাণী পাশরিল সব দুখ,
গো ! কোলে নিল ধোরে ছুটি করে।
কমলাকান্তের বাণী, বিলম্ব না কর রাণি !
বরণ করিয়ে লহ ঘরে ॥ ২৩১

×

পরজ কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

এখনি আসিবে গো ! গিরিরাজ,
আনন্দে অভয়া লয়ে।
আজি জুড়াইব আঁখি, চল সখি দেখি গিয়ে ॥
মেনকা রাণীর দাসী, প্রতি ঘরে ঘরে আসি,
মনের তিমির নাশি, মঙ্গল গিয়েছে কয়ে।
তোমরা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেয়ো,
বরণ বরিয়ে রাণী, লবে গো আপনার্ মেয়ে ॥
নগর নিকটে শুনি, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি ;
ধাইল যত রমণী, সবে উন্মত্তা হৈয়ে।
সম্মুখে শঙ্করী রথ, হেরিয়ে যুবতী যত ;
পাশরিল মনোদুখ, বিধুমুখ নিরখিয়ে ॥

হেন কালে শৈল রাণী, এলো যেন পাগলিনী ;
মুখে নাহি সরে বাণী, রৈল ও চাঁদমুখ চেয়ে।
কমলাকান্তের ভাষা, পূরিল মনের আশা ;
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি, বিধি দিল মিলাইয়ে ॥ ২৩২

বিঝোড়া—জলদ্ তেতালা।

জয় জয় মঙ্গল বাজন, বাজে ঘনে ঘন ;
আগো রাণি ঐ এলো গিরি, রাণি গো !
গৌরীরে লয়ে ॥
কি কর শিখর রমণি ! গৃহ অন্তরে, না !
তনয়া দেখ না আসিয়ে ॥
শুনিয়ে জয়ার বাণী, অমনি ধাইল রাণী,
পুলকে পূর্ণিত হইয়ে।
ক্ষণে অচেতনা, ক্ষণে স্থগিত নয়না,
রাণী ক্ষণে ডাকে উমা বলিয়ে ॥
বাহির প্রাঙ্গণে আসি, দূরে গেল দুঃখরাশি,
উমাশশী মুখ হেরিয়ে।
ত্রিগুণ জননী, অনায়াসে গিরি গেহিনী,
কোলে নিল করে ধরিয়ে ॥
সারি সারি নারী ধায়, সবে সুমঙ্গল গায়,
কোলাহল রব করিয়ে।
কমলাকান্ত হেরি শ্রীমুখমণ্ডল,
নাচে করতালি দিয়ে ॥ ২৩৩

পরজ কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

এলো গিরিরাজ, রাণি! উমারে লইয়ে, গো।
কি কর কি কর গৃহে, কেননা আসিয়ে, গো॥
লম্বোদর কোলে করি,
আগে আগে ধায় গিরি,
ষড়ানন অঙ্গুলি ধরিয়ে।
তার পাছে উমা ধায়, তোমার মুখ চেয়েগো॥
সখীর বচন শুনি,
ধায় যেন চকোরিণী,
শশীরে ষোড়শী নিরখিয়ে।
তেমতি ধাইল রাণী, উনমত্তা হৈয়ে, গো॥
আঙ্গিনার বাহিরে আসি,
হেরি গৌরী মুখশশী,
কোলে নিল বরণ বরিয়ে।
পুলকে কমলাকান্ত, গিরিপুরে আনন্দ দেখিয়ে

বিভাস যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

এলো গিরি নন্দিনী,
লয়ে সুমঙ্গল ধ্বনি, ঐ শুন ওগো রাণি।
চল বরণ বরিয়ে, উমা আনি যেয়ে,
কি কর পাষাণ রমণি, গো!॥
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে,
ধাইল যেন পাগলিনী।

চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল,
অঞ্চল লোটায়ে ধরণী ॥
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে,
দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি, উমামুখ শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী ॥
গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী,
ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের, পুলকে অন্তর,
হেরি ও বিধুমুখ খানি ॥ ২৩৫

সুরট—একতালা।

আমার উমা এলো বলে, রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগরনাগরী, সারি সারি সারি, দৌড়ি গৌরী
মুখ পানে চায় ॥
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে ;
কার আধ শিরসি বেণী, কার আধ অলকাশ্রেণী ;
বলে চল চল চল, অচল তনয়া হেরি ওমা!
দৌড়ে আয় ॥
আসি নগরপ্রান্তে, তনু পুলকিত অনুরাগে ;
কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধর বারি ;
তখন গৌরী কোলে করি, গিরিনারী, প্রেমানন্দে
তনু ভেসে যায় ॥

কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর কিন্নরীগণ সাজে ;
কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরিপুর সহচরী সঙ্গে ;
আজু কমলাকান্ত, গো ! হেরি নিতান্ত,
মগ্ন দুটি রাঙ্গা পায় ॥ ২৩৬

পরজ কালাংড়া—ঢিমাতেতালা।

গিরিরাণি ! এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবন ধন ॥
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূল ধারী,
প্রাণ উমা আনিলাম নিজপুরে ॥
দেখো মনে রেখ ভয়, সামান্যা তনয়া নয়,
যাঁরে সেবে বিধি বিষ্ণু হরে।
ও রাঙ্গাচরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জ্জটি,
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে ॥
তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া,
ছায়ামাত্র জীবনাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, কালীতারা নাম ধরি,
কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে ॥
অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া ছলে,
ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে।
মেনকারাণি !
কমলাকান্তের বাণী ধন্য ধন্য গিরিরাণি !
তব পুণ্য কে কহিতে পারে ॥ ২৩৭

বিভাস—জলদ্ তেতালা।

এল আমার প্রাণেরো অধিক গো!
উমামুখ হেরিয়ে নয়ন জুড়াল গো॥
আজু মোর শুভদিন, হের ও বিধুবদন, মা!
মনের তিমির দূরে গেল, গো॥
সবে কয় মা! গিরিপুরে, হর কি মশানে ফিরে?
মা! শুনে বড় দুঃখ উপজিল, গো।
ভাল হল এলে তুমি, আর না পাঠাব আমি,
বুঝি বিধি প্রসন্ন হইল, গো!
আপনার অঞ্চলে রাণী, মুছায়ে চাঁদ মুখখানি,
প্রাণ উমা কোলেতে লইল, গো।
হেরিয়ে ও চাঁদমুখ, পাশরিল সব দুঃখ।
রাণী, সুখের সাগর উথলিল, গো॥
চারিদিকে পুরনারী, মাঝে রাণী কোলে গৌরী,
ভবজায়া ভবনে লইল।
কমলাকান্তের বাণী, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি।
গিরিপুরে কি আনন্দ হোলো, গো॥ ২৩৮

মালসী—তিওট।

এলে গৌরি! ভবনে আমার।
তুমি ভুলে ছিলে, মা বল্যে বুঝি এতদিনে।
চিরদিনে।
মায়ের পরাণ, কান্দে রাত্রিদিন,
শয়নে স্বপনে হেরি গো!
ওমুখ তোমার!

কত কামনা করিয়ে কাননে,
আমি রতন পেয়েছি যতনে ;
সচন্দন ফুলে, নব বিল্বদলে,
পূজেছিলাম গঙ্গাধরে, গো ! হৈয়ে নিরাহার ॥
গিরিপুর রমণী চারিপাশে,
কত কহিছে হাস পরিহাসে ।
তরু মূলে ঘর, স্বামী দিগম্বর,
তা নহিলে আর কতদিন হইত তোমার ॥
তুমি পুণ্যবতী গিরিরাণি !
শুন কমলাকান্তের বাণী ।
জগত জননী, তোমার নন্দিনী,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন গো ! চরণ যাহার ॥২৩৯

খট যোগিয়া—জলদ্ তেতালা :

শরত কমল মুখে, আধ আধ বাণী ! মায়ের ॥
মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখ ঈষদ হাসি,
ভবের ভবনসুখ ভণয়ে ভবানী ॥
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর,
মা ! জিনি কত সুধাকর,
শত দিনমণি ।
বিবাহ অবধি আর, কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥
শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয়,
মা ! তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী ।

মোরে শিব হৃদে রাখে,
জটাতে লুকায়ে দেখে,
কার কে এমন আছে সুখের সতিনী ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ রাণি !
কৈলাস-ভূধর ধরাধর চূড়ামণি ।
তা যদি দেখিতে পাও,
ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভবগৃহে, ভূধর রমণি ॥ ২৪০

সিন্ধু মুলতান—জলদ্ তেতালা ।

শুনেছি মা ! মহিমা তোমার, ওগো প্রাণ গৌরী
তুমি ত্রিভুবন জননী ॥
মোর মনে ভ্রান্তি, অভয়া নিজ নন্দিনী, মা !
কি জানি কুলকামিনী ॥
পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, তুমি তমোরজঃ সত্ত্ব
মাগো ! তুমি গুণময়ী গুণরূপিনী ।
নির্গুণ নিরূপ নিরঞ্জন বিভু তারে মা !
তব গুণে সগুণ গণি ॥
অবিদ্যা অপরা পরা, বিদ্যা তুমি পরাৎপরা,
মা গো ! তুমি বিশ্বময়ী বিশ্বকারিণী ।
যে জনা যে রূপে ভজে, মা তার হৃদয়াম্বুজে,
সেইরূপে গতি দায়িনী ॥
অসংখ্য তপের ফলে,
তোমাধন পেয়েছি কোলে,

মা গো! তুমি দয়াময়ী দুঃখহারিণী।
কমলাকান্তের গতি, হে মা! তব নাম,
ভব জলনিধি তরণী॥২৪১

খট যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

রাণী বলে জটিল শঙ্কর, কেমন আছো গো! হর,
চন্দ্রশেখর শূলপাণি, গো!॥
যে অবধি নয়নে, হেরিলাম ত্রিলোচনে,
আমি তোমার অধিক তাঁরে জানি গো!॥
তাঁর পরিধান বাঘছাল, আভরণ হাড়মাল,
মুকুট ভূষণ শিশুফণী।
জিনি রজতাচল, অতিশয় সুনির্ম্মল,
ভস্ম ভূষিত তনুখানি॥
আমার শপথ তোরে, স্বরূপে কহ না মোরে,
* প্রবল সতিনী সুরধুনী।
স্বামীর সোহাগে ভাষে, সে তোরে কেমন বাসে,
তাই ভাবি দিবস রজনী, গো!॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি!
আশুতোষ দেবচূড়ামণি।
না জানে আপনার্ পর, যে আসে তাহারি ঘর,
সুখে আছে তোমার নন্দিনী গো!॥ ২৪২

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

আজু মন্দিরে ওমা ! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে।
পূজয়ে ভকতবৃন্দ, জবা সুচন্দন দিয়ে॥
আনন্দিত নর নারী, সবে পুলকিত হিয়ে।
মগন ভকতগণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে॥
সুরাসুর নাগ নর, নাচে উল্লাসিত হৈয়ে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে॥
মহাপাপী দুরাচারী, নিস্তারিল নাম লয়ে।
পতিত কমলাকান্ত,রহিল শ্রীচরণ চেয়ে॥ ২৪



পরজ কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

ওরে নবমীনিশি ! না হৈওরে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত ;
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরই প্রাণ॥
প্রফুল্ল কুমুদ বরে, সচন্দন লয়ে করে ;
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার, চরণে করিব দান।
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি ভয়,
যেন না সহিতে হয়, রে ! শিবের বচন বাণ।
হেরিয়ে তনয়ামুখ, পাশরিলাম সব দুখ ;
আজি সে কেমন সুখ, হতেছে স্বপন জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি !
লুকায়ে রাখ না মারে, হৃদয়ে দিয়ে স্থান॥ ২৪৯



খট—জলদ্ তেতালা।

কি হলো নবমীনিশি, হৈলো অবসান, গো!
বিশাল ডমরু, ঘন ঘন বাজে,
শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ, গো॥
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ,
মায়ের মলিন হয়েছে অতি, ও বিধু বয়ান॥
ভিখারী ত্রিশূলধারী. যা চাহে তা দিতে পারি;
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান।
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত;
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত, হয়েছি পাষাণ, গো॥
পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠান যায়;
মিছে আকিঞ্চন কেন, করে ত্রিলোচন।
কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে;
হর, আপনি রাখিলে রহে,
আপনার মন, গো! ॥ ২৪৫

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

ওগো উমা! আজু কি কারণে পোহাল যামিনী।
এত অনুচিত কেন, গো করে শূলপাণি॥
আমি উমার লাগিয়ে, অনেক কেলেশ পেয়ে.
এতনু সফল করি মানি।
হেরিয়ে ও চাঁদমুখ, পাশরিলাম সব দুখ,
আজু কেন কান্দিছে পরাণি॥

আমি তোমারে পাইয়ে, সকল দুঃখ বিস্মরিয়ে,
নাহি জানি দিবস রজনী।
আজু বিধি বিড়ম্বিল, মনের আশা না পূরিল,
এখন আমি কি করি নাজানি ॥
সতত আমার মনে, তম সম তোমা বিনে,
জল বিনে যেন চাতকিনী।
অতি নিদারুণ হর, পাগল সে দিগম্বর,
কেনে দিলাম তাঁহারে নন্দিনী ॥
আমার মনের আগুন, দ্বিগুণ উথলে কেন, মা!
বুঝি গিরি পাঠাবে এখনি ;
কমলাকান্তের, নিষেধ না মানে প্রাণ,
নাছাড়িব চরণ দুখানি ॥ ২৪৬

ঝিঝিট—ঠুংরি ॥

জয়া বলগো! পাঠান হবে না,
হর মায়ের বেদন কেমন জানেনা ॥
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার,
ও কথা আমারে বোলোনা ॥
ওগো! হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে,
প্রহরী এদুটী নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া!
তখনি ত্যজিব জীবন।

সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ,
তিন দিন যদি রয়না।
তবে কি সুখ আমার, এছার ভবনে,
এ দুঃখে প্রাণ আমার রবেনা॥
যাতনা কেমন, নাজানে কখন,
বিশেষে রাজার কুমারী।
আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া!
হর যে জনম ভিখারী॥
ওগো! শ্মশানে মশানে, লৈয়ে যায় সে ধনে,
আপনার গুণ কিছু জানেনা।
আবার কোন লাজে হর, এসেছেন লইতে,
জনেনা যে বিদায় দেবে না॥
তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি!
উপদেশ কহি তোমারে।
কত বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ওই পদ,
তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।
কমলাকান্তের, নিবেদন ধর,
শিব বিনা শিবা পাবেনা।
যদি জামাতা শঙ্করে, পার রাখিবারে,
তবে তোমার গৌরী যাবে না॥ ২৪৭


পরজ কালাংড়া—ঢিমে তেতালা॥
আমার গৌরীরে লয়ে যায়, হর আসিয়ে।
কি কর হে গিরিবর! রঙ্গ দেখ বসিয়ে॥

বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম নানামত ;
শুনিয়া না শুনে কাণে,
ঢোল্যে পড়ে হাসিয়ে ॥
একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার ;
পরিধান বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।
আমি হে রাজার নারী,
ইহা কি সহিতে পারি,
সোণার পুতলি দিলে পাথরে ভাসায়ে ॥
শুনি গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়,
অণিমাদি আছে যাঁর, চরণে লোটায়ে।
কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখর রাণি!
পরম আনন্দে গো!
তনয়া দেহ পাঠায়ে ॥ ২৪৮ ॥

বিজয়া

মুলতান—জলদ্ তেতালা।

ফিরে চাও, গো উমা! তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে, কোথা যাও, গো!।
রতন ভবন মোর, আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এছার জীবন।
এই খানে দাঁড়াও উমা! বারেক দাঁড়াও মা!
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও, গো ॥



শিবসঙ্গীত

দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে।
বোলে যাও আসিবে আর, কতদিনে এ ভবনে।
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও।
বিধুমুখে মা বলিয়ে মায়েরে বুঝাও, গো ॥ ২৪৯

শিবসঙ্গীত

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

যোগী শঙ্কর আদি মহেশ।
পুরুষ পুরুষ-প্রধান ত্রিলোকবাস ॥
ত্রিপুর দহন ত্রিনয়ন ত্রিগুণেশ।
ত্রৈলোক্যপাবন ত্রিকাল ত্রিপুরেশ ॥
কমলাকান্ত ত্রিতাপবিনাশ।
দাতা দিগম্বর, ভো! আশুতোষ ॥ ২৫০ ॥

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

মন্মথ মথনং ভূতেশং সদা, শশিশেখরং ভজে।
ত্রিগুণাকরং ত্রিলোচন সুন্দরং হরং,
গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজাবরং ভজে ॥
প্রমথাধিপং পরানন্দ প্রকাশকং।
পরমার্থদং পরং পরমেশ্বরং ভজে।
কমলাকান্ত ত্রিতাপ বিনাশনং,
বৃষভাসনং বিভুং শিবশঙ্করং ভজে ॥ ২৫১

ভৈরোঁ—কাওয়ালী।

ভৈরোঁ আইল, মায়া পলাইল,
ত্রিশূল ডমরু হাতে।
ঘোরদল পরদল, ভৈগেল সমফল,
মিলিব জননীর সাতে॥
ভৈরোঁ বালা, জগমন আলা,
নর শিরমালা সোহে।
সঙ্কট বঙ্কট, বিকট কপট লট,
পরশু দেখাইল মোহে।
জটাজূট আর, সিন্দূর ভালে,
বম্‌বম্‌ গাল বাজাইল।
তাকর পিছে, অম্বা নাচে,
কমল অমলপদ পাইল॥ ২৫২

তাকর—তাহার। ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত। সংক্ষেপে 'তাক'।

ভৈরোঁ—রাগবিশেষ 'ভোরে গান করা হইত বলিয়া মালব গৌড়ের হিন্দী প্রাচীন নাম ভোরেঁা ছিল, ইহা হইতে ক্রমে ভৈরেঁা এবং ইহাকেই সংস্কৃত করা হইয়াছে ভৈরব।' শান্তিনিকেতন, বৈশাখ১৩২৭ সাল। ভৈরোঁ—মহাদেব। ভৈগেল—ভৈ (ভূধাতুজ। ব্রজ) হইয়া। সোহে—সোহায়ল—শোভা করিল। সঙ্কট—অভেদ্য। বঙ্কট—চক্র, বাঁকা। লট—লম্পট।

কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক পদাবলী

মুলতান—একতালা।

আমার গৌর নাচেরে যাচে হরিনাম
সংকীর্ত্তন রস প্রকাশে।
হরি হরি বলি, দেয় করতাল, কলি
কলুষ নাশে॥
তড়িত পুঞ্জ জড়িত কায়, শরত ইন্দু বদন তায়;
একি আনন্দ ভকতবৃন্দ, মগন প্রেমপাশে॥
ক্ষণে অচেতন অবশ অঙ্গ, ক্ষণে পুলকিত ভকত সঙ্গ;
রাধা পুনরাধ্য ভাব প্রসঙ্গ, প্রকট সুখ বিলাসে।
নব কি নবকরে করঙ্গ, দণ্ডপাণি একি তরঙ্গ;
কমলাকান্ত হেরি অনন্ত, মিনতি ভকত আশে॥ ২৫৩

দেশ মল্লার—জলদ্ তেতালা।

জয় জয় মাধব মুকুন্দ মুরারি।
জয় বৃন্দাবনচন্দ্র, জয় নন্দসুত,
জয় বৃকভানু কুমারী॥
পীতাম্বর ধর বনমালা ধর, রাধাধর বনোয়ারি।
ব্রজবনিতা সুখ, দায়ক নায়ক, জয় পীতম জয় প্যারী॥
জয় গোবিন্দ গোপাল, জনার্দ্দন জয় গোবর্দ্ধনধারী।
কমলাকান্ত অনন্ত সুখ দায়ক, মোহন রাসবিহারী॥ ২৫৪

পরজ—ঢিমা তেতালা।

হে শ্যাম! পরম পুরুষ গুণধাম।
মম হৃদি সরোজ নিবাস বঁধু, পুরয় মনোভিরাম॥
গুণাকর গুণনিধি, সগুণ অগুণ বিধি,
অতি অনুপম তুয়া নাম।
কমলাকান্ত জীবন ধন প্রাণ, তব গুণে রত বসু যাম॥ ২৫৫

কালাংড়া—একতালা।

পীরীতি না জানে কালা, গো সজনি!॥
অকারণে ধনপ্রাণে, মজিল অবলা।
রতন বলিয়া গলে পরিলাম কলঙ্কের মালা॥
অমৃত রুপিলে সখী, উপজে বিষের শাখী, কি জানে কুলের বালা।
কমলাকান্তের রীত, আগে না বুঝিয়ে, ঘটিল বিষম জ্বালা॥ ২৫৬

ইমন্—জলদ্ তেতালা।

সে নিদারুণ কালা, কেমনে জানিব আমি কুলের অবলা॥

আগে যদি জানিতাম, তবে কেন মজিতাম; প্রেম নয়, হয় কেবল পরাণের জ্বালা॥

যখন পীরীতি করলে, আনি চাঁদ হাতে দিলে, ভুলাইলে মধুর বচনে কুলবালা। কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনি! শেষে ঘটাইলে মোরে, কলঙ্কের ডালা॥ ২৫৭

পরজ কালাংড়া—জলদ্তেতালা।

এখনি আসিবে বন্ধু, প্রাণসজনি।
সে তোমার অনুগত, আমি ভাল জানি॥

এসো এসো বেশ, বানায়ে দিব মনের মত; আজু সে রসিকবর, সঙ্গে বঞ্চিবে রজনী ॥

পর পর কাজল রেখা দুটি নয়নে, ধর ধর অধর সুরঙ্গ রঙ্গিণী। কমলাকান্ত মিনতি রাখ সুন্দরি! যেমন সুন্দর শ্যাম, সখি সাজ গো! তেমনি ॥ ২৫৮

সরফরদা—জলদ্‌তেতালা।

ও শ্যামবন্ধু! তোমায় না দেখিলে ঝুরে দুটি আঁখি। দেখিলে নয়ন জুড়ায় ॥

না জানি কি মন্ত্র দিয়ে, বান্ধিলে প্রিয়ে, ও বিধুবদন খানি স্বপনে নিরখি ॥

ঘরে গুরুজনার ভয়, কত ছলে কত কয়; শুনিয়ে না শুনি, যে মরমে মরে থাকি! তথাপি তোমার তরে, পরাণ যেমন করে, সুধাইও কমলাকান্তেরে রাখি সাখি ॥ ২৫৯

সরফরদা—জলদ্‌তেতালা।

শ্যাম কেন জানে না সখি রে! পীরিতি করিয়া তারে যতনে রাখিতে ॥

বঁধু আপনি মজিল, আমারে মজাইল; আর কলঙ্ক করিল, নিলাজ বাঁশিতে, সই! ॥

আমি যে সরলা নারী, এত কি বুঝিতে পারি; দেখিয়ে ভুলিলাম ভারি, মজিলাম পীরিতে। কমলাকান্তের বাণী, শুন প্রাণ সজনি! এখন কি করিব নারী, নারিলাম চিনিতে ॥ ২৬০

পরজ—জলদ্‌তেতালা।

কি ক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল॥
হেরিলে না হেরিতে রূপ, অন্তরে পশিল॥
হেরিতে না পেলাম রূপ, তিলেক দাঁড়াইয়ে।
অবলার মনেরো দুঃখ, চিরদিন মনে রহিল॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন গো প্রাণ সজনি!
সখি! অকলঙ্ক কুলে, বুঝি কলঙ্ক ঘটিল॥ ২৬১

লুম্‌ঝিঝিট্—জলদ্‌তেতালা।

এতদিনে তোমারে জানিলাম।
জানিলাম যেমন আমার, সুহৃদ্ তুমি ওহে শ্যাম!॥
সুখের কারণ, জীবন যৌবন, ভাল জনারে সুঁপিলাম॥
তুমি কর নাথ, মধুকর ব্রত, আগে যদি জানিতাম।
তবে কেন ভুলে, কালী দিতাম কুলে, মিছা কলঙ্কে ডুবিলাম॥
ভুলেছিলাম ভ্রমে, যত সুখ প্রেমে, এখন আমি বুঝিলাম।
কমলাকান্তের, অন্তর বাহির, ভাবিয়ে কালী হইলাম॥ ২৬২

ইমন—জলদ্‌তেতালা।

সেইরূপে সদা মন ধায়।
আমি কি হেরিলাম যমুনা বিপিনে॥
মধুর মুরলি যে বিধু বদনে॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপ নিরূপম, কেন হেরিলাম, আমি কি করিলাম। বঙ্কিম চাহনি চঞ্চল নয়নে॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনি! আমি ভুলিলাম, সকলি সুঁপিলাম। মজিলাম মজিলাম, নবঘন বরণে॥ ২৬৩

কালাংড়া—একতালা।

ওহে বঁধু! তোমার কি দোষ, তুমি কি করিবে পরবশ।
তোমারে পুরাতে হয়, অনেকেরই আশ॥

পুরুষ সুজন বট, কোন গুণে নহ খাট; না বুঝে অবোধ লোক, করে অপযশ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শ্যামগুণমণি! মনের ভরমে কভু মম গৃহে এসো॥ ২৬৪

কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

কেন বা পিরীতি করিলাম্, কপটেরি সনে।
না বুঝে আপনার দোষে, কলঙ্কে ডুবিলাম॥
অমৃত বলিয়ে সখি! গরল ভক্ষিলাম।
দিবানিশি অবিরত, জ্বলিতে লাগিলাম॥
কমলাকান্তের কথা, আগে না বুঝিলাম।
পরে কি করিব বশ, আপনা খোয়ালাম॥ ২৬৫

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা॥

রতন বলিয়ে সখি! যতন করিলাম তারে।
কে জানে পাষাণ হবে, দিন দুই তিন পরে॥
শিশির শীতল অতি, শরীরের তাপ হরে।
নলিনী কি জানে শেষে, সমূলে বিনাশ করে॥ ২৬৬

পরজ কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

সাধ করে পিরীতি করিতে, যদি মিলন হয় সুজন সহিতে, সই!

আমার যেমন মন, সে যদি হয় এমন; কি আর অধিক সুখ এসুখ হইতে॥

কি ক্ষণে হেরিলাম রূপ, সুধাময় রসকূপ; সেই হইতে প্রাণ কান্দে তাহারে দেখিতে॥

কমলাকান্তের যদি, আনিয়া মিলায় বিধি, সেরূপ লাবণ্য নিধি, হৃদয়ে রাখিতে॥ ২৬৭

বাহার—জলদ্ তেতালা।

বন্ধু! তুমি কয়েছিলে কালি এই কথা।

প্রিয়সি তোমার বই, আর কার নই, তবে এত রজনী বঞ্চিলে বল কোথা?

সাধিতে আপনার ফল, কত না চাতুরি বল, বুঝিলাম তোমার যেমন সুজনতা॥

আপনি করিয়ে প্রেম রাখিতে রসরাজ! কেবল কলঙ্কডালা, মোর মাথে সাজাইলা, এই করিলে প্রাণ! খেয়ে মোর মাথা॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে লম্পটরাজ! অবলা কুলের বালা, অধিক প্রেমের জ্বালা, অতি অনুচিত তব, সরলে শঠতা॥ ২৬৮

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

তোমারে আপনার কোরে, ভাবে যেই জন।
প্রাণ রে! তুমি তারে, কেন কর এত বিড়ম্বন॥
এ কেমন প্রেম, উভয় মন সম নয়।
কেহ সুখভাগী, কেহ, দুঃখের কারণ॥

যতনে রতন তরু করিলে সৃজন। ফল ফুল কালে তারে, নাকর সেচন। মুকুলে আকুল অতি, সংশয় জীবন। তুমি তার হিত আর করিবে কখন॥ ২৬৯

সরফরদা—জলদ্ তেতালা।

ইহারি কারণে সুঁপিলাম যৌবন জীবন প্রাণ।

পুরুষ রতন তুমি, রসিক সুজন॥

কঠিন হৃদয় যার, সদাই চাতুরী তার, চিরদিন নাহি রয়, কুজনে মিলন। রসিকের এই গুণ, নবরস প্রতিদিন, কখন না হইবে, প্রেম পুরাতন॥ ২৭০

ললিত-জলদ্ তেতালা।

কি লাগিয়ে প্রাণ প্রিয়ে মানিনী হয়েছ।

ও বিধুবদনি! কেন, মুখ মলিন করেছ॥

চাতক ত্যজিয়ে ঘন, করে সর আরাধন, চকোর কি কর শশী, ত্যাগি কি দেখেছ! অলি কুমুদিনী বশ, কোথারে শুনেছ॥ ২৭১

আলেয়া—জলদ তেতালা।

এখন কি করিবে অলিরাজ! হৃদয়ে বেন্ধেছে কমলিনী। প্রতিদিন এই নিশি, মোরে দেখে হাসে শশী, তুমি থাক লৈয়ে কুমুদিনী॥

দিন অবসান কালে, আসিয়ে মিলিয়ে ছিলে, জাননা হইবে নিশি মুদিত নলিনী। পেয়েছি আপনার বশ, আজু পুরাইব আশ, না ছাড়িব ওহে বঁধু! থাকিতে যামিনী॥ ২৭২

পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

বদন সরোজ কি শশী? প্রিয়সি তোমার, হে।

নয়ন চকোর ভ্রমর, উভয়ের মিলন॥

কজ্জল জল, কিব্যোম সম কুন্তল, মধু কি সুধা মিলিত বচন।

চন্দন বিন্দু ইন্দু সম নিন্দে, সিন্দুরো তিমির বিনাশন। কমলা কান্ত ওরূপ নিরখিয়ে, বুঝিতে নাপারে কি রজনী দিন॥ ২৭৩

কালাংড়া—জলদ্ তেতাল।

পিরীতি রতন, কহ সখি ! কেমনে রাখিব ।

আমার যেমন মন, সে নহে তেমন ॥

মনে মনে সাধ, ছিল মোর সরল অন্তর যার, তারি সনে করিব মিলন। আরে প্রাণ সখি ! কে জানে শঠের সঙ্গে, দহিবে জীবন ॥

মান অপমান, না ভাবিয়ে তাহার অধিনী হৈয়ে, তারি সুখে দুঃখ নিবারণ। কমলাকান্তেরে কৈয়ো এই নিবেদন ॥ ২৭৪

বেহাগড়া—ছেব্‌কা ।

শ্যাম নাজানি কেন বঁধু দগ্‌ধে আমায় ।

পেয়ে সে কেমন রস, যদি শ্যাম পরবশ, তবে কেন আমারে জাগায় ॥

ভ্রমর নিকুঞ্জ বনে, মজিল আসব পানে, মাতিল মদন মধুবায় : প্রেমদায়ী সুখ-নিশি, বিষ বরিষয়ে শশী, এখন আমি কি করি উপায় ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনি ! হৃদয়ে হৃদাত্ম শ্যামরায় ; নাজানি নিতান্ত সদয় হয়েছে কোন জনে, মোরে বধি কাহারে জুড়ায় ॥ ২৭৫

খাম্বাজ বাহার—জলদ্ তেতালা ।

কার সঙ্গে রজনী জাগিয়ে অঙ্গ তোমার ।

হৃদি নখ ছিন্ন ভিন্ন তনু অতি, হেরি মন ভ্রান্তি আমার ॥

কার নয়নের অঞ্জন বয়ানে পরেছ হে ! রসিকের এই ব্যবহার ! পীতাম্বর পরিহরি, পর পরিধেয় পরি, বাসনা পুরাইলে কার ॥

তোমার ললাটে যাবক, পাবক নিন্দিত খণ্ডিত গজমতিহার ! কমলাকান্ত এসেছ নিশি বঞ্চিয়ে, নিজগুণ করিয়ে প্রচার ॥ ২৭৬

পরিশিষ্ট

কমলাকান্ত প্রসঙ্গে

বিভিন্ন লেখক

ও

পত্রাবলী

কমলাকান্ত প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখক

নামপত্রের প্রতিলিপি

শ্রীশ্রীকালী শরণং

বর্দ্ধমানাধিপতি
মহারাজাধিরাজ
৺মহাতাব্ চান্দ
বাহাদুর ।

সাধক ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃত

শ্যামা সঙ্গীত ।

অধুনা

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর

চতুর্দ্দশ ভূপতির

আজ্ঞানুসারে ও ব্যয় দ্বারা

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত

এবং

শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য দ্বার

সংশোধিত হইয়া

কলিকাতা

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

সন ১২৬৪ । ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ।

শকাব্দা ১৭৭৯ ।

২২ ভাদ্র

শ্রীশ্রীকালী শরণং

অথ ভূমিকা।

সূর্য্যবংশাবতংস সুধীরবর কীর্ত্তিমান্ শ্রীল শ্রীমান বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর বাহাদুর একদা এতদ্দেশীয় সুবিখ্যাত সাধকবর স্বর্গীয় কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুশ্রাব্য সুললিত অথচ ভক্তিরসাভিষিক্ত সুপ্রণালীরচিত মহাবিদ্যা প্রসাধনীয় কতিপয় সঙ্গীত শ্রবণ পুরঃসর প্রফুল্লিতান্তঃকরণে স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিলেন যে উক্ত মহাত্মার কৃত প্রচলিত গীতসমূহ একত্র সঙ্কলন-পূর্ব্বক সাধারণের উপকার ও সন্তোষার্থ মুদ্রাঙ্কিত করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর বর্দ্ধমানান্তঃপাতি কোটালহাটস্থিত উক্ত ভট্টাচার্য্যের আবাসগৃহ হইতে সুজীর্ণ অতি মলিন বর্ণগীত পুস্তকদ্বয়, যাহা তিনি প্রথমাবস্থাবধি রচনা করিয়াছিলেন, অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সমীপে তাহা প্রাপ্ত্যনন্তর শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা সংশোধন করাইয়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের প্রতি মুদ্রাঙ্কিত করণের অনুমতি করেন, তদনুসারতঃ গভীর রত্নাকরগত বহ্বায়াসসাধ্য রত্নসমূহ সংগ্রহের ন্যায় সেই প্রাচীন গীত সকল একত্র সঙ্কলন ও শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতির নিয়োজিত গায়কগণের দ্বারা রাগরাগিনী তাল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করণে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে সঙ্গীত রসজ্ঞ ব্যক্তিব্যূহের আহ্লাদ ও উপকার দর্শিলে পরিশ্রমের সার্থকতা হইবেক।

অনন্তর ঐ ভট্টাচার্য্যের রচিত সন ১২১৮ সালের লিখিত অন্য গ্রন্থদ্বয় পুনঃপ্রাপ্ত ও লোকপ্রমুখাৎ প্রচলিত অনেক গীত অবগত হইয়া আহ্লাদ-পূর্ব্বক সংগ্রহ করা গেল; ঐ সকল গীতের মধ্যে কতকগুলি গানের রাগরাগিণী প্রভৃতি অপ্রকাশিত ছিল এ বিধায় যথাযোগ্য রাগাদি সংযোজিত হইল এবং যে পুস্তক সন্দর্শনপূর্ব্বক এই সংগীত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে

তাহার জীর্ণতা জন্য অনেক শব্দের পরিবর্ত্তন ও নিতান্ত দেশ্যভাষায় কতিপয় শব্দ রূপান্তরীকৃত হইল, কিন্তু তাহাতে রচকের প্রকৃত ভাবের বৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভাবনাই নাই।

ঐ প্রসিদ্ধ কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য পরমজাপক ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে, বিশেষতঃ এতদ্দেশের বহুতর ব্যক্তিগণ তাঁহার কৃত গীত গান করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্যকরূপে কেহ অবগত নহেন, সুতরাং এই গীত পুস্তক দর্শন তাঁহাদের বিশেষ সন্তোষের কারণ হইবেক।

অপর উল্লেখিত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমতঃ অম্বিকা কালনা হইতে সন ১২১৬ সালে বর্দ্ধমান রাজধানীতে সমাগমনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের অপার করুণা প্রসাদাৎ রাজসভা পণ্ডিত হইয়া সমাদৃত হয়েন, এবঞ্চ অধিরাজ বাহাদুর তাঁহার গুণের বিশেষ পরিচয় পাইয়া প্রীতি প্রসন্নতায় কোটালহাটে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তদবধি ঐ মহাপুরুষের এস্থলে স্থিরতররূপে বসতি হইল।

তৎপরে অধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর, উক্ত কমলাকান্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার শ্যামা সাধনীয় চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও পূজার ব্যয় ও দিন নির্ব্বাহ জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি উভয় রাজার অনুগ্রহে উৎসাহান্বিত হইয়া শ্যামাসঙ্গীত রচনা ও পূজার বাহুল্য কারণ, শ্যামাপূজার রাত্রিতে তথায় এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয় ব্যক্তির সমাগম হইত। যেমন উভয় মহারাজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন, তদ্রূপ অন্যান্য মহাত্মাগণও তাঁহার সিদ্ধ সাধনায় প্রীত হইয়া মহামান্য সাধক জ্ঞান করিতেন।

অনন্তর বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চান্দ্ বাহাদুর প্রাগুক্ত মহোদয় ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের কীর্ত্তি রক্ষার্থে শ্যামাপূজার বার্ষিক বৃত্তি ও তাঁহার ভ্রাতৃবধূর গ্রাসাচ্ছাদনার্থ বৃত্তি নিরূপণ

করিয়া দিয়াছেন, এবং ঐ মহাত্মার মহৎ কীর্ত্তি ও যশ সর্ব্বত্র সংঘোষণাবশ্যক বিধায় তাঁহার কৃত গীত সকল মুদ্রিত করিলেন. ইহাতে বিচক্ষণ বিজ্ঞ মহাশয়েরা এই গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার দৈবশক্তি ও ঈশ্বর ভক্তির পরিচয় প্রচুরতা প্রাপ্ত হইবেন।

পরগুণজ্ঞ কীর্ত্তিকুশল অধীন ব্যক্তির গুণগ্রাম গৌরব সর্ব্বজনের সুগোচর করণার্থ অধিরাজ বাহাদুরের যে কি পর্য্যন্ত উদ্যোগ ও অনুরাগ তাহা এতদ্দ্বারাই অতি সহজে সুবোধ সমূহের বোধগম্য হইবেক। অলমতি বিস্তরেণ।

নামপত্রের প্রতিলিপি

কলিকাতা পটলডাঙ্গার ৺শ্রীকান্ত মল্লিক। *

কমলাকান্ত-পদাবলি।

ভক্তি ও প্রেম বিষয়ক

৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃত

পদাবলি।

৫৮নং পটলডাঙ্গা পটুয়াটোলা লেন,

শ্রীশ্রীকান্ত মল্লিক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

* ১২৯২ সালে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত পদাবলী' গ্রন্থের নামপত্র ও ভূমিকার প্রতিলিপি। বর্ত্তমান পটুয়াটোলা লেনে মল্লিক মহাশয়ের কোন চিহ্ন নাই, সেখানে একটী ছাত্রনিবাস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার।

১২৯২ সাল

ভূমিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর ১২৬৪ সালে মহাসিদ্ধ ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত সমস্ত পদাবলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করান। ইহাতে উক্ত মহাপুরুষের কৃত পদসমূহের পাঠশুদ্ধতা পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। কারণ স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতৃবধূর নিকট হইতে তাঁহার নিজ গৃহস্থিত ও স্বহস্ত লিখিত পুস্তক আনাইয়া উহা সংগ্রহ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদাবলিতে যে সকল রাগ রাগিণী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন তাহাও রাজসভাসদ্ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমি উক্ত পুস্তক দৃষ্টে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত পদসমূহের পাঠ শোধন করিয়াছি। এই পদাবলির পাঠ শোধনের উপায়ান্তর না থাকায় এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের অনুমতিতে যে পদাবলি প্রকাশিত হয় তাহার ভূমিকাতে প্রকাশ আছে যে ১২১৬ সালে সাধক চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় অম্বিকা কাল্না হইতে বৰ্দ্ধমান নগরে আসিয়া স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের প্রসন্নতা প্রযুক্ত রাজসভায় সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠায় মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের ভক্তি গাঢ়রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় উক্ত মহারাজা তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গুরুবরণ সম্বন্ধে উক্ত মহারাজার ব্যবহারই তাহার একমাত্র সাক্ষী। উক্ত মহারাজা বৰ্দ্ধমান রাজধানীর অনতিদূরে কোটালহাট গ্রামে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসের জন্য একটী বাটী প্রস্তুত করাইয়া দেন তদবধি তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেন। উক্ত

মহারাজা আরও তাঁহার ইষ্ট সাধনের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও পূজাদির ব্যয় জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী৺শ্যামা পূজার দিন উক্ত মহাপুরুষের বাটীতে বিশেষ ব্যয় বাহুল্য করিয়া উক্ত মহারাজা অতি সমারোহে পূজা সম্পন্ন করাইতেন। এরূপ শুনা যায় যে উক্ত সমারোহে ঐ গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল নিষ্ঠাবান লোকেরা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে যোগ দিতেন। এবং কাহার সহিত কাহারও বৈষয়িক সম্বন্ধে মনোমালিন্য থাকিলেও সেদিন সকলে একত্রে প্রেম করিতেন। স্বর্গীয় রাজকুমার প্রতাপচাঁদ বাহাদুরও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট নির্জনে যাইয়া ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধীয় উপদেশ লইতেন। কোটালহাট গ্রামে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্য গৃহাদি কোন্ সালে নির্ম্মাণ হইয়াছিল, তাঁহার পিতার নাম কি, এবং বাল্যকালে কি অবস্থায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা বিষয়ে বর্দ্ধমানবাসি নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। এরূপ শুনা যায় তিনি এতদূর অভিমানশূন্য ছিলেন যে, তাঁহাকে যে কেহ অনুরোধ করিবা মাত্র যে কোন সুর ও তালে একটী শ্যামাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া নিজে গাহিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন।

সাধকোত্তম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইষ্টসাধনে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনুভব করা আমার মত লোকের সাধ্যাতীত। তবে প্রাচীনকালের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের যোগৈশ্বর্য্যের কথা যেরূপ শুনা যায় সেইরূপ ইহাঁরও দুই একটী শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পদাবলিতে আদ্যোপান্ত যে বিবেক স্রোত প্রবাহিত; তাঁহার কার্য্যেও সে ভাবের বিন্দুমাত্র হ্রাস ছিল না। জনশ্রুতি আছে যে তাঁহার স্ত্রীকে দাহ করিতে যাইয়া যখন চিতা প্রজ্বলিত হয় তখন নিম্নলিখিত পদটী রচনা করিয়া গাইতে গাইতে নৃত্য করিয়াছিলেন।—

'কালি সব ঘুচালি লেঠা।

শ্রীনাথের লিখন্ আছে যেমন্; রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা ॥ ইত্যাদি ॥

১১১ সংখ্যা পদ ॥

আরও শুনা যায় যে একদিন স্থানান্তর যাইতে যাইতে পথে রাত্রি হওয়ায় ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা নামক মাঠে তাঁহাকে দস্যুগণ অতি ভীষণ রবে আক্রমণ করে। যমের হাতে নিস্তার আছে তথাপি সেকালে দস্যুর হাতে কোনমতে নিস্তার ছিলনা; ইহা জানিয়াও তাঁহার পরমানন্দের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সে সময়েও তিনি মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া মহানন্দে নিম্নলিখিত পদটী রচনা করিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিয়াছিলেন।—

আর কিছু নাই শ্যামা! তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।

শুনেছি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব হলাম সাহস ভাঙ্গা ॥ ইত্যাদি ॥

৮৪ সংখ্যার পদ ॥

তাঁহার করুণরসাশ্রিত পদ শ্রবণে মূঢ় দস্যুগণও বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদানত হইয়া দুর্ব্যবহারের জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি "বাপু তোমরা বাটী যাও" ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসেন।

বর্দ্ধমান নিবাসী প্রবীন নিষ্ঠাবান লোকদিগের নিকট শুনা যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় শঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইলে মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর তৎসংবাদে অতি ব্যাকুলান্তঃকরণে তাঁহাকে দেখিতে গিয়া মৃত্যু আসন্ন জানিয়া গঙ্গাতীরস্থ হইবার জন্য বিশেষ অনুনয় বিনয় করিলে তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত পদটীর দ্বারা তাঁহাকে উত্তর প্রদান করেন।

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।

আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে, বিমাতার কি স্মরণ লব ॥

বড় দুঃখের বিষয় এই পদটীর এইটুকুর অতিরিক্ত আর পাওয়া গেল না।

"গুরুদেব গঙ্গাপ্রাপ্ত হইবেন না" এইরূপ সামান্য লৌকিক মোহাভাব বশতই হউক আর লোকাচার বিরুদ্ধ জন্য শ্রুতিকটু বশতই হউক মহারাজা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহারাজার এইরূপ ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পরদিন মধ্যাহ্নকালে আসিতে বলেন। মহারাজা যথাসময়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি পরমার্থ বিষয়ক সংক্ষেপে কতকগুলিন উপদেশান্তর তৃণশয্যার অনুমতি করেন। মহাপুরুষের দেহত্যাগের সময় তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোত সবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মহারাজা ও তৎসঙ্গী সাধারণে পরম চরিতার্থ হইয়াছিলেন।

পরমভক্ত স্বর্গীয় নীলাম্বর, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মহাসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গে সমান তুলনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃত নিম্নলিখিত পদে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

মায়ের প্রজা হও রে! আসি।
মায়ের সমভাব, নাই কমি বেসি॥
রামপ্রসাদ এক পাটা পেয়ে, মহত্রাণ করেছে কাশী,
কমলাকান্ত ভেক্ নিয়েছে, শ্যামা ভাবছেন বোসে,
আবার কোথায় পাব কাশী॥
নরেশচন্দ্র জোর করিয়ে, হরের ধন লয়ে শ্মশানে আছে বসি।
ভোলানাথের ভয় হয়েছে, নরেশচন্দ্র কল্লে আবার নূতন কাশী।
নীলাম্বর ভেকিয়ে ভেকিয়ে, মন করেছে উদাসী।
যে ধনের প্রার্থনা করি, এরা তিন জনে করেছে কসাকসি॥

১৩২০ সাল

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।*

শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে এমন একজন সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার সঙ্গীতসুধায় পাষাণ প্রাণও বিগলিত হইত; তাহা আজ কয়জন জানে? সাধকশ্রেষ্ঠ কমলাকান্ত সাধনার যে মার্গে উপনীত হইয়াছিলেন, একা রামপ্রসাদ ব্যতীত আর কোন শাক্ত ভক্ত ততদূর যাইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি এক সময়ে আমাদের জাতিকে ভক্তির বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, তিনি তেমন অধিক সংখ্যক গান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া যে তাঁহাকে আমরা বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি তাহা কি ঘোর পরিতাপের বিষয় নহে? শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বিখ্যাত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকেও এই মহাত্মার প্রতি সুবিচার করেন নাই। এই পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এই :—'কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অম্বিকা-কালনা হইতে বর্দ্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বর্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামা-বিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর।'

এ কথা সত্য বটে যে, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; কিন্তু উপরে উদ্ধৃত দুই ছত্র হইতে যে তাঁহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পাঠকের কিছুই ধারণা হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। কএকটি প্রবাদ গল্প এখনও তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকে; তাঁহার রচিত প্রসঙ্গে ঐ সকল প্রবাদের উল্লেখ আমরা একান্ত আবশ্যক মনে করি।

গ্রীক পুরাণে পড়িয়াছিলাম যে, অপূর্ব্ব গায়ক এরিয়ন সিসিলিতে

* 'ভারতবর্ষ'—১৩২০। মাঘ সংখ্যা। 'সাধক কমলাকান্ত।'

সঙ্গীত-দ্বন্দ্বে অন্যান্য সকল গায়ককে পরাজিত করিয়া যখন বহুমূল্য পুরস্কার সহ তথা হইতে করিন্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার জাহাজের নাবিকগণ ঐ সকল পুরস্কার-দ্রব্যের লোভে তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। তিনি নিজের আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া দুর্বৃত্তদের নিকট হইতে এইমাত্র অনুমতি পাইলেন যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সাধের বীণা-বাদন করিয়া একটি গান গায়িবেন। সঙ্গীত শেষ হইলে দস্যুগণ তাঁহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবে। এদিকে সেই সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া কতকগুলি বৃহদাকার ডলফিন্ মৎস্য তাঁহার জাহাজের নিকট আসিয়া জুটিয়াছিল এবং এরিয়ন যখন সমুদ্রগর্ভে ক্ষিপ্ত হইলেন, তখন একটা মাছ তাঁহাকে বহন করিয়া তীরে লইয়া গেল। ইহা একটি কল্পিত উপাখ্যান মাত্র; আর সঙ্গীতের প্রভাব দ্যোতন করিবার জন্যই বোধ হয় ইহার সৃষ্টি; কিন্তু এই উপাখ্যানে দেখিতেছি যে, যে সঙ্গীতে ইতর প্রাণী মুগ্ধ হইয়াছিল তাহা লোভোপহত মানুষের পাষাণ-মন দ্রব করিতে পারে নাই। মানুষের মন এতই কঠিন!

কিন্তু যে নির্ম্মম মানবমন অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পৌরাণিক গায়কের সঙ্গীতে করুণারসে সিক্ত হয় নাই, তাহা ভক্ত কমলাকান্তের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরাণকারের কল্পনায় যাহা আসে নাই, আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে তাহাই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। কমলাকান্ত অনেকটা এরিয়নের মত অবস্থাতেই পড়িয়াছিলেন। একদিন রাত্রে তিনি 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা' নামক একটী মাঠ দিয়া যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে কতগুলি দস্যু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায় না দেখিয়া নির্ভীক সাধক উচ্চৈঃস্বরে রামপ্রসাদী সুরে গান ধরিলেন—

আর কিছু নাই শ্যামা,
কেবল তোমার দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
অতে'ব হ'লেম সাহসভাঙ্গা। ইত্যাদি।

নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া সেই নরপশুগণ সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিল। ঘোর পাতকের যে জদ্দগল পাষাণ তাহাদের হৃদয়ের আদিম দেবভাবটিকে চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন কোন্ মন্ত্রবলে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল, আর সেই মুক্তহৃদয় হইতে ভক্তির উৎস প্রবাহিত হইয়া অশ্রুর আকারে সেই মহাত্মার পদধৌত করিতে লাগিল! ক্ষণকাল পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল!

শোক তাপ, দুঃখ কষ্ট কমলাকান্তকে একটুও বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তিনি তখন নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন,—

'কালি, সব ঘুচালি লেটা।'

তাঁহার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। মুমূর্ষু কমলাকান্ত তখন সকলকে বাধা দিয়া বলেন,

কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব?
আমি, কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে,
বিমাতার কি শরণ ল'ব?

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কোটালহাট গ্রামে ইঁহার বাসের নিমিত্ত সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এইখানে কমলাকান্ত প্রতিবৎসর মহাসমারোহে কালীপূজা করিতেন। পূজার দিন আপামর সাধারণ সকলে

সমবেত হইয়া তাঁহার সঙ্গীত-পীযূষ পান করিত। আমরা তাঁহার একটি গান দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রামকেলী—একতালা।

জাননারে মন, পরম কারণ,
শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥ ইত্যাদি।

১৩২৩ সাল

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।*

শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে একজন সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। তিনি কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্যামাবিষয়ক গানগুলি এত মধুর যে, আপামর সাধারণ তাহাতে মুগ্ধ! এখনও সাধক কমলাকান্তের রচিত শ্যামাবিষয়ক অনেক গান লোকের কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। অনেক কৃষকের, অনেক রাখাল বালকের মুখে কমলাকান্তের গান শুনিতে পাই। যে কমলাকান্ত একদিন সাধনার উচ্চতম সোপানে আরোহন করিয়াছিলেন,—সেই কমলাকান্ত সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। রামপ্রসাদের পর কমলাকান্তের মত সাধক আর একটীও জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামপ্রসাদের অনেক গান আছে। কিন্তু কমলাকান্তের গান বেশী পাওয়া যায় না। যে দুই একটী পাওয়া যায়, তাহাতেই তিনি যে কিরূপ একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন, তাহা বুঝা যায়! কমলাকান্তের একটী গান,—

মুলতান—আড়াঠেকা।

বামা কে রে এলো চিকুরে।
বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদি'পরে।

---

* ১৩২৩ সালের "সাহিত্য-সংবাদ" (ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা) হইতে সংগৃহীত।

বসন নাহিক গায়,
পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চলে' যেতে টলে' পড়ে আসবভরে। ইত্যাদি ॥

অনেকে বলেন,—'কালো রূপে জগত-আলো' কেমন করিয়া হয়? কিন্তু ইহা যে কেমন করিয়া হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইহা মাত্র অনুভূতিগম্য। সে এক হইয়াছিল,—ব্রজের গোপীগণের। তাঁহারা 'কাল রূপে জগৎ-আলো' দেখিয়াছিলেন। সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। তেমন হইতে পারিলে, ভক্তিমার্গের ততটা উচ্চে উঠিতে পারিলে, প্রেম-সিন্ধুর ততখানি অতলে ডুবিতে পারিলে, তবে হয়। প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকে পাইয়া প্রাণের সবটুকু তাহাকেই বিলাইয়া দিতে পারিলে, তাহাতেই তন্ময় হইতে পারিলে, তাহারই সৌন্দর্য্যে নিজের প্রাণ মন জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতে পারিলে, তখন সেই সৌন্দর্য্যে সব সুন্দর হইয়া যায়,—সেই রূপে সবই আলোময় হয়।

সাধক কমলাকান্তের তাহাই হইয়াছিল। তিনিও শ্যামা-মায়ের 'কালোরূপে জগৎ আলো' দেখিয়াছিলেন। কোনও খানেই তিনি এই 'কালরূপ' ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। কমলাকান্তের চক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন কালরূপে আলোময় হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি পরমানন্দে গাহিয়াছিলেন,—

"সমর আলো করে কার কামিনী?"

এই কালরূপে শুধু যে তিনি নিজেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি দেখিতেন, ব্রহ্মাণ্ডের সবই ঐ কালরূপে মুগ্ধ। তাই একটী গানে তিনি বলিয়াছেন,—

"তায় শিবের নয়ন ভুলেছে;—
নিরুপমা রূপ চিকণ কাল হেরিয়ে।"

শ্যামা-সাধনায় তিনি এতদূরই তন্ময় হইয়াছিলেন। তাই তিনি সিদ্ধপুরুষ—তাই তিনি মহাত্মা। সাধকশ্রেষ্ঠ কমলাকান্ত সাধনার কেমন উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, শ্যামা-মাকে তিনি কেমনভাবে ভাবিতে পারিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তিনি 'কালরূপে জগৎ আলো' দেখিতেন এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূক্ষ্ম-স্থূল যাবতীয় পদার্থ, সদসৎ, জ্ঞান-ভক্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আদি সকলই গুটাইয়া লইয়া তাঁহার একনিষ্ঠ মন কেমন করিয়া শ্যামা-মার রাঙ্গাচরণে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার গান দেখিলে তাহা কতকটা বুঝা যায়। আমরা এই ভাবের দুইটী গান ক্রমান্বয়ে এই স্থানে উদ্ধৃত করিব।

ললিত—একতালা।

কেনরে আমার শ্যামা-মাকে বল কাল।
যদি কাল বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো ?
(মা মোর) কখনও শ্বেত, কখনও পীত,
কখনও নীল-লোহিত রে ;—
আমি বুঝিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেল ॥ ইত্যাদি।

জঙ্গলা—একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি।
কালী জগন্মনোমোহিনী এলোকেশী ॥
মাকে সবাই বলে কাল কাল,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী ॥ ইত্যাদি।

বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় সাধক-শ্রেষ্ঠ কমলাকান্ত জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সেখান হইতে বর্দ্ধমানে গমন করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত করেন এবং উত্তরকালে ইনি মহারাজের গুরু হন।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কোট্টালহাট গ্রামে কমলাকান্তের বাসের জন্য একটা সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কমলাকান্ত সেই বাড়ীতে কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন এবং সেইখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিয়া সাধনা করিতেন। এ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময় এখানে মহাসমারোহ হইত। নানা স্থান হইতে অনেক লোক কমলাকান্তের গান শুনিবার জন্য এখানে আগমন করিতেন।

কমলাকান্ত কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সংসারের তুচ্ছ ভয়-ভাবনা কেমন করিয়া হৃদয় হইতে দুরীভূত করিয়াছিলেন, এবং তিনি শ্যামা-মায়ের কিরূপ একান্ত ভক্ত ছিলেন, আর তাঁহার মাহাত্ম্যই বা কতখানি ছিল, তাঁহার জীবনের একটী ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে ঘটনাটী এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

এক সময়ে তিনি 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা' নামক বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলেন। শুনিতে পাই, সেকালে এই "ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায়" অনেক পথিক দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইত। এখন সে স্থানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সেই বিশাল প্রান্তরের অনেকাংশে এখন চাষ-আবাদ চলিতেছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে রাস্তা গুস্কারা হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান-কাটোয়ার রাস্তার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই রাস্তা এই "ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার" উপর দিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, কমলাকান্ত গভীর রাত্রে একাকী সেই প্রান্তর দিয়া আসিতেছিলেন। জন কয়েক দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সাধক কমলাকান্তের সে সময়ে মনের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন। যখন তিনি দেখিলেন, সেই দস্যুদলের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর কোনও উপায় নাই, মৃত্যু অনিবার্য্য; তখন তিনি নির্ভীক হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন,—

"আর কিছু নাই গো শ্যামা,
কেবল তোমার দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
শুনে হলাম সাহস-ভাঙ্গা।" ইত্যাদি।

এই সঙ্গীত-পীযূষপানে মহাপাতকী দস্যুগণও বিচলিত হইল। যে নিষ্ঠুর দস্যুদল তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তাহারাই আবার এখন তাঁহার চরণে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল ;—কত কাঁদিয়া, কমলাকান্তের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই কমলাকান্ত সংসারের সর্ব্ববিধ শোকতাপ, দুঃখকষ্ট কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ চিতার উপর স্থাপিত হইয়াছে। ধূ ধূ করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিতেছে। কমলাকান্ত এতক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে সব দেখিতেছিলেন, আর বিভোর হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল কি যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন ;—

'কালী, সব ঘুচালি ল্যাটা।'

যখন কমলাকান্তের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র থাকিয়াই এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কমলাকান্ত শুনিয়া গাহিলেন ;—

"কেন? আমার কি গরজ গঙ্গাতীরে যাব?
আমি কালীমায়ের ছেলে হয়ে, বিমাতার কি শরণ লব?"

কালীমায়ের চরণে তিনি এমনই মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন!

১৩২৪ সাল

কমলাকান্ত বীরভূম জেলার বিখ্যাত তারা পীঠে উপস্থিত হন।

তখন তথায় তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জনৈক সিদ্ধকৌল অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কমলাকান্তের ভক্তি হইল,—কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ইনি তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ সিদ্ধকৌল, তাই তখনই তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। সাধুটীও কমলাকান্তের অবস্থা অবগত হইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া আগমশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত সাধনরহস্য অবগত হইয়া বুঝিলেন, সংসার ছাড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। বরং তন্ত্রোক্ত সাধনায় গৃহ ও গৃহিণীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। চারিবৎসরের পর নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন এবং তারাপীঠে যাইয়া সস্ত্রীকে অভিষেক এবং ক্রমদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীমৎ চিদানন্দ। *

১২১৬ বঙ্গাব্দে কমলাকান্ত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোটালহাট গ্রামে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া সস্ত্রীক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি নির্জ্জনে বসত বাটীর পশ্চাৎদিকের উদ্যানে যথাবিধি পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রত্যহ তথায় জপ করিতেন, পার্ব্বণ দিনে সস্ত্রীক কুলাচার পদ্ধতিতে পূজা জপাদি সম্পন্ন করিতেন। অবকাশ কালে নিজে গান রচনা করিয়া গাহিতেন।

তিনি নির্জ্জন পঞ্চবটীতে জপ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন, তিমিরাবৃত বনভূমি সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল এবং সেই জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি অবস্থিতা। তিনি আনন্দে 'মা মা' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে জ্যোতিঃরাশি অন্তর্হিত হইল। পূর্ব্ববৎ

---

* 'সাধকাষ্টক' গ্রন্থের কমলাকান্ত ঠাকুর প্রবন্ধ হইতে প্রবাদটী সংগৃহীত। শ্রীমৎ চিদানন্দ কমলাকান্তের পিতামাতা ও তারাপীঠে ক্রম-দীক্ষাদি সম্বন্ধে বর্দ্ধমান নিবাসী জনৈক পরিব্রাজক মহাশয়ের নিকট বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার।

অন্ধকারে বনভূমি আবৃত হইল। এইরূপ ঘটনা তিনচারি দিন ঘটিয়াছিল। তদনন্তর একদিন গভীর রাত্রে জপকালে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। পরে অন্তরের মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, যেন তিনি বহু উচ্চে এক পর্ব্বতের শীর্ষদেশে উপনীত হইয়াছেন। সেস্থান অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত, পার্থিব জগতের বহির্দ্দেশে অবস্থিত। কেমন নিভৃত ও শান্তিময় প্রদেশ। জন মানবের প্রসঙ্গও নাই, কেবল পাহাড়—পাহাড়ের গায়ে শ্বেত, পীত, লোহিত কুসুম গুচ্ছ আর সুগন্ধ ও শোভা। সেই নয়ন-মন-তৃপ্তিকর শোভার সঙ্গে দূরাগত বীণাঝঙ্কারের ন্যায় নির্ঝরিণীর শব্দ, পাখীর কাকলি; ভ্রমরগুঞ্জন ও ঝিল্লীর অবিরত নিক্কণে কমলাকান্তের মন প্রাণ উধাও হইয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন কোন এক অজ্ঞাত অজানিত, অথচ চির আকাঙ্ক্ষিত প্রদেশে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদিতন্ত্রে যেন শান্তির অমৃতধারা বহিয়া গেল। সহসা তাঁহার চ'খের সামনে আর এক অভিনব সৌন্দর্য্য ভাসিয়া উঠিল।

কমলাকান্ত দেখিলেন সেস্থানের চারিদিকে পবিত্র—স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে। সম্মুখে বিচিত্র চারু কারুকার্য্য খচিত দুগ্ধধবল শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে রত্ন সিংহাসনে কর্পূর গৌর শিবমূর্ত্তি; তাঁহার বামে রজত-কাঞ্চনকান্তি গৌরী অবস্থিতা। তাঁহাদের অপরূপ রূপে মন্দির উদ্ভাসিত। তিনি আত্মহারা ভাবে যুগলমূর্ত্তি দেখিতেছেন, সহসা সেইস্থানে তারাপীঠের সেই অবধূত—কমলাকান্তের কৌলগুরু যেন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"বৎস! এই তোমার ইষ্ট দেবদেবী বসিয়া আছেন, প্রাণ ভরিয়া দর্শন স্পর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া লও।" অনন্তর তিনি মুহূর্ত্তে উক্ত যুগল মূর্ত্তির সহিত মিশাইয়া গেলেন। কমলাকান্ত 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া সিংহাসন তলে

লুটাইয়া পড়িলেন। জগজ্জননী যেন সাদরে ও সস্নেহে তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। সে সুখস্পর্শে কমলাকান্ত জ্ঞান হারাইলেন।

যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি ভোর হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর পা দুখানি স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিতে গেলেন, কিন্তু মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন; পরে তাঁহার স্ত্রীকে ভর করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে হাস্য মুখে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর চতুর্দ্দিকে তাঁহার সিদ্ধির কথা প্রচারিত হইয়া পড়ে। অনেক লোক তাঁহার দৈবশক্তি প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য হন। এই সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন।

কথিত আছে সাধকের মৃত্যুর পর মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের ব্রাহ্মণ-শিষ্য ও ছাত্রগণের সাহায্যে তদীয় পূতদেহ বাগানবাড়ীর সেই পঞ্চবটীতে আনয়ন করিলেন। তথায় চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃতদ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দেহের সৎকার সম্পাদিত হইল। অনেকে ভক্তিভরে সেই পবিত্র চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিল। মহারাজ দীন দরিদ্রগণকে অর্থ, বস্ত্র ও আহার্য্য বিতরণ করিলেন। কমলাকান্ত বহুদিন চলিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার সাধন ভজনের কথাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তদ্রচিত ভাব-ভক্তিমূলক সুললিত সঙ্গীতগুলি দেশবাসীর নিকট তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ভক্ত, শিষ্য ও তদ্দেশবাসী সাধারণের নিকট "ঠাকুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৺ ১৩২৬ সাল

কমলাকান্তের ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে কমলাকান্ত অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তিরস্কার করিয়াও তাঁহাকে অধ্যয়নে বসাইতে পারিতেন না। কিন্তু পাঠ আবৃত্তি করিবার সময় তিনি অন্যান্য সহাধ্যায়িগণ

শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা।*

অপেক্ষা সমস্ত বিষয়ে বিশেষরূপে পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। তখন তিনি অন্য কোন অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন বলিয়া তাঁহার অধ্যাপকের মনে সন্দেহ হয়, এবং কোথায় কাহার নিকটে তিনি অধ্যয়ন করেন, জানিবার জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

অধ্যাপক একদিন দেখিলেন, কমলাকান্ত অতি প্রত্যূষে বিশালাক্ষীর মন্দিরে গমন করিতেছেন। তিনি সংগোপনে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কমলাকান্ত মন্দিরের পশ্চাতে নির্জ্জনস্থানে এক আসন পাতিয়া তাহাতে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন এবং একাসনে বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ রহিলেন। অন্য একদিন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দেখিলেন, বালক কমলাকান্ত ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, শিমূলতলার পঞ্চমুণ্ডের আসনে যাইয়া, যোগাসনে উপবেশন করিলেন, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত ধ্যানস্তিমিতনেত্রে একাসনে নিশ্চল রহিলেন।

আছে কিনা জানা যায় না। গ্রন্থকার।

অন্য একদিন কমলাকান্তকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপক তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, এবং দেখিলেন, তিনি প্রাণশূন্য মৃতদেহের মত বিশালাক্ষীর পুষ্করিণীর জলে ভাসমান। তখন সকলে যেমন চমৎকৃত তেমনিই শঙ্কিত হইলেন। কমলাকান্ত জলে ডুবিয়া

---

* শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা লিখিত 'শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিনী' প্রথম খণ্ড, 'কমলাকান্ত' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। সাধকের ছাত্রজীবন ও নারী বাগদীর কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি

আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহাই সকলে স্থির করিলেন এবং চীৎকার করিয়া অনেক গ্রাম্য লোক একত্র করিলেন। কমলাকান্তের দেহ সলিল হইতে উত্তোলন করা হইল। তখন সকলে দেখিলেন, তিনি সমাধিস্থ। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপকের মনের সন্দেহ বিদূরিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন কমলাকান্ত সাধারণ বালক নহেন। সিদ্ধ পুরুষের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, এবং কমলাকান্তকে সসম্মানে সমাদর করিতে লাগিলেন। সাধন-কুল-গৌরব কমলাকান্তের সাধনবিভূতির কীর্ত্তিপতাকা, যৌবনের প্রারম্ভেই উচ্চগগনে উড্ডীয়মান হইল।

নির্ভরশীল সাধক অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপক হইলেন। অধ্যাপক-মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন। মহাবিদ্যার গৌরবের সন্তান, সাধুতা, পাণ্ডিত্য ও যৌগিক বিভূতির বলে, সর্ব্বসমাজে সুপরিচিত ও আরাধনীয় হইলেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ত্রিতাপ-পরিপূর্ণ সংসারের বন্ধুর পথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু মনবুদ্ধি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীর শ্রীপাদপদ্মে সাবধানে অর্পিত রাখিলেন। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় কমলাকান্ত বিশালাক্ষীর মন্দিরে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মাতুলবংশীয় ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। ধর্ম্মদাস সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কমলাকান্ত পদাবলি রচনা করিয়া দিতেন, তিনি তাহাতে সুরলয় সঙ্গত করিয়া, বিশালাক্ষীর মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।

কমলাকান্ত সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক। তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্যা অন্যান্য চতুষ্পাঠী অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় বিশালাক্ষীর মন্দিরে অবস্থান করায়, তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যয়নের বিশেষ

অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। অনেক ছাত্র তাঁহার নিকটে বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাইয়া অধ্যয়ন করিয়া আসিতে লাগিলেন। ক্রমে দশবৎসর অতীত হইল। তাঁহার অনেক ছাত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। তখন অধ্যয়ন-পরায়ণ ছাত্রগণকে অধ্যাপক ছাত্রগণের নিকটে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। নিজে প্রিয়তম সঙ্গী ধর্ম্মদাসের সঙ্গে, জগজ্জননীর মহিমাকীর্ত্তনে, পরমানন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তখন মাত্র নামতঃ সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক রহিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ বিশালাক্ষীর সেবাইত হইলেন।

* * * *

* * * *

ধর্ম্মনারায়ণের মা ও নারী বাগ্দীর কাহিনী।

একদিন রাত্রি আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে এমন সময় কমলাকান্ত পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবেশন করিয়া, রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া,আনন্দময়ী মায়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া, কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

'আদর করি হৃদে রেখো, আদরিণী শ্যামা মাকে
তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন মন কেউনা দেখে॥'

ইত্যাদি।

জগজ্জননীর জগৎভরাভাবে নিমগ্ন হইয়া অনন্য অন্তরে কমলাকান্ত গান করিতেছিলেন। সহসা যেন মানুষের সমাগম অনুভব করিলেন, তাঁহার বোধ হইল, যেন কেহ তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া চারিদিক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন আসিয়া আবার আসনে উপবেশন করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পুনরায় মানুষের সমাগম অনুভব করিলেন। এবার প্রদীপ জ্বালিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের সম্মুখে গমন করিলেন। দেখিলেন,

মন্দিরের দ্বার কে যেন উন্মুক্ত করিয়াছে। তখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কাহাকেও না দেখিয়া, মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া, আবার আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। এবার আর কীর্ত্তন করিলেন না। কিন্তু সহসা শাল্মলী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কে বলিয়া উঠিল, "আর একটা গান গাও।"

কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

একটী প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক কমলাকান্তের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আমি ধর্ম্মনারায়ণের মা। ফুল তুলিতে আসিয়াছিলাম। তোমার গান শুনিতে এখানে আসিলাম।"

ধর্ম্মনারায়ণ জাতিতে গোয়ালা। সে বিশালাক্ষীর মন্দিরে দুগ্ধ দধি ক্ষীর ছানা ইত্যাদি প্রদান করিত। সে কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। খাঁকীবাবা বলিয়াছিলেন, "এই ঘটনার পর হইতে ধর্ম্ম কমলাকান্তের সেবক হইয়াছিল।"

ধর্ম্মের জননী মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কমলাকান্তের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। কমলাকান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আর এক একবার তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণসুধাকর সদৃশ নয়ন-মনোহর মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সে রূপ দর্শন করিয়া কমলের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইল। তিনি আত্মহারা হইয়া মা নাম কীর্ত্তনে আকুল হইয়া পড়িলেন। তখন ধর্ম্মনারায়ণের জননী তাঁহাকে কোলে তুলিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। এদিকে পূর্ব্বদিকের আকাশ পরিষ্কৃত হইয়া তরুণ অরুণের আগমন সংবাদ প্রচার করিল। জননী কমলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সহসা মন্দিরের দুয়ারে শব্দ হইল। কমলাকান্ত উঠিয়া মন্দিরের সম্মুখে গমন করিলেন। দেখিলেন কে যেন আবার মন্দিরের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়াছে। তিনি এবার কিছু চমৎকৃত

হইলেন। আবার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কে দ্বার উন্মুক্ত করিল, তাহা অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ বারাণ্ডায় বসিয়া রহিলেন।

অন্তরে কেবল ধর্ম্মনারায়ণের জননীর মুখকান্তি তরঙ্গায়িত হইতেছিল। তিনি আর একবার সেই ভুবনভরা রূপরাশি দর্শন করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার অন্বেষণে পুষ্পোদ্যানে গমন করিলেন, সেখানে না দেখিয়া ধর্ম্মনারায়ণের গৃহে গমন করিলেন এবং "মা" বলিয়া এক ডাক ছাড়িয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া, প্রাঙ্গণে পতিত হইলেন। পাড়ার লোক একত্র হইল ; সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কমলাকান্ত সে পাড়ায় জীবনে কখন গমন করেন নাই।

সকলে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলে তিনি ধর্ম্মনারায়ণকে বলিলেন, "তোমার মা কোথায় ?"

ধর্ম্মনারায়ণ চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, "দেব, আমার আবার মা কোথায় ? বয়স যখন মাত্র তিন মাস তখন মা আমার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত আকাশে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। এক বৎসর বয়সের সময় আমার পিতৃদেব আমাকে দুর্গতির গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার অভীষ্ট লোকে গমন করিয়াছিলেন। এক মাসীমার কোলে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম, তিনিও আজ দশবৎসর ইহলোক ত্যাগ করিয়া আমার পিতামাতার দেশে গমন করিয়াছেন। এখন আমি কেবলমাত্র দেহধারণের জন্য ব্যবসা করি। আর আপনার শ্রীমুখে মা নামের মহিমা শ্রবণ করিয়া, মার জন্য মন যখন বড় ব্যাকুল হয়, তখন বিশ্বজননী বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাইয়া মা মা বলিয়া হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করি। আমার মা ঐ বিশালাক্ষী, আর আমার বাবা সেই বিশ্বেশ্বর।" ধর্ম্মনারায়ণের কণ্ঠ ভক্তির আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল।

ধর্ম্মনারায়ণের সমস্ত কথা কমলাকান্ত নীরব নিস্পন্দ হইয়া শ্রবণ করিলেন। শ্রবণের সময় তাঁহার নয়ন কাটিয়া জলধারা বহির্গত হইয়া ধরাতল পর্য্যন্ত সিক্ত করিতে লাগিল। কমলাকান্ত সমস্ত বুঝিলেন, উন্মাদের মত বিশালাক্ষীর মন্দিরে গমন করিলেন। অগণ্য লোক তাঁহার সঙ্গে বিশালাক্ষীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। তিনি মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া কখনও হাসিতে লাগিলেন, কখনও কান্দিতে লাগিলেন। শেষে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। সে দিন কীর্ত্তনানন্দে বিশালাক্ষীর বিস্তৃত ভবন ঝঙ্কারিত হইল।

অন্য একদিন কমলাকান্ত মৎস্যের অভাবে চিন্তিত হইয়াছিলেন। এইস্থানে প্রত্যহ মৎস্যের ব্যঞ্জনে বিশালাক্ষীর ভোগ প্রদত্ত হইত। বহু চেষ্টায়ও সেদিন মৎস্য সংগৃহীত হইল না। মাতৃগতপ্রাণ কমলাকান্ত বিশালাক্ষীর ভোগের অন্তরায় ঘটিল বলিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। রাত্রি আসিল। আজ আর তাঁহার চক্ষে রাত্রিতে ঘুম আসিল না। তিনি গভীর রাত্রে পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবেশন করিয়া আপন মনে জগজ্জননীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কমলাকান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় পুষ্করিণীর দক্ষিণতীরে যেন জল সঞ্চালনের শব্দ উত্থিত হইল। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওখানে কে গো?"

উত্তর আসিল, "আমরা মাছ ধরিতেছি।"

কমলাকান্ত, "তোমার নাম কি?"

উত্তর আসিল, "নারী বাগ্দী।"

কমলাকান্ত, "যদি মাছ পাও, আমাকে দিও। আজ মায়ের ভোগে ব্যঞ্জন দেওয়া হয় নাই।"

কিছুক্ষণ পরে নারী বাগ্দী কমলাকান্তের নিকটে আসিয়া দুইটী মাগুর মাছ ও একটী শালমাছ তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিল। প্রদীপের আলোকে কমলাকান্ত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, নারী বাগ্দীর রূপের সীমা নাই। তাহার কৃষ্ণবর্ণ কলেবর হইতে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নয়নমনোহর জ্যোতি বাহির হইতেছে। সেই জ্যোতিতে প্রদীপের আলোক ম্রিয়মাণ হইয়া গেল—সেই জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণকান্তিতে রজনীর অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য বিদূরিত হইল এবং বৃক্ষলতা নীলকান্তিমাখা হইয়া দৃশ্যমান হইয়া উঠিল। ধীবরযুবতীর ত্রিভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কমলাকান্ত চমৎকৃত হইলেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কলেবর পর্য্যন্ত কেশ-পাশ-নিবদ্ধ কুন্তল, আকর্ণ-বিস্তৃত বিস্ফারিত নয়নদ্বয়, নীলকান্তিময় বদনমণ্ডলে মৃদুহাস্যযুক্ত বিম্ববিনিন্দিত অধরোষ্ঠ, শরদেন্দু-শোভিত নীলাকাশ তুল্য সিন্দূর-বিন্দু-পরিহিত জ্যোতির্ম্ময় বিস্তৃত ললাট, মৃণাল-বিনিন্দিত ভুজযুগল প্রভৃতি, এবং প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এক ধেয়ানে তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, ধীবরজাতির গৃহে এমন অলোকসামান্যা প্রতিভাময়ী রূপবতী থাকিতে পারে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। এই ভয়ঙ্কর স্থানে এই নিশীথ সময়ে এই দুঃসাহসিনী রমণী কোথা হইতে আসিল! এই যুবতী কোন্ ধীবরের গৃহলক্ষ্মী! সে কেন সঙ্গে আসিল না। কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি একা আসিয়াছ? তোমার ভয় নাই?'

নারী বাগ্দী—"আমি চিরকালই একাই আসি। তবে আমার আরও দুইজন সঙ্গিনী আছে। তুমি যখন এখানে থাক, তখন এখানে আসিতে ভয় কি? আর, আমি ত সর্ব্বদাই এখানে আসি যাই। আসিয়া তোমার গান শুনি।"

কমলাকান্ত—"বটে তুমি সর্ব্বদাই আস যাও! কিন্তু আমি ত

তোমাকে আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তুমি কি আমাকে চেন ?"

নারী বাগ্দী—"চিনি বই কি, তোমাকে আবার কে না চেনে। যাহারা তোমার মত সর্ব্বস্ব ভুলিয়া, দিবারাত্রি মা মা বলিয়া, গান করে, তাহাদিগকে সকলেই চেনে। তুমি যখন মা মা বলিয়া গান গাও, তখন আমার মনপ্রাণ পাগল হইয়া তোমার নিকটে ছুটিয়া আসে। তোমাকে আবার চিনি না ?"

কমলাকান্ত—"বটে, তুমি আমাকে চেন, কিন্তু আমি ত তোমাকে চিনি না।"

নারী বাগ্দী—"যদি না চিনিয়া থাক, তবে আজ চিনিয়া রাখ, আর, যদি না দেখিয়া থাক, তবে এখন ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ, পরে আর ভুল হইবে না। তুমি বিশালাক্ষীর ভোগের জন্য মাছ পাও নাই, তাই তোমাকে মাছ দিতে আসিলাম। এখন আমি যাই।"

কমলাকান্ত আসন হইতে উত্থিত হইলেন, যুবতীর সঙ্গে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু লজ্জা ও শিষ্টাচার তাঁহার গতি রোধ করিল। যুবতী আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, মৃদুমধুর হাস্যে বনভাগ উদ্ভাসিত করিয়া, সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাও ?"

কমলাকান্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মাছের মূল্য ত দিতে পারিলাম না।"

নারী বাগ্দী—"কাল দিও।"

কমলাকান্ত আসনে উপবেশন করিয়া, যতদূর দৃষ্টি চলিল, এক ধেয়ানে নারীবাগ্দীকে দেখিতে লাগিলেন। মরালগামিনী নারীবাগ্দী মৃদুমন্দ গমনে দৃশ্যের অতীত জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বিশালাক্ষীর সেবাপরায়ণ পরম ভাগবত, কমলাকান্ত, বিশালাক্ষীর ভোগের জন্য যে উদ্বেগে অস্থির হইয়াছিলেন, মৎস্য প্রদান করিয়া নারীবাগ্দী সে উদ্বেগের অবসান করিয়া গেল।

যিনি ভ্রান্তিরূপিণী, যাঁহার মায়ায় ত্রিজগৎ ভ্রান্তিময়, কত হরিহরবিরিঞ্চি যাঁহার মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া, সামান্য জীবের মত হাসি-কান্নার অধীন হন, কমলাকান্ত সন্তান হইয়াও তাঁহার মায়া অতিক্রম করিতে পারিলেন না।

নারীবাগ্দী অন্তর্হিতা হইল। কমলাকান্ত চমকিয়া উঠিলেন, তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার জন্য উন্মত্ত হইলেন; সর্ব্বাঙ্গ ভাবের আবেগে ঘর্ম্মাক্ত হইল, তাহার গমনপথে দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন, এবং "নারীবাগ্দী, নারীবাগ্দী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আর তাহার সন্ধান পাইলেন না।

রজনী প্রভাতা হইল। দিনকরের উদয়ে ধরণীতল দৃশ্যমান হইল। কমলাকান্ত মৎস্যের মূল্য দান করিতে সমগ্র চান্না অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু সেই ত্রিলোকভুলানী ইন্দ্রনীলরত্নবরণা নারীবাগ্দীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সমস্ত কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; যে একদিকে করুণাময়ী অন্যদিকে ছলনাময়ী, তাহার খেলা তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন; তখন ভক্তির আবেগে ভাবের আবেগে, হর্ষবিষাদে, অজ্ঞান, অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

* * * *

মহিষ বলির কথা। সাধক কমলাকান্তের বিষ্ণুনামে এক ভৃত্য ছিল। সেই ভৃত্য সাধকের বড়ই অনুগত ছিল। একদিবস কমলাকান্ত কালীপূজার রাত্রে সুরা সেবন করিয়া স্তিমিত নয়নে বসিয়া আছেন; এদিকে কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অবিরত গান নিঃসৃত হইতেছে। তাঁহার অসাবধানতায় ইতিমধ্যে পূজার সময় অতীত হইয়া যায়। তাঁহার ভৃত্য বিষ্ণু স্বর্ণকার বলিল,—'ঠাকুর পূজার সময়

শ্রীবলাইলাল মুন্সী। *

* হাবড়ার শ্রীবলাই লাল মুন্সী এই প্রবাদটী—'নন্দিনী' (১৩২৬ সালের শারদীয়া সংখ্যা) পত্রিকায় "সাধক কমলাকান্ত" প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার।

অতিবাহিত হইতে চলিল—এদিকে ভয়ঙ্কর মেঘ করিয়া আসিতেছে; আর বিলম্ব কেন? আমাকে পূজার সমস্ত আয়োজন করিতে অনুমতি করুন।' কমলাকান্ত বলিলেন—'পূজার আয়োজন করিবে কি? মহিষ না হইলে মায়ের পূজা হইতেছে না, একটী মহিষ লইয়া আইস।' সে দিবস অমাবস্যার রাত্রি, উপরন্তু ভয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত; সুতরাং বিষ্ণু উত্তর করিল,—'ঠাকুর! এ ভয়ানক দুর্য্যোগে কিরূপে মহিষের অনুসন্ধান করিব? পূর্ব্বে যদি আমায় অনুমতি প্রদান করিতেন তাহা হইলে আমি যথাসাধ্য সন্ধান করিতাম। উপস্থিত আপনার যেমন পূজা হইয়া থাকে সেইরূপই করুন।' সাধক বলিলেন—'না, তাহা হইবে না। তুমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আইস, অবশ্যই মহিষ পাইবে।' বিষ্ণু অগত্যা বহির্গত হইল এবং একটী প্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিল; কিন্তু কুত্রাপি মহিষের সন্ধান পাইল না। পরিশেষে একটী ক্ষীণালোক তাহার নয়ন গোচর হইল। আলোকটী সেই পথ হইতেই আসিতেছিল। বিষ্ণুরাম দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল কতকগুলি লোক একটী আলোক লইয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইতেছে। বিষ্ণুরাম আশ্চর্য্যের সহিত দেখিল, লোকগুলি একটি মহিষ লইয়া যাইতেছে। সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমরা কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ এবং কোন্ স্থানে যাইবে?' তাহারা উত্তর করিল, 'আমরা অনেক দূর হইতে আসিতেছি। ঠাকুর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কালীর নিকট আমাদের মনিবের একটী মানসিক মহিষ আছে; এই মহিষটী লইয়া আমরা তাঁহার নিকট যাইতেছি।' বিষ্ণুরাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল এবং সাধককে মহিষের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। অতঃপর তাঁহার অনুমতিক্রমে যথারীতি আয়োজন ও পূজা শেষ হইল।

* * * *

কামিনী কাঞ্চনে অনুরক্তি। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কমলাকান্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া তাঁহাকে রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আপনি কামিনী-কাঞ্চন লইয়া কিরূপে সাধন ভজন করেন, তাহা বলিতে পারি না।' ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর সতী নারীগণ সেই আদর্শ সতী ভগবতীর অংশরূপিণী। শাস্ত্রমতে 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগৎসু' অর্থাৎ জগতে সমস্ত স্ত্রীই সাধারণতঃ জগদম্বার অংশোদ্ভূতা, বিশেষতঃ সতীগণই সেই মহাশক্তি সতীর শক্ত্যংশস্বরূপিণী সন্দেহ নাই; অতএব সংসারে সুদুর্লভ রত্ন সতীস্ত্রী কদাচ সাধন ভজনের বিঘ্নপ্রদা নহেন, বরং সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা সমধিক সহায় স্বরূপিণী। সাধ্বী স্ত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

'জীবনী-সংগ্রহ' লেখক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। *

'নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধু নাস্তি ভার্য্যা সমাগতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমোলোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে॥'

সাধ্বী ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা, তিনিই যথার্থ "সহধর্ম্মিণী" পদবাচ্য, সুতরাং সাধন ও ভজন পথের তিনিই উৎকৃষ্ট আনুকূল্যরূপিণী। এরূপ সাধন সহায়িনী ভার্য্যাই তন্ত্রশাস্ত্রে "শক্তি" পদবাচ্য। এইরূপ শুদ্ধ সাধনসাধিনী পতির প্রিয়ান্তরঙ্গিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী কদাচ "কামিনী-কাঞ্চনের" কামিনী নহেন। কামিনী-কাঞ্চনের কামিনী ইহা হইতে স্বতন্ত্র।' কর্ম্মচারী কমলাকান্তের কথায় তুষ্ট হইয়া পরে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

* জীবনী-সংগ্রহ। পৃঃ ২৫৬। ৫ম সংস্করণ ১৩২০ সন

কমলাকান্ত একশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি শাক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ কোন প্রভাব কমলাকান্তের উপর আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। চণ্ডী-দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ যে ভাবে সাধন করিতেন, কমলাকান্তের সাধন-প্রণালী তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি তন্ত্রোক্ত প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসও প্রথমে তান্ত্রিক ছিলেন। তিনিও প্রথমে তন্ত্রাচার অবলম্বন করেন। কিন্তু শেষে সে প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। কমলাকান্ত ব্রহ্মকে নারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র; আর কিছু করেন নাই।

কমলাকান্ত-প্রসঙ্গে
নীলরতন মুখোপাধ্যায়।

* * * *
* * * *

কমলাকান্ত প্রসঙ্গে পত্রাবলী

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুমতিক্রমে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ লিখিয়াছিলেন—

মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতির পত্র। ১। কমলাকান্তের অপ্রকাশিত পদাবলী কিছু নাই।

২। কমলাকান্তের বাস্তভিটার ফটো নাই।

৩। হাতের লেখা রাজষ্টেটে নাই।

৪। শ্রুতি আছে মহারাজ তেজচন্দ্ তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনও দলিলাদি অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যায় নাই।

৬। সম্ভবতঃ কমলাকান্তের বংশের কেহ এখন জীবিত নাই; তবে ঠিক বলিতে পারি না।

৭। তাঁহার কোনও তৈলচিত্র নাই।

৯। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত, তৎসম্বন্ধে কোনও কাগজ-পত্র রাজষ্টেটে নাই।

৫।৮। মহারাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর তাঁহাকে কাল্না হইতে বর্দ্ধমানে আনিয়া কোটালহাটে বাসের জন্য স্থান ও বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে এবং তথায় এখনও মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ব্যয়ে ৺ শ্যামাপূজার রাত্রে পূজা হইয়া থাকে। তথায় ৺ কালী মূর্ত্তি ও মন্দির আছে, এই গৃহ ও মন্দির বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। তিনি সেই আসনে উপবেশন করতঃ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন। অনেক সন্ন্যাসী এই স্থান দর্শন অভিলাষে আসিয়া থাকেন কিন্তু কেহই অধিক রাত্রে জপে বসিয়া থাকিতে পারেন না। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রণীত "কমলাকান্ত" নামক পুস্তকে ইঁহার কিছু বিবরণ আছে। ভুলুয়া বাবাজী নামক এক সন্ন্যাসী, যিনি বর্ত্তমানে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত খানখানাপুরে আছেন, তিনি যে জীবনী লিখিয়াছিলেন যাহা সাহিত্য-সম্মিলনীর সময় টাউন হলে পঠিত হইয়াছিল তাহাতেও অনেক কথা আছে; **এই জীবনী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর নিকট আছে।** খানা জংশনের নিকট চান্নাগ্রামে কমলাকান্তের মাতুলালয়; এই স্থানে এক সন্ন্যাসী আছেন তিনি তাঁহার জীবনের অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন শুনিয়াছি। ইঁহার নিকট সন্ধান করিলে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। কলিকাতার শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর নিকটও কিছু জানা যাইতে পারে। মহারাজ তেজচন্দ্ বাহাদুরের

সভাপণ্ডিত পদে ১২১৬ সালে নিযুক্ত হইয়া কমলাকান্ত জন্মস্থান কালনা হইতে বর্দ্ধমানে আসেন। ইঁহাকে সাধক বলিয়া চিনিতে পারিয়া মহারাজ যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। ইঁহার সহিত প্রতাপচাঁদের যে সম্পর্ক ছিল তাহা মহারাজ বাহাদুর প্রণীত কমলাকান্ত নাটকে লিখিত হইয়াছে।

১১। কমলাকান্তের হাতের লেখা সম্ভবতঃ চান্নাগ্রামে যতীন্দ্র নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট পাওয়া যাইতে পারে।

(SD) S. K. Bose

শ্রীশ্রীদুর্গা

বর্দ্ধমান রাজষ্টেট।
জমিদারী কাছারী
১লা এপ্রিল। ১৯২০।

To
The Private Secretary of the Hon'ble the Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan.

Dear Sir, So far as I know Rupee one only is paid every year by the Raj on account of আষাঢ়ে নবমী পূজা ও বিশালাক্ষী ঠাকুরাণী at Chunna.

And Rs 4 : was used to be paid by the Raj (Rs 2: in Ashar and Rs 2: in Aswin in every year) when Lat Chunna was a Khas Mahal. It has since been let out in putni; whether the Putnidar or the Raj now pays this Rs 4:

I do not know. On this point as well as on other matters stated in your slip I shall inform you as far as possible, after enquiry. About 100 bighas of land or so were dedicated by the Raj for the due performance of Puja of the Debi. All these records are lost or mislaid but the *Shebaits* may have the original ছাড় or a copy of it with them.

I remain,
Yours truly,
Sd C. Sinha.
Dewan.

চান্না শ্রীশ্রী৺ বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির। *

১। বর্দ্ধমাননিবাসী ৺ মানিকরাম বাবু শ্রীশ্রী৺ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গঠনপ্রণালী তান্ত্রিকভাবে নির্ম্মিত। ঐ মন্দির কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২। শ্রীশ্রী৺ বিশালাক্ষী তান্ত্রিক দেবী, কবি চণ্ডীদাস উক্ত দেবীর উপাসক ছিলেন না।

৩। মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রী৺ বিশালাক্ষী দেবীর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাহি কেন বা কোন সাধু পঞ্চমুণ্ড সাধনযোগে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শ্রীশ্রী৺ বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠার বহু বৎসর পর মহাত্মা কমলাকান্ত উক্ত পঞ্চমুণ্ড আসনে

* মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর ১৩ই এপ্রিল (১৯২০) তারিখের পত্রের সঙ্গে প্রেরিত।

সিদ্ধলাভ হয়েন এবং মহাত্মা কমলাকান্তের ঐ স্থানেই আসন আছে। মুণ্ডগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত।

৪। শ্রীশ্রী৺ বিশালাক্ষী দেবীর ধ্যান তন্ত্রে লিখিত আছে। 'ধ্যায়েৎ দেবীং....................দুর্গায়ৈ নমঃ।'

তান্ত্রিক নিয়মে পঞ্চোপচারে নিত্যপূজা হইয়া থাকে। ভোগ বা শীতলের কোন ব্যবস্থা নাই। (Report from an old inhabitant of Chunna)

৫। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও পঞ্চমুণ্ড আছে বলিয়া জানা নাই।

৬। উক্ত দেবীর সেবাপূজার ব্যয় ভার জন্য বর্দ্ধমান রাজসরকার জমি ও ডাঙ্গাতে ৯৯/ বিঘা অর্পণ করিয়াছেন। দৈনিক পূজার বরাদ্দ /১৷০ সের আতপ, মিষ্টান্ন ও রম্ভা আদিতে দৈনিক ।১০ আনা হিসাবে মাসিক ৮।৶ টাকা খরচ হয় পাণ্ডারা কহে। (Report from an old inhabitant of Chunna)

* * * *

১। বর্দ্ধমান নিবাসী ৺ মানিকরাম বাবু ও ৺ বাঞ্ছারাম চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রী৺ বিশালক্ষী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গঠন প্রণালী তান্ত্রিকভাবে নির্ম্মিত, ঐ মন্দির কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২। বিশালাক্ষী তান্ত্রিক দেবী, কবি চণ্ডীদাস উক্ত দেবীর উপাসক ছিলেন না।

৩। মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী দেবীর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই কেন? বা কোন সাধু পঞ্চমুণ্ড সাধনযোগে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মহাত্মা কমলাকান্ত উক্ত পঞ্চমুণ্ড আসনে শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠার বহু বৎসর পর

সিদ্ধলাভ হয়েন। মুণ্ডগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত।

৪। 'ধ্যায়েৎ দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তকাঞ্চনজম্মুনদপ্রভাং' ইত্যাদি ধ্যান।

৫। উক্ত দেবীর তান্ত্রিক নিয়মে পঞ্চপোচারে নিত্যপূজা হইয়া থাকে। ভোগ বা শীতলের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। অন্য কোথাও পঞ্চমুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না।

৬। উক্ত দেবীর সেবাপূজার জন্য বর্দ্ধমান রাজসরকার জমি ও ডাঙ্গাদিতে ৯৯/ বিঘা জমি অর্পণ করিয়াছেন। বহুকাল হইতে /১। পাঁচ পোয়া আতপ, রম্ভা ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা হইয়া থাকে।

৭। মন্দিরে কোনরূপ প্রস্তর বা ইষ্টক লেখা নাই। মন্দির বহুদিন পূর্ব্বে একবার সংস্কার হইয়াছিল, সংস্কারের পূর্ব্বে কোনরূপ লেখা ছিল কিনা বলা যায় না।

৮। সেবায়তগণ যৎসামান্য আতপ দিয়া পূজা করিয়া থাকে। সেবায়তগণ ঐ জমির মধ্যে অনেক জমি নিজের নাকরাজ বলিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন, শুনা যায়।

(স্বাঃ) শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং চান্না
সেরেস্তা
বর্দ্ধমানরাজ

* * * *

Home Secretariat, Burdwan Raj.
8. 5. 20.
No. G. 54—1327

The Private Secretary to the Hon. the Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan, "Bijoy-Manzil."
Alipur, Calcutta.

Dear Sir,

In reply to your letter of the 10th April last I have to state the following :—

(a) The piece of black stone which is to be found at the foot of the Bel tree is generally known to be the *Bhairab* (আসন রক্ষক) of the place. Nothing more is known about this.

(b) Some people say that the *Panchamundi Ashan* of the saint is situated at the foot of the Bel tree but this is not correct. The eastern room in the temple is generally believed to contain the said *Ashan*.

(c) The Trimundi Ashan at Borehat was the place where Kamalakanta used occaisonally to pass his time in Jog (যোগ)

(d) The pucca shed at Kotalhat was constructed by the Burdwan Raj at a cost of Rs 450.

(e) The Burdwan Raj pays every year Rs 20 for Puja expenses on the Kalipuja day.

(f) The Pooja expenses of Bishalakhmi at Chunna are met from the income of 99 bighas of land granted by the Burdwan Raj. The Poojas are performed according to Tantra Shastras. A large number of people assemble at the place for worshipping the goddess on the 9th day of the new moon, both in Ashar and Aswin every year.

The original letter of Babu Atulchandra Mukharji is returned herewith.

Yours faithfully
Sd H. K. Chatterji
Dy Manager.

৭নং ময়মনসিং রোড,
রমণা, ঢাকা।
১৬ই জুলাই, ১৯২০।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপে—

বিনীত নিবেদন—

আপনার প্রশ্নাবলী সমন্বিত পত্রগুলি যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অনুসন্ধানে বিলম্ব ঘটায় প্রত্যুত্তর দিতে দেরী হইল। বাঞ্ছারাম চক্রবর্ত্তীর কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারা গেল না। বর্দ্ধমাননিবাসী ৺মাণিকরাম বাবুই পরে মুরশিদাবাদের তৎকালীন নবাব বাহাদুরের অধীনে দেওয়ান "মাণিকচাঁদ" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর ছায়াচিত্র প্রাপ্তব্য নহে তাহা ইতিপূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। তাঁহার প্রমাণসিদ্ধ কোনও ইতিহাসও নাই; প্রবাদ আছে বন্যার পর বাঁকানদীর গর্ভে কোনও চূণারী অথবা সন্ন্যাসী তাঁহাকে বালুকামধ্যে কুড়াইয়া পান এবং তৎকালীন বৰ্দ্ধমানেশ্বরকে তাহা অর্পণ করেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা বৰ্দ্ধমানাধিপতি রায় কীর্ত্তিচন্দের সময়ে ঘটে। প্রবাদ আছে তিনিই প্রথমে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর রত্নমন্দিরের সম্মুখে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা তদীয় সহোদর মিত্রসেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার নামানুসারে "মিত্রেশ্বর" নামে খ্যাত। বহির্বাটীর দক্ষিণভাগে যে দুইটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা রায় কীর্ত্তিচন্দের পুত্র রাজা চিত্রসেনের দুই পত্নী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; এই সকল এবং অন্যান্য কারণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে রায় কীর্ত্তিচন্দের সময়েই সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে মহারাজ তেজচন্দ্

পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবীর বর্ত্তমান রত্নমন্দির নির্ম্মিত করেন। ইহা ব্যতীত দেবীর পুরাতত্ত্ব আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। আপনার প্রেরিত কবিতাটির মর্ম্ম সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে। যথাকালে তদ্বিষয়ের সন্ধান জানাইব।

বশম্বদ—
(স্বাঃ) শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বসু
প্রাইভেট সেক্রেটারী।

* * * *

৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১২।৩।১৮

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনম্,

আপনার পত্র পাইলাম। সাধক কমলাকান্তের জীবন-চরিত সম্বন্ধে আপনাকে কোনরূপ সাহায্যই আমি করিতে পারিব না। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের এ বিষয়ে অনুমানের কোন মূল পাইতেছি না। মহারাজ মহতাপচাঁদের সঙ্কলিত পদাবলীও আমি দেখি নাই। আপনাকে সাহায্য করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম, ইহা সর্ব্বতোভাবে আমার সাধ্যাতীত। আপনি এ বিষয়ে উপাদান সংগ্রহের যত্ন করিতেছেন—আপনার চেষ্টা সার্থক হউক—নিতান্তই কৃতকার্য্য না হন, যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ। আশা করি কমলাকান্তের জন্মভূমিতে অনুসন্ধান করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র।

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৭।৩।১৮

সবিনয় নিবেদন,

শরীর অসুস্থ থাকায় আপনার দ্বিতীয় পত্রের যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। আপনাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে না পারিয়া দুঃখিত। সাধনপঞ্চক গ্রন্থের জন্য নিরালম্ব স্বামী মহোদয়কে সাহিত্য-পরিষদে পত্র লিখিতে বলিবেন। প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরিষদের কর্ম্ম করেন না। লাইব্রেরিয়ানের পদে অন্য লোক আছেন। আপনি সম্পাদককে চিঠি লিখিতে পারেন। আমি সম্প্রতি পরিষদের সকল কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছি, সেখানে একটা নূতন দল উঠিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিবার চেষ্টায় আছেন। তৎপূর্ব্বেই মানে মানে পরিষৎ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য বোধে ইস্তফা দিয়াছি। প্রবোধ বাবুর অবস্থাও তদনুরূপ। ঈষ্টারের ছুটিতে আমি কলিকাতাতেই থাকিব। কমলাকান্ত সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ দেখি নাই।

বিনত
(স্বাঃ) শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

Ashrama, Channa.
13. 3. 18.

সসম্মান নিবেদন

অপনার পত্র পাইয়াছি। পত্র পড়িয়া বুঝিলাম আপনি একজন সাহিত্যিক ও ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু।

আপনি যে সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র লিখিয়াছেন আমি তাহাতে আপনাকে কতদূর সাহায্য করিতে পারি বলিতে পারিনা, কারণ আমি একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, আপনার লক্ষ্য ও আমার লক্ষ্য বিভিন্ন, স্বভাবের পার্থক্য ত আছেই অবসরও অল্প। যাইহোক বর্দ্ধমানের মহারাজা আমার নাম উল্লেখ করিয়া কেন আপনাকে পত্র দিয়াছেন ও

শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর পত্র।

আপনার ঈপ্সিত কার্য্যের জন্য তিনি ও অন্যান্য সহধর্ম্মী ভদ্রলোকে আমার আশ্রম হইতে যাহা পাইয়াছেন ও যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছে তাহা আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে তাহা আপনাকে লিখিতেছি।

গত ১৩২১ সালে কালনা "পল্লীবাসীর" সম্পাদক (তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি), ফরিদপুরের "ভুলুয়া" নামক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ও বর্দ্ধমানের রাজকর্ম্মচারী দুইজন ভাদ্র মাসে এখানে প্রোক্ত উপাদান সংগ্রহ উদ্দেশ্যে আসেন। আমার জন্মস্থান এই গ্রামেই, আমি গ্রামের প্রান্তস্থিতা তটিনী তটে একটী সামান্য কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছি। আমি তাঁহাদের সঙ্গে বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া গ্রামের এক পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে **বিশালাক্ষী মন্দিরে, যেখানে সাধক কমলাকান্ত সাধনা করিতেন** (অবশ্য প্রবাদানুসারে) সেই স্থান ও অন্যান্য স্থান দেখাইয়া দিই। আমিও আমার আশ্রম হইবার পূর্ব্বে উক্ত মন্দিরে প্রায় এক বৎসরকাল বাস করিয়াছিলাম কারণ স্থানটী নির্জ্জন, স্বাস্থ্যপ্রদ ও মনোরম। পরে গ্রাম মধ্যে যাইয়া বৃদ্ধ লোকদিগের সহিতও তাঁহাদের সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ করিয়া দিই। তাঁহারা সব লিখিয়া লইয়াছিলেন। **কমলাকান্তের জন্মস্থান, মাতামহ বংশের বাস্তু-বাটী ও টোলবাড়ী সবই এখানে।** তাঁহার মাতামহ বংশের জ্ঞাতি একজন ৯০ নব্বই বয়স্ক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি এখন মৃত, উক্ত সময়ে যখন তথ্যসংগ্রহ করিয়া আসেন তখন তিনি জীবিত ছিলেন। কিছুদিন পরে মহারাজা আবার বর্দ্ধমানের "বিজয় চতুষ্পাঠী"র মহামহোপাধ্যায় একজন অধ্যাপক ও দুইজন ছাত্রকে পাঠান তাঁহারা আসিয়া প্রধানতঃ আমার সঙ্গে আলাপ করেন ও গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে কিছু হাতে লেখা পুঁথি (ভাগবৎ ও ব্যাকরণ ইত্যাদি) লইয়া যান। কিছুদিন পরেই বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনী হয়।

আমার একজন আত্মীয় শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় M. Sc. যিনি এখন Bengal Pharmaceutical works এর একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তিনিও সাহিত্য-পরিষদের সভ্য তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়া (আমি তখন বিশালাক্ষীর মন্দিরে থাকি) কমলাকান্তের নাম শুনিয়া তাঁহার "হস্তাক্ষর" দেখিয়া সাগ্রহে উহা লইয়া যান এবং সাহিত্য-পারিষদের পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিয়াছেন; বইখানি ফেরৎ দিবার কথা ছিল; শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে ফেরৎ দিবার কথা লেখায় তিনিও সম্মত ছিলেন কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাদের কথামত কাজ হয় নাই। মহারাজাও সাগ্রহে ঐ হস্তলিপি খানি পাইবার জন্য আমাকে জানান, আমিও অদ্যাবধি ঐখানি পাইতে কৃতকার্য্য হই নাই। **কমলাকান্তের স্বহস্ত লিখিত পুস্তিকাখানির নাম "সাধন পঞ্চক"।**

মহারাজাধিরাজ কিছুদিন পরে উক্ত বিশালাক্ষীর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের জঙ্গল কাটাইয়া পরিষ্কার কতকটা করাইয়াছেন ও আমার প্রদর্শিত স্থানে একটী মার্ব্বেল পাথরে "**সাধক প্রবরশ্যামাপদপঙ্কজ সেবিনঃ। আসনং কমলাকান্তস্যৈত্রৈবাসীৎ-দ্বিজন্মনঃ॥**" এই শ্লোক লিখিয়া কমলাকান্তের আসনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এই ত গেল মোটামুটি ব্যাপার। তাহার পর আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিবেন। আমার কর্ত্তব্য বোধ হয় শেষ হইল।

আঃ (স্বাং) নিরালম্ব (স্বামী)
(আপনার লিখিত "যতীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী ঠাকুর")
Ashram, Channa.
29. 3. 20.

Ashram, Channa.
29.3.20.

সসম্মান নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়াছি। বিশালাক্ষীর পূজা দৈনিক হয়, গ্রাম হইতে পূজারি আসিয়া পূজা করে। নিত্যপূজায় ৵৷৹ আধসের চাল, একটী ছোট গুড়ের লাড়ু ও ফুল জল বেলপাতা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বৎসর আষাঢ়ের শুক্লা নবমীতে সামান্য আয়োজন সহকারে বাৎসরিক পূজা হয়; সেই সময়ে বলিদান ছাগমেষাদি হয়। পূর্ব্বে শূকর বলিদান হইত। মন্দিরের তিন পার্শ্বে (পশ্চাৎ ভাগ ব্যতীত) বলিদান হয়। বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়া প্রায় ৯৯ বিঘা ডাঙ্গা, ডহর, পুষ্করিণী সালিজমী ইত্যাদিতে দেওয়া আছে তাহাতেই পূজা সম্পন্ন হয়। এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সম্পন্ন অনেক পূজারী। পূজারীরা প্রায় সকলেই মূর্খ ও চাষী, সুতরাং পূজা কি ভাবে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন ৫টী মুণ্ড কিছু দিন পূর্ব্বে ৬টী ছিল এবং মন্দিরের মধ্যে একপার্শ্বে কতকগুলি মৃন্ময় ঘোড়া আছে সে গুলি ভৈরবের। ভৈরবনাথের স্থান মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটী একডালবিশিষ্ট বট গাছের নীচে। মন্দিরের উত্তরে নদীর দিকে একটী অতি পুরাতন বটগাছ আছে সেটী পঞ্চমতলা বা পঞ্চাননতলা বলে। কমলাকান্তের আসন মন্দিরের পশ্চিমে জোড়া শিমূল গাছের মধ্যবর্ত্তী। নিত্যভোগ হয় না। বাৎসরিক পূজার সময় রাজা ৬৲ টাকা দেন।

বিশালার ধ্যান—ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাং। দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গাখেটকধারিণীং॥ নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং। সদাষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং॥ মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং। শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাং॥ শত্রু-

ক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাং। সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পদ-প্রদাং স্মরেৎ॥ ইতি।

যদি কেহ মানান করে তবে অন্য সময়েও বলিদানাদি হয়। নিত্যবলি ও ভোগ হয় না। বাৎসরিক পূজার সময় একটী মেলা হয়। আশ্বিনের শুক্লা নবমীতেও বৎসরে একবার পূজা ও বলিদান হইয়া থাকে।

ভৈরবনাথের ভোগ গাঁজা, মদ ও মাগুর মাছের ঝোল ও খেঁচুড়ী দিয়া হয়। অবশ্য ভৈরবনাথের ভোগ কদাচিৎ হয় কিন্তু যখন হয় তখন ঐ সব উপকরণ।

বিশালার নিত্য ও বাৎসরিক পূজায় প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে "ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। শূকর বলিদান মন্দিরের পশ্চাৎদিকে হইত। কমলাকান্তের আসনের উপরে মহারাজা এই শ্লোকটী মার্ব্বেল পাথরে লিখিয়া রাখিয়াছেন,—"সাধকপ্রবরস্যাম্বা-পদ-পঙ্কজসেবিনঃ। আসনং কমলাকান্তস্যাত্রৈবাসীৎ দ্বিজন্মনঃ॥"

এখন বোধ হয় আপনার আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত সংবাদ বিস্তারিত দেওয়া হইল, সুতরাং আশা করা যায় আপনি এবারে এসব অসার বিষয়ের লেখা-লেখি হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিবেন।

রাঁচির কতকটা বর্ণনা আপনার পত্রে জ্ঞাত হইলাম, যদি যাওয়া স্থির হয় আপনাকে পূর্ব্বে সংবাদ দিব। বিষয় সম্পত্তিশালী, ধনী, গর্ব্বিত ও বাস্তবিক মূর্খ ও জড়বাদে পরিপূর্ণ ও সম্ভ্রান্ত লোক হইতে আমি দূরে থাকিবার ইচ্ছা করি।

আশীর্ব্বাদ জানিবেন। নিজের ব্রাহ্মণত্বে দৃষ্টি রাখিবেন। ইতি।

আঃ নিরালম্ব।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তু

সাধক কমলাকান্ত

প্রবাদ যে, সাধকশ্রেষ্ঠ কমলাকান্ত কাল্‌নায় বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় রায় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ বংশে এখন একমাত্র বিধবা জীবিতা আছেন। তিনি সাধকের কোন খবরই রাখেন না। রায়েরা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দশ-পনর বৎসর পূর্ব্বে ঐ বংশের ৺ভুবন রায় ও ৺কেদার রায় জীবিত ছিলেন। একখানি পুরাতন দলিলে একবার কমলাকান্তের কিছু উল্লেখ থাকিতে শুনিয়াছি, সে দলিলের কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্ধান পাই নাই।

পল্লীবাসী সম্পাদকের পত্র।

মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর কাল্‌নার একস্থানে 'কমলাকান্তের জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। বর্দ্ধমান রাজবংশের সহিত সাধকের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। অনেকের মতে ১২১৬ সালে সাধক অম্বিকা-কাল্‌না হইতে বর্দ্ধমান যাত্রা করেন। আমরা কিন্তু ইহার কোনই প্রমাণ পাই নাই। তবে বর্দ্ধমানের কোটালহাটে যে কমলাকান্তের বসতি হয়, ইহার প্রমাণ আছে। বর্দ্ধমানের রাজন্যেরা কমলাকান্তের খুবই অনুরাগী ছিলেন। মহারাজকুমার প্রতাপচন্দ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

ভুলুয়া বাবার সঙ্গে আমি চান্না গিয়াছিলাম। তাঁহার সাধন-ক্ষেত্রে ৺বিশালাক্ষী তলায় পঞ্চমুণ্ডী এখনও বজায় আছে। এই চান্না গ্রামে সাধকের মাতামহাশ্রম। সে ভিটায় এখন কেহ নাই। সেখানে একজন শিক্ষিত সন্ন্যাসী থাকেন। তিনি বাঙ্গালী; তাঁহাকেই আমরা 'সেতো' ধরি।

চান্নায় বুড়া বুড়া ব্রাহ্মণ সজ্জনদের ধরিয়াও আমরা বিশেষ কিছু পাই

নাই। যাহা কিছু তদন্ত-অন্তে মিলিয়াছিল, তাহা সেবার বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। তবে তিনি যে, কাল্না, চান্না এবং লাখুড্ডীতেই জীবন অবসান করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাল্নায় জন্ম, মাতুলালয়ে সাধনার সূত্র এবং লাখুড্ডীতেই সমাধিলাভ করা মনে লাগে।

মহারাজ নিজেও কমলাকান্তের জীবন কথা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, বেশী কিছু পাইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। স্বর্গীয় মহারাজ মহাতব্ চন্দ্ বাহাদুর যে সাধকের পদাবলী প্রকাশ করেন, তাহা আমি দেখি নাই। মুদ্রিত হইয়া থাকিলে রাজবাড়ীর পুস্তকাগারে অবশ্যই মিলিতে পারে। বর্ত্তমান মহারাজেরও এ সব বিষয়ে উৎসাহ আছে। কোন সংগীতে তাঁহার আত্মপরিচয় থাকিলে, মহারাজ নিজে অনুসন্ধান করিবেন কেন?

চান্না খানা জংসন হইতে দেড় ক্রোশের ভিতর। তেমন প্রয়োজন হইলে পুনরপি যাইতে পারা যায়। পুস্তকে লাখুড্ডীর আসন, চান্নায় ৺বিশালাক্ষীর তলায় পঞ্চমুণ্ডী এবং অম্বিকা-কাল্নায় জন্মভিটার চিত্র দিলে মন্দ হয় না। অবসর অভাবে তেমন তদন্ত কখনও করা হয় নাই। লিপ্ত হইয়া চেষ্টা করিলে এই স্থান ত্রয়েই তাঁহার যাহা কিছু মিলিতে পারে। স্থানীয় শাখা সাহিত্য-পরিষদ্‌কেও এজন্য আমি অনুরোধ করিব। এসম্বন্ধে ভবিষ্যতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিব, মহাশয়কে পাঠাইব। অদ্য ইহার অধিক বিশেষ কোন সংবাদ দিতে না পারায় ক্ষুব্ধ রহিলাম।

সাধকের সঙ্গীতাবলী একত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানি না। আমার সংগৃহীত দুই একটী সংগীত আপনার গোচরার্থ পাঠাইলাম :—

১। দামোদরের বেলাভূমিতে সাধক কমলাকান্ত পত্নীর ভস্মীভূত চিতা সম্মুখে গাহিয়াছিলেন—

গীত

কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা রাখবি সেটা,
তোমার যারে কৃপা হয়, তার, সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা,
(তার) কটিতে কৌপীন জুটে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
ইত্যাদি।

২। চান্নার নিকট ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় সাধক যখন পতিত হন, তখন নিম্নলিখিত সংগীতটী গাহিলে দস্যুগণ কমলাকান্তের চরণে প্রণত হইয়া পতিত হয় :—

গীত

আর কিছুই নাই শ্যামা ?
মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙা।
শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারি, দেখে হলাম সাহসভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ্ কালে কেউ কোথায় নাই
ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা। ইত্যাদি।

৩। পঞ্চমুণ্ডীর উপর আসন পাতিয়া ভাবাবেশে কমলাকান্ত যে গান করেন :—

গীত

সদানন্দময়ী কালী।
মহাকালের মনোমোহিনী গো মা—
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী,

যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ? ইত্যাদি।

৪। মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সাধককে অম্বিকায় ৺গঙ্গাতীরে পাঠাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ করিয়াছিলেন। সাধক কিন্তু একনিষ্ঠতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়া মৃত্যুশয্যায় গাহিয়াছিলেন ঃ—

কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব ?
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে,
বিমাতার কি শরণ লব ?

সাধক কমলাকান্তের শ্রেষ্ঠ সংগীত গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সংগীতটী ভক্ত সাধকগণ অতি আনন্দের সহিত গান করেন ঃ—

জাননারে মন, পরম কারণ
শ্যামাত কখন মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।

পল্লীবাসী কার্য্যালয়
কাল্না—
১৩২৬।১১ ভাদ্র—

বহুল নমস্কারান্তে সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়, আপনাদের ৯।৭।১৮ তারিখের প্রেরিত পত্র যথা সময়ে পৌঁছিয়াছে। গত পৌষ মাস হইতে আমি নানা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া খুবই কষ্ট পাইয়াছি। আপনার পত্রের যথাকালে উত্তর দিতে না পারায়—বড়ই অপরাধ হইয়াছে। ভরসা করি নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন। উত্তরে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনীয়। ইতি।

বশংবদ—
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওঁ

৫নং গোপাল বানার্জ্জি ষ্ট্রীট,
পোঃ ভবানীপুর।
১৫।৯।১৮

মহাশয়েষু—

অদ্য "বাঙ্গালী"তে আপনার একটি নিবেদন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তদৃষ্টে জানিলাম যে আপনি কমলাকান্তের জীবনী সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন ও কতকগুলি প্রশ্নের জবাবও জানিতে ইচ্ছা করেন। সর্ব্বশেষে প্রশ্নটি দেখিলাম এই—"২০। 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার' স্থান নির্দ্দেশ এখনও করা যায় কি না। এই মাঠ কোথায়? চান্নাগ্রামের নিকট কি?"

শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহের পত্র।

এই প্রশ্নটির জবাব আমি জানি। উত্তরাধিকারীসূত্রে আমরা ওড়গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী "মাহাতা" নামক গ্রামে গত ৩০ বৎসর কাল বাস করিতেছিলাম। ঐ মাহাতাগ্রামে আমাদের জ্ঞাতি Hon'ble Sir S. P. Sinha মহাশয়ের শ্বশুরালয়। যাহোক, মাহাতা হইতে ওড়গ্রাম মাত্র এক ক্রোশের সামান্য অধিক ব্যবধান। এই গ্রামের বিখ্যাত ডাঙ্গা এখনও বর্ত্তমান; ইহা দিগন্ত-বিস্তারী ও area আন্দাজ 4 square miles। এখনও ডাকাতেরা পথিকগণের উপর মধ্যে মধ্যে উৎপাত করে (ঐ ডাঙ্গায়)। ওড়গাঁও বর্ত্তমান; তাহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি অবশ্য আর নাই। ওড়গাঁয়ের পাশে শিলাকোট গ্রাম আমাদের সম্পত্তি। ঐ গ্রাম ও ওড়গাঁয়ের মধ্যে আমাদের একটি বাগান মাত্র ব্যবধানরূপে অবস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার শীলাকোট গিয়াছিলাম। তখন স্থানীয় একজন বৃদ্ধ

ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে লইয়া যান ও যেখানে কমলাকান্তকে ডাকাতে ধরিয়াছিল তাহা কিয়দ্দূর হইতে দেখাইয়াছিলেন। অপরাহ্ণ হওয়ায় ডাকাতের ভয়ে ঠিক সেইস্থলে উপস্থিত হইলেন না। যাহাহৌক ভবিষ্যতে পুনরায় আমারও তথায় যাইতে ইচ্ছা আছে। যতদূর জানি স্থানীয় লোকে এখনও সে জায়গা ও সেই কমলাকান্ত ঘটিত ব্যাপার জানে; অনেকের নিকটেই তাহা শুনিয়াছিলাম। আপনি যদি যাইতে চান তবে এখন যাইবেন না। এখন বড়ই ম্যালেরিয়া, একবার ধরিলে রাঁচির জলবায়ু পরাস্ত হইবে। Best time to go is in the summer. তখন যদি যাওয়ার ইচ্ছা হয় তবে লিখিলে আমি আমাদের শীলাকোটের গোমস্তাকে লিখিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিব। আপনি স্বচ্ছন্দে সে স্থানের Photo পর্য্যন্ত লইয়া আসিতে পারিবেন। 'চান্নাগ্রাম' কোথায় তাহা আমার জানিবার সুযোগ হয় নাই। তবে ওড়গাঁ, শিলাকোট বা মাহাতার সন্নিকটে 'চান্না' নামক কোন গ্রাম নাই; মাহাতা হইতে "চাণক" নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ চাণকের প্রসিদ্ধ সন্তান রায়বাহাদুর রসময় মিত্র (Late Head Master of the Hindu School, Calcutta) ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান হাওড়ার Deputy Magistrate শ্রীমান্ করুণাময় ভায়া। চাণক গ্রামের বর্ত্তমান মালিক Sir S. P. Sinha মহাশয়ের পত্নী বা Lady Sinha মহাশয়ার খুল্লতাত পুত্রগণ অর্থাৎ মাহাতার মিত্র বাবুরা। মাহাতার এক অংশের মালিক Late Nawab Bahadur Abdul Jabbar Khan C. I. E. Etc. ইঁহার এক পুত্র "মমিন মিঞা" (বর্ত্তমান বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের Under secretary) ও অপর বা জ্যেষ্ঠ পুত্র ইঁহারা ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার উত্তরপূর্ব্ব কোণে নূতন উপনিবেশ স্থাপন

করিতেছেন। ডাঙ্গার মধ্যে পূর্ব্বে কয়েকঘর wandering Sonthals কয়েক বৎসরের জন্য ঘর করিয়াছিল। এখন আছে কি না জানি না।

পরিশেষে বক্তব্য—স্থানীয় লোকেরা make a difference between ডাঙ্গা ও মাঠ। মাঠ বলে যে সকল জমিতে চাষ হয় তবে যেখানে বাণের জল প্রবেশ করেনা এরূপ উচু জমি অর্থাৎ Culturable high land. ডাঙ্গা অর্থাৎ যাহা চাষের অযোগ্য ও উচু land ও barren.

ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা কতকাংশ কঙ্করময় ও কতকাংশ বালুকাময়। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে এক জায়গায় সামান্য তৃণ ও শালের স্বভাবজাত চাড়া দেখিয়াছিলাম। ইহার মধ্য দিয়া গো-গাড়ী ও মানুষ যাইবার natural way. উত্তরাংশে District Board Road. এই Road has gone towards east up to Cutwa, towards west and southwest up to Burdwan and from west again by a northern bend towards Guskara station on the E. I. R. Loopline. আপনি লুপলাইন ই আই আর এর বনপাশ ষ্টেশন অথবা তৎপরবর্ত্তী গুস্করা ষ্টেশন ইহাদের কোন ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে যাইতে পারেন। তবে একটু ঘোরা-ফেরা করিয়া যাইতে হইবে—মফঃস্বল ত জানেনই। ঐ দুটি **nearest station.**

অন্যান্য বার্ত্তা সময় ও সুযোগ ভগবান্ দেন যথাসাধ্য জানাইব। এই পত্র প্রাপ্তিসংবাদ দিলে সুখী হইব।

আপনি যে মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাহাতে সফলকাম হৌন। ইতি—

নিঃ

(স্বা) শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ

উকীল, হাইকোর্ট,

কলিকাতা।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং।

Tribeni 15/5/19.
P. O. Tribeni.
(Hooghly).

মঙ্গলাস্পদেষু—

আপনার পত্র ১৩মে তারিখে পাইয়াছি। শ্রীমান্ উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ তাঁহার পত্রে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। আপনি মহাত্মা রামপ্রসাদের সুদীর্ঘ জীবনী লিখিয়াছেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনী লিখিবার জন্য অনুসন্ধান করিতেছেন শুনিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম; কারণ এই সিদ্ধ মহাত্মাদের জীবনী যে পাঠকবর্গকে ধর্ম্মপথে উৎসাহিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ত্রিবেণীর সাধক।

রামপ্রসাদের কতকগুলি ষট্‌চক্রভেদ গান আছে, তদ্বারা বুঝা যায় যে তিনি ষট্‌চক্র সাধন করিয়াছেন। ক্রমশঃ সাধন মার্গে যেমন অগ্রসর হইয়াছেন তাহা গান দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

"সাধক সঙ্গীত" নামক একখানি পুস্তকে কমলাকান্তের সংক্ষেপ জীবনী লিখিত আছে। তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিত পদে পদস্থ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। তদবধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজ-সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বোরহাট নামক স্থানে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া তথায় পঞ্চমুণ্ডের আসন ও কালীমাতার মূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রতি অমাবস্যায় ব্যয়বাহুল্য সহকারে মায়ের পূজা করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইলে, তিনি শ্মশানে নৃত্য করিতে করিতে "কালী সব ঘুচালি ল্যাঠা। শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখবি সেটা।" এই গীতটী গাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পরে একদিন

তিনি বোরহাট হইতে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা নামক স্থানে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তখন তিনি দস্যুদিগকে বলিলেন "আমি একবার মাকে ডাকিয়া লই, তৎপরে তোমরা আমাকে বধ করিও।" দস্যুরা তাহাতে সম্মত হইয়া যষ্টি হস্তে তাঁহাকে চক্রাকারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি সেই অবস্থায় কিয়ৎকাল মাকে চিন্তা করিয়া গান করিতে লাগিলেন। সেই সিদ্ধ মহাত্মার মুখ বিনির্গত মা-মা রব শ্রবণে দস্যুদিগের কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল। তাহারা সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া করপুটে বলিল-প্রভো, আমরা মহাপাপী, আমাদের উদ্ধারের কি কোন উপায় আছে?' তিনি নানারূপ উপদেশ বাক্যে তাহাদিগের সান্ত্বনা করিলেন এবং তাহারা বলিল 'আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের মন আর পাপে লিপ্ত না হয়।' তৎপরে দস্যুরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্কন্ধে লইয়া আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিল।

তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করিবার কথা বলা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন। আশ্রমের বিল্বমূলে তৃণশয্যায় শায়িত হইয়া গান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। প্রবাদ আছে যে দেহত্যাগকালে তাঁহার তৃণশয্যার ভূমি ভেদ করিয়া জল উঠিয়াছিল। বোরহাটে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডের আসন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং শুনিয়াছি যে ঐ স্থানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশধরের মধ্যে কেহ কেহ বাস করিতেছেন। উঁহাদিগের নিকট কিংবা ভদ্রস্থ বৃদ্ধ লোকদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে, অথবা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কর্পূর রাজা সাহেবের নিকট অনুসন্ধান করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমি ভাল আছি, মধ্যে মধ্যে আপনাদের কুশলাদি লিখিয়া সুখী করিবেন। ইতি—

(স্বা) শ্রীকরুণাময় চট্টোপাধ্যায়।

মহাশয়,

আপনি কমলাকান্তের বিষয়ে কোন গল্প আছে কি না জানিতে চাহিয়াছেন, তাই নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যাপার লিখিয়া জানাইলাম।

কমলাকান্তের বসতবাড়ী বৰ্দ্ধমান সংলগ্ন কাঞ্চননগর গ্রামে ও কোটালহাটে কালী বাটিতে ৺মাতার পূজা করিতেন ও তথায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার আসনের

বৰ্দ্ধমানের জনৈক উকীলের পত্র। এমনই প্রভাব যে গত ২।৪ বৎসর পূৰ্ব্বে একটি সন্ন্যাসী আসিয়া সেই আসনে শব জাগাইতে যাইলে, তাহাকে নিকটবৰ্ত্তী একটা কাঁটার বনে কে যেন ফেলিয়া দেয় ও সেই সন্ন্যাসী অজ্ঞান হইয়াছিল। কমলাকান্ত একদিন মদ লইয়া যাইতেছিলেন; তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। এই কারণে কুলোকে মহারাজ ৺মহাতাপচাঁদ বাহাদুরকে বলে যে ৺মাতার পূজারী অতিশয় মাতাল ও সকাল বেলায় কমণ্ডলু করিয়া মদ লইয়া যায়। একদিন গুপ্তবেশে থাকিয়া তাদৃশ সময়ে মহারাজ ৺মহাতাপচাঁদ কমলাকান্তকে পথিমধ্যে ধরেন ও জিজ্ঞাসা করেন "কি লইয়া যাইতেছ?" কমলাকান্ত যথার্থই মদ্য লইয়া যাইতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ মহারাজকে উত্তর দিলেন "দুধ লইয়া যাইতেছি।" রাজা দেখিলেন তিনি সত্যই দুধ লইয়া যাইতেছেন।

একদিন প্রাতে মদ্যপান করিয়া কমলাকান্ত ৺মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের নিকট আসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কোন্ তিথি?" উত্তর করিলেন 'পূর্ণিমা'। যথার্থ পক্ষে সেদিন অমাবস্যা ছিল ও তিনি ভুল করিয়া পূর্ণিমা বলিয়া ফেলিলেন। মহারাজ বলিলেন "চাঁদ দেখাইতে পারিবে?" উত্তর "পারিব।" সন্ধ্যাকালে কমলাকান্ত মহারাজের নিকট আসিয়া বলিলেন 'আপনাকে চাঁদ দেখিতে হইলে, মায়ের

মন্দিরে যাইতে হইবে।' রাজা তাঁহার সহিত মন্দিরে আসিয়া চাঁদ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ব্যাপার এই যে রাজা ব্যতীত অন্য কেহ চাঁদ দেখিতে পাইল না।

বৰ্দ্ধমান সন্নিকট ওড়গ্রামে কমলাকান্ত পথে আসিতেছিলেন। পথে অনেক রাত হয়েছে; তিনিও বেশ নেশা করে জবাফুলের মতন চক্ষে আসিতেছেন। কয়েক জন ডাকাত মনে করিল, "বেটার কাছে যাহা আছে কাড়িয়া লওয়া যাউক"; তাহারা ত আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। তিনি বলিলেন, "আমাকে একবার ছাড়; তারপর ধরিও"—ছাড়িবামাত্র তিনি এমন সঙ্গীত করিতে লাগিলেন যে তাহারা কাঁধে করিয়া তাঁহাকে ৺মায়ের মন্দিরে বহিয়া দিয়া গেল।

কমলাকান্তের শেষ দিনের পূর্ব্বে একজন সাধু বৰ্দ্ধমানস্থ কৃষ্ণসাগরে আসিয়াছিলেন। কমলাকান্ত তাঁহাকে দেখিতে আসেন। সেই সাধু কমলাকান্তকে একটি কাচের ছোট পুতুল দেন। সেইটি পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসেন ও বলেন "আমার আর থাকা হবে না—আমার শেষ হয়েছে"। ৺কাশীধামে কলেরা হওয়ায় ৺কালীমাতা পূজা করিবার জন্য কমলাকান্তকে কাশীধামে লইয়া যায়; তাঁহার ব্যবহারে লোকেরা ভাবিল "এটা একটা বদমাইস মাতাল"। তিনি পূজা করিয়া বলিলেন, "মা যে তুই এখানে এসেছিস দেখি" বলে বুকে ছুড়ি মারিয়া ৺কালীমাতার দেহ হইতে রক্ত নির্গত করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন ও বলেন যে একটি লোকছাড়া আর কেহ মরিবে না। তাহাই হইয়াছিল! ইতি—

(স্বা) শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
মহাজনটুলী।

শ্রীশ্রীদুর্গা

১৩২৭ সন

৩রা অগ্রহায়ণ

কলিকাতা

নমস্কার নিবেদনমিদং—

আপনার সমস্ত পত্রগুলিই আমি যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, সময়াভাব প্রযুক্ত উত্তর দিতে পারি নাই। অদ্য শ্যামাগানের খাতাখানি রেজেষ্টরি করিয়া পাঠাইলাম, আপনার কার্য্য সমাধা হইলে আমাকে ফেরৎ দিবেন কারণ এইটি অত্যন্ত যত্নের জিনিষ। বিশ্বাসের উপর আপনাকে দিলাম। ৺কালী পূজার বিবরণ বিশেষ কিছু লিখিবার নাই তবে যেরূপ ভাবে সম্পন্ন হয় তাহাই লিখিয়া দিলাম। বর্দ্ধমান রাজষ্টেট্ হইতে ২০৲ টাকা করিয়া পাওয়া যায় তদ্দ্বারা ও অন্যান্য ভদ্র লোকের মানসিক যাহা হয় তদ্দ্বারা পূজার খরচ কোনরূপে সম্পন্ন হয়। মায়ের প্রতিমূর্ত্তি যে ডাকের গহনার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া রাত্রি ১টার সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণ দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজার পর ২টী ছাগ মহিষ, ১টি কুমড়া ও ইক্ষুদণ্ড বলি দেওয়া হয় তাহার পর আরতি ও হোম। শেষ পকান্ন ও খিচুড়ী ভোগ দেওয়া হয় ঐ সময়ে কারণ উৎসর্গ করা হয়। মায়ের পূজা সমাধা হইতে রাত্রি শেষ হইয়া যায় ইত্যাদি প্রকার ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র দ্বারা মায়ের পূজা সমাধা হয়। মায়ের বাড়ীর ঈশান কোণে ১টি বিল্ববৃক্ষ আছে তাহার নীচে ভৈরব আছেন তাঁহার পঞ্চোপচারদ্বারা পূজা করিয়া ১টি ছাগ বলি দেওয়া হয়। কালী পূজার রাত্রে ইহাই হইয়া থাকে, পূজা সমাধার পর মায়ের প্রসাদ উপস্থিত দর্শকদিগকে বণ্টন করা হয়। পরদিন প্রতিমা বাদ্য-যন্ত্রের সহিত সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধমানের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মধ্যে তেওয়ারী বাবুদের

শ্রীযুক্ত রাখরাম ভট্টাচার্য্যের পত্র।

বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করণের পর রাজার পুষ্করিণী কৃষ্টসায়ের জলে নিমজ্জিত করা হয়। ইহার বেশী বিবরণ কিছু লিখিবার নাই। বর্ত্তমান পূজক আমি আমার দ্বারা প্রায় ২০ বৎসর এই প্রকারে পূজা হইতেছে, আমার পূর্ব্বে আবার শ্বশুর ৺ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়া গিয়াছেন। ইতি।

(স্বা) শ্রীরাথরাম ভট্টাচার্য্য।

পুঃ—

বিশেষ অনুরোধ কার্য্য সমাধা হইলে যেন খাতাখানি ফেরৎ দিতে অবহেলা করিবেন না। আর পূর্ব্বে লিখিতে ভুলিয়াছি মায়ের পূজা আরম্ভ করিবার সময়ে ৺ কমলাকান্ত মহাশয় যে আসনখানিতে বসিয়া মায়ের পূজা করিতেন তাহার জীর্ণ অবস্থা এখনও পূজকের আসনের নীচে দেওয়া হয় নচেৎ পূজা আরম্ভ হইতে পারিবে না। ইতি—

১৩২৭ সন ১৫ই অগ্রহায়ণ

কলিকাতা।

নমস্কারনিবেদনমিদং—

আপনার একখান পত্র পাইয়াছিলাম কিন্তু যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। কারণ আমার অত্যন্ত সময়াভাব আপনার প্রশ্নের যথাসম্ভব নিম্নে উত্তর দিলাম।

১। খাতাখানা কোটালহাটস্থিত চণ্ডিচরণ দত্তের নিকট ছিল তাহার বাড়ী খণ্ডঘোষ, রাজবাটীতে চাকুরী করে। উক্ত ব্যক্তি আমার শ্বশুরের শিষ্য।

২। খাতাখানা কোন ছাপা পুস্তকের নকল কিনা জানি না উক্ত ব্যক্তি কিছু নকল করে নাই।

৩। খাতাখানা পূর্ব্বে আমার শ্বশুরের নিকট ছিল তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত ব্যক্তি কিছুদিন লইয়াছিল ৺কমলাকান্ত আমার শ্বশুরের আত্মীয় হইতেন সম্ভবতঃ কাঞ্চননগরে যাতায়াত করিতেন।

৪। আমি ১২৬৪ সালের রাজবাটী হইতে যে পদাবলী প্রকাশিত হয় তাহা দেখি নাই এবং কোথায় আছে তাহা কিছু বলিতেও পারি না। তবে রাজবাটীতে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

৫। কোটালহাটের পাকা ঘরের পূর্ব্বদিকের কুঠারিতে নৈঋ্র্ত কোণে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডের আসন আছে মাত্র আর যে আসনে বসিয়া পূজা করিতেন তাহার জীর্ণ অবস্থা আমার বাটীতে থাকে প্রত্যেক বৎসর পূজার সময়ে সেই জীর্ণ টুকরা ২ আসন পূজকের আসনের নীচে দিয়া পূজা আরম্ভ করা হয়। পূজাশেষে তাহা বাড়ীতে আনিয়া রাখা হয়। আসনখানা কুশ নির্ম্মিত নহে তাহা শালু লাল কাপড়ের ছোট কম্বলের আসনের ন্যায়। আসনখানা পূজকের আসনের নীচে দিবার অর্থ কিছু জানি না। তবে মনে হয় কমলাকান্তের শুদ্ধ আসনখানা পূজকের আসনের নীচে দিয়া পূজা করিলে দেবীর সন্তোষসাধন হইবে—বরাবর ঐ প্রকার পূজা হয় বলিয়া এখনও জীর্ণ টুকরা পূজকের আসনের নীচে দেওয়া হয়।

৬। আসনের ফটো তুলিবার আর অবস্থা নাই যদি নেহাৎ দরকার হয় ঐ টুকরার ফটো লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন তাহা হইলে আমায় লিখিবেন। কারণ তাহা আমার বাড়ীতে থাকে। আমি না যাইলে তাহা পাইবার উপায় নাই। কাঞ্চননগরে কমলাকান্তের কেহ নাই আমার শ্বশুর ৺ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য তিনি আজ প্রায় বিশ বৎসর দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যখন মারা যান তখন আমার বিবাহ হয় নাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয় কিন্তু সেও একটি কন্যা প্রসব করিয়া সেই দিনই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার কোন

বংশ বা শিষ্য নাই। শুনিতে পাই তিনি ৪০।৫০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইতি— (স্বা) শ্রীরাখরাম ভট্টাচার্য্য।

Kalna,
Burdwan,
22. 12. 19.

প্রিয় অতুল বাবু—

আপনার কথামত সন্ধান করিয়া যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিলাম।

১। সাধক কমলাকান্তের পিত্রালয় কালনায় বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় ছিল বটে। তাঁহাদের বংশের কেহই এখানে নাই। বংশ লোপ হইয়াছে। অন্ততঃ ঐ স্থানে কেহই নাই। তিনি 'রায়' কি 'বন্দ্যোপাধ্যায়' ছিলেন, তাহা জানিতে পারিলাম না। ৺সুবল মিত্রের অভিধানে দেখিলাম তিনি 'ভট্টাচার্য্য' ছিলেন। ইহা ঠিক কিনা জানিনা। তাঁহার ভিটার পার্শ্বে এবং একাংশে একঘর 'রায়' আছেন। সে বাড়ীতে কেহ পুরুষ মানুষ নাই। অতএব বিশেষ খবর জানিতে পারিলাম না। ঐ 'রায়েরা' চক্রবর্ত্তীদের ভাগিনেয়। কেহ বলিল চক্রবর্ত্তীরা কমলাকান্তের জ্ঞাতি ছিলেন। কেহ বলিল তাঁহারা কমলাকান্তদের বাড়ীর ভাগিনেয়। ইহার ঠিক খবর পাইলাম না। পুনরায় বিশেষ খবর লইবার চেষ্টা করিব।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যগোপাল রায়।

২। বর্দ্ধমানাধিপতি কালনায় কোনও স্থান কমলাকান্তের জন্মভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। আপনার ঐ খবর ভুল।

৩। মহারাজাধিরাজ জন্মভিটায় কিছুই লিখিয়া রাখেন নাই। কোনও tablet নাই। যে স্থানটি ভিটা বলিয়া সকলে দেখাইল তাহা একটী পতিত জায়গা, কয়েকখানি ঘরের পোঁতা আছে মাত্র আর কিছুই

নাই। চতুর্দ্দিকে বাড়ী আছে কিন্তু সকলেই নূতন আসিয়াছেন পুরাতন খবর জানেন না। পূর্ব্বদিকে ঐ 'রায়দের' বাড়ী কিন্তু সে বাড়ীতে পুরুষ মানুষ নাই। কমলাকান্তকে তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি বর্দ্ধমানে লইয়া যান। সেই হইতে তিনি বরাবর বর্দ্ধমানেই থাকেন। বর্দ্ধমানে যে স্থানে থাকিতেন উহা বর্দ্ধমানের Suburb, স্থানটির নাম কোটালহাট। কোটালহাটে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। শুনিলাম ঐ স্থানটি মহারাজা ঘিরাইয়া রাখিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে একটি শ্যামাপূজার টিনের চণ্ডিমণ্ডপ ও তাহার সামনে একটি টিনের 'নাটমন্দির' গোছ আছে। ঐখানে প্রতিবৎসর কালীপূজা হয় এবং সেজন্য মহারাজার বাৎসরিক বৃত্তি দেওয়া আছে। সেখানে কোনও tabletও থাকিতে পারে। জানিলাম এখানকার মহারাজাই ঐ স্থান দেওয়াল কিংবা railing দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঐ স্থানই মহারাজা কমলাকান্তের ভিটা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া আপনি শুনিয়াছেন।

৪। কালনায় কোনও ফটোগ্রাফার নাই। আমার পরিচিত বন্ধুদের মধ্যেও কাহারও ফটোগ্রাফ যন্ত্র নাই। স্থানটি যেরূপ দেখিলাম তাহাতে ফটোগ্রাফ লওয়ার বিশেষ প্রয়োজনও দেখিলাম না। বোধ হয় কোটাল-হাটের কালীবাড়ীর ফটো লইলে ভাল হইবে। আপনার সে স্থান একবার দেখা দরকার। আমি মহারাজার সুপারিটেনডেণ্ট বাবুকে কমলাকান্তের জন্মস্থানটি চিহ্নিত করিবার জন্য request করিয়াছি।

৫। 'কমলাকান্ত পদাবলী'র সন্ধান পাই নাই। এখানে একটী বৃদ্ধ পণ্ডিত আছেন। তাঁহার কাছে থাকিতে পারে। বৃদ্ধের কাছে একদিন গিয়াছিলাম পুনরায় যাইব। জানিলাম বৃদ্ধের যে পুস্তক আছে তাহার উপর এত মায়া যে কাহাকেও স্পর্শ করিতেও দেন না।

অন্যান্য খবর পরে লিখিতেছি। আশা করি ভাল আছেন। এখানকার

খবর একরূপ মঙ্গল। আমি কাজের ভিড়ে এতদিন আপনাকে জবাব লিখিতে পারি নাই। দোষ মার্জ্জনা করিবেন। শুনিলাম আপনি ফণীবাবুকেও পত্র দিয়াছিলেন, তাঁহার জবাব অবশ্য পাইয়াছেন। ইতি—

(স্বা) শ্রীঅমূল্যগোপাল রায়।

কালনা—রাজবাটী,

১৩২৭।১৩ জ্যৈষ্ঠ।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

কাল্‌নার বর্দ্ধমানরাজ পরিদর্শক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আপনার ১৫।৫।২০ তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। সাধক কমলাকান্তের আসন সম্বন্ধে যাহা অবগত ছিলাম ও আছি তাহাই আপনাকে জানাইয়াছিলাম। সাধক প্রবরের সম্বন্ধে যাহা কিছু সংবাদ পাওয়া যায় সকলই জনশ্রুতিমূলক। সঠিক সংবাদ পাওয়া দুর্ঘট। পঞ্চমুণ্ডী সম্বন্ধে আমার যাহা শোনা ছিল আপনাকে তাহাই জানাইয়াছি। সাধক কমলাকান্তের বাসস্থান কালনায় এবং এখানেই তিনি সাধনা আরম্ভ করেন। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্ বাহাদুরকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য সাধককে কালনায় নিযুক্ত করেন ও পরে তাঁহাকে বর্দ্ধমানে লইয়া যান। সাধক বর্দ্ধমান যাত্রাকালে নিজ আসন লইয়া যান—এইরূপ প্রবাদ এখানকার লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় এবং তদনুসারে আপনাকে ঐরূপ লিখিয়াছিলাম। ডিপুটী ম্যানেজার বাবু ঘরের মধ্যে পঞ্চমুণ্ডী আসন থাকার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি জানি না। বেলগাছটী কত দিনের তাহা কে বলিতে পারে? পুরাতন বেলগাছের পাতা ছোট হইয়া যায়। বেলগাছ আপনি দেখিয়াছেন। বেলগাছের বয়স অনুমান করিয়া

লইবেন। সাধকের সময় বেলগাছ ছিল কি না তাহা কে বলিতে পারিবে?

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আমি দারজিলিং গমন করায় আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। ইতি—

বিনীত—

(স্বা) শ্রীক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

'অতঃপর' (পুস্তক বিরচনের পর) 'আত্মনিবেদন' (আত্মপরিচয়) 'কই শুন' (বলি, শ্রবণ কর)। 'ব্রহ্মকুলে' (ব্রাহ্মণ বংশে) উপনীত

'আত্মনিবেদনের'— (উপস্থিত) 'স্বামী নারায়ণ' (কমলাকান্ত

ব্যাখ্যায় বর্দ্ধমানাধিপতি। স্বামী কমলাকান্ত নারায়ণের নাম বিশেষ এবং উদ্ধৃত বাচক শব্দ না দিয়া উপনীত শব্দ দেওয়ায় এস্থলে আর একটী অর্থও বুঝাইতে পারে, যথা কমলাকান্ত রূপধারণ করিয়া প্রভু নারায়ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণকুলে উপনীত হইয়াছেন)।

'জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান' (বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কালনায় জন্মভূমি এবং বাসস্থান বর্দ্ধমানে; বর্দ্ধমানে কোটালহাটে মরণকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন, সে কারণে বাসস্থান বর্দ্ধমানে লেখা হইয়াছে)।

'শ্রীপাট গোবিন্দ মাঠ গোপালের স্থান' (গোপাল নামক প্রসিদ্ধ দেবতা যে গোবিন্দমাঠে প্রতিষ্ঠিত; সেই গোবিন্দমাঠ নামক গ্রামই শ্রীপাট অর্থাৎ গুরুস্থান)।

'প্রভু চন্দ্রশেখর মহাধন' (গুরুর নাম চন্দ্রশেখর গোস্বামী। তিনি 'মহাধন' অর্থাৎ বিশিষ্ট ধনশালী ছিলেন অথবা কমলাকান্ত সম্বন্ধে তিনি মহাধন মহামূল্য রত্নবিশেষ ছিলেন)।

'তার পদ রেণু যার মস্তকভূষণ' (সেই চন্দ্রশেখর গোস্বামীর পদরেণু যে কমলাকান্তের মস্তকভূষণ)।

'নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন' (যাঁহার নাম কমলাকান্ত তিনি ত্রিলোচন মহাদেবকে চিন্তা করিয়া)।

'ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধকরঞ্জন' (সাধকরঞ্জন নামক গ্রন্থখানি ভাষাপুঞ্জে নানা ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় ও বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিলেন। চান্নাবাসী শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে শুনা যায় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 'সাধকরঞ্জন' পুস্তকখানি লইয়া গিয়াছেন)।

'নামেতে শ্রীশিবরাম চান্নাতে নিবাস' (বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা জংসনের নিকটবর্ত্তী চান্না নামক গ্রামবাসী শ্রীশিবরাম ভট্টাচার্য্য। ইনি কমলাকান্তের শিষ্য ছিলেন এবং ইনিই বর্ত্তমান শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রপিতামহের সহোদর)।

'যোগশাস্ত্র সাধন করিতে তার আশ' (তার অর্থাৎ শিবরামের যোগশাস্ত্র সাধন করিতে অর্থাৎ অভ্যাসাদি করিতে আশা থাকায়)।

'সাধকের প্রীতি হয় চক্ষের অঞ্জন' (যেহেতু চক্ষের অঞ্জন অর্থাৎ জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা বুদ্ধিরূপ চক্ষু পরিষ্কৃত হইলে সাধকের আনন্দ হয়)।

'অতএব লিখিলেক সাধকরঞ্জন' (যেহেতু উক্তরূপে সাধকের প্রীতি হয় এই কারণে সাধকরঞ্জন নামক গ্রন্থ লিখিলেন,—সাধকরঞ্জন পুস্তকের আলোচনা দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে সাধকদিগের অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষুঃ উন্মীলিত হইবে এবং তদ্দ্বারা সাধকের আনন্দ হইবে)।

Bankura
বাঁকুড়া
২৭ আষাঢ়, ১৩২৭।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র এখানে পাইয়াছি। আমি কটক ছাড়িয়া এখন এখানে থাকিবার ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া তেমন চক্ষু রাখিতে পারি নাই। দুই বৎসর হইল একটা চক্ষু প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লেখাপড়া কম না করিলে অপরটাও নষ্ট হইবে, চিকিৎসকেরা এই আশঙ্কা জানাইয়া রাখিয়াছেন। এই অবস্থায় আপনার পুথী দেখিতে পারিতেছি না। দেখিলে কিছু করিতেও পারিতাম না। এককালে যোগের দুই চারিটা বহির পাতা উল্টাইয়াছিলাম সে বিদ্যায় সাধকের সাধনা বুঝিতে পারিতাম কিনা, সন্দেহ।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়।

আপনার উদ্ধৃত আত্মনিবেদনের "স্বামী নারায়ণ" কমলাকান্তের রাশি নাম বা গুপ্ত নাম মনে হয় না। সে নিবেদন হইতে রচনা কালও জানিতে পারা যায় না। কালের কথা কিছুই নাই।

কমলাকান্ত কি সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা পুথী হইতে বুঝিতে পারিবেন, আমি কমলাকান্তের পদাবলী পড়ি নাই। "শ্রীপাট" শব্দে গুরুর বাসস্থান বুঝি। বোধ হয় তাঁহার নাম ছিল চন্দ্রশেখর গোস্বামী। অথচ তিনি গোস্বামী অর্থাৎ বৈষ্ণব ছিলেন। অম্বিকা-কালনার দিকে "গোবিন্দ মাঠ" নামে কোনও গ্রাম থাকিতে পারে। সেখানে গোপাল-বিগ্রহ আছেন। শান্তিপুরের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

কমলাকান্ত "ভাবি ত্রিলোচন", চান্নার শিবরাম নামক কাহারও সাধন নিমিত্তে সাধকরঞ্জন লিখিয়া থাকিবেন। কমলাকান্ত শৈব ছিলেন? সম্ভবতঃ শৈবতান্ত্রিক।

অর্থাৎ সমুদয় পুথী পড়িলে এই সকল বিষয়ের সঙ্গত অর্থ বাহির করিতে পারিবেন।

পুথীর আরম্ভে নিরঞ্জনকে কামিনী কল্পনা করা হইয়াছে। এই কামিনী শক্তি হইবেন। বস্তুতঃ শিবশক্তি ব্যতীত যোগসাধনা নিষ্ফল। তবে, কেহবা শৈব, কেহবা শাক্ত নামে পরিচিত। ষট্‌চক্র, অজপামন্ত্র এই

দুই, যোগের পরিভাষা। অতএব যোগসাধনের কথা আরও আছে। ইতি—

(স্বা) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
ইং ৬।১১।২০

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পোষ্টকার্ড পাইলাম। পুথী সম্বন্ধে আমার কি অভিমত চান, তাহা এবারেও বুঝিতে পারিলাম না।

"আত্মনিবেদন" পড়িয়া এইরূপ মনে হইয়াছে—নারায়ণের ইচ্ছায় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। চন্দ্রশেখর গোস্বামী গুরু ছিলেন। তাঁহার নিবাস (শ্রীপাট) গোবিন্দমাঠে। সেখানে গোপালবিগ্রহ ছিলেন।

গোবিন্দমাঠ নামক গ্রাম নিশ্চয়ই ছিল। কাল্‌নার নিকটে নাকি দ্বাদশঘাট ছিল। অম্বিকা-কালনার লোকের নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

পুথীখানা চোখ বুলাইয়া দেখিলাম। কেবল বর্ণাশুদ্ধি নহে, স্থানে স্থানে শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, ভুল লেখা হইয়াছে।

এই পুথীতে একটা নূতন কথা দেখিলাম। নিরঞ্জনকে কামিনী কল্পনা করা হইয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে শিবের কামিনী বলা হইয়া থাকে। কিন্তু শিব-শক্তির ঊর্দ্ধে যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাঁহাকে সাকারা কামিনী কল্পনা গুরুভেদে হইয়া থাকিবে। কমলাকান্তের পদ হইতে ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে।

আমার বিবেচনায় পুথী বানান শুদ্ধ। সং পু-স্তী হইতে। পু-স্তি-কা হইতে পু-থী হইতে পারে না। পুঁথী বানান গ্রাম্য। বাঙ্গালায় কেহ কেহ ই-ঈ ভেদ করেন না বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় হ্রস্বার্থে ঈ লেখা কর্ত্তব্য।

আপনার পুথী রেজেষ্টারি ডাকে ফেরত পাঠাইলাম। প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। ইতি

(স্বা) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সংখ্যা ৫৪০।২৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩২৭, তারিখ ১৮ই শ্রাবণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৮।৬।২০ তারিখের পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, তজ্জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

"সাধক রঞ্জন" পুথির শেষভাগ হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনি 'অনুমান করিয়াছেন যে, কমলাকান্ত মুখে মুখে যোগসাধনার জন্য শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাহাই উত্তরকালে চান্নার শ্রীশিবরাম লিপিবদ্ধ করেন। পুথির শেষে পয়ার ছন্দে শিবরামের নাম লিখিত রহিয়াছে দেখিয়াই বোধ হয় আপনি এইরূপ অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু আমি এক্ষেত্রে আপনার অনুমান অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিনা। পুথির মধ্যে সর্ব্বত্রই কমলাকান্তের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। আপনার অনুমান যদি সত্য হইত, তবে "কমলাকান্তের নিকট শুনিয়া বা তাঁহার উপদেশে শিবরাম বলিতেছেন"—এইরূপ ভণিতা পুথির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহা যখন নাই, এবং পুথি সমাপ্ত হইবার পরে যখন শিবরামের নাম রহিয়াছে, তখন তাঁহাকে এই পুথিখানির লেখক অর্থাৎ লিপিকর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। পয়ার বা অন্যান্য ছন্দে পুথির শেষে লেখকের নাম লিখিবার রীতি অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে পুথির রচয়িতা বলা ঠিক নহে। পুথিখানিতে লিপিকাল উল্লিখিত হয় নাই;

সুতরাং ইহা কোন্ সনে লিখিত তাহা বলা যাইতে পারেনা। ইহার পত্রসংখ্যা ১—১৭ এবং ১৯—২২।

পত্রে আপনার সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে আমরা আপনাকে হয়ত চিনিতে পারিবনা। আপনি আমার বিশেষ পরিচিত। হরিপদবাবুও আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ।

বশংবদ

(স্বা) শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

১

মেড়তলা,
১৩২৮।৪ঠা ভাদ্র।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ।

নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনং,

মহাশয়ের পত্র পাইয়া আমি যেমন আনন্দিত হইলাম, আপনার কোন কাজে না লাগায় আমি তেমনি দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি অধ্যবসায়শালী, উদ্যোগী পুরুষ, ভগবৎ কৃপায় আপনার অভীষ্টসিদ্ধি অবশ্যই হইবে। কেবল আমি আপনার মহৎকার্য্যে কোনরূপে সহকারিতা করিয়া কিছুমাত্র কর্ত্তব্য পালন করিতে পরিলাম না, ইহাই দুঃখ।

রাজবাটীর প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলী পুস্তকখানি আমাদের বাড়ীতে ছিল, কিন্তু সে অতিবহুদিনের কথা, পুস্তকখানি জীর্ণশীর্ণ হইয়া লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইদানীন্তনকালে নানা পদকর্ত্তার সঙ্গীতসমূহের সহিত কমলাকান্তের কতক কতক পদসহ যে সকল সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে, তাহারও কয়েকখানি আমার ছিল। কিন্তু গত ৩ বৎসর আমি কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকায়, আমার ঐ পুস্তকগুলিও অলক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এসম্বন্ধে আমি কিছুই করিতে পারিলাম না।

নিজে আমি একটু সঙ্গীতপ্রিয় বলিয়া ঐ সকল পুস্তকে অপ্রকাশিত কমলাকান্তের ২।৪টী পদ আমার কণ্ঠস্থ আছে। প্রয়োজন হইলে তাহা আমি লিখিয়া পাঠাইব।

ভগবৎকৃপায় আপনার সাধু কার্য্যের উদ্যম সফল হউক। ইতি—

ভবদীয়

(স্বা) শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।

মেড়তলা। ১২ই ভাদ্র। ১৩২৮।

২

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনং,

মহাশয়ের পত্র পাইলাম। সাধক কমলাকান্ত জেলা বর্দ্ধমানের কাল্না অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ক্রমে রাজবাটীর সহিত পরিচয়ে বর্দ্ধমান রাজধানীর নিকট তাঁহার সাধনার স্থান হয়। আমার বয়স ৭০ বৎসর হইবে। আমি উক্ত প্রবাদই পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি। আমি পূর্ব্বস্থলীর স্বর্গীয় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের ছাত্র। বাল্যকাল হইতে তাঁহার নিকট অন্ততঃ ২০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছি। পূর্ব্বস্থলীর অবস্থা সে সূত্রে বিশেষ জানি। কমলাকান্তের পদাবলী কোন পণ্ডিতের নিকট ছিলনা, পণ্ডিত লোক সাধক না হইলে ঐ সকল বিষয়ে অনুরাগী হয় না। আমার জেঠামহাশয় উক্ত উভয়বিধগুণ সম্পন্ন ছিলেন, অধিকন্তু বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে সম্মানিত ছিলেন। তজ্জন্যই রাজবাটীর মুদ্রিত পদাবলীখানি তাঁহার নিকট ছিল। কিন্তু সে আমাদের বাল্যকালের কথা। তখনকার সে পুস্তকের অভ্যস্ত গানগুলি ভুলিয়া গিয়াছি। পুস্তকখানি থাকিলে সবই থাকিত। সেকালের লোক দেশের প্রচলিত আচার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম্মের অনুরাগী ছিল, দেশভক্ত ও গুণগ্রাহী ছিল। পরবর্ত্তী লোকে ইংরেজের প্রদত্ত শিক্ষায় আত্মমর্য্যাদা, দেশমর্য্যাদা হারাইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির

উপর হেয়বুদ্ধি সুদৃঢ় করিয়াছে। এখন একটু একটু করিয়া চক্ষু ফুটিতেছে, ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু যে সুযোগ হারাইয়া গিয়াছে, তাহার সম্যক্ উদ্ধারের আর উপায় কি? ইতি— (স্বা) শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।

মেড়তলা,

১৩৩১। ৭ই আশ্বিন।

৩

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং,

আপনার পত্র পাইয়া জানিলাম, আপনার ১০ বৎসর পরিশ্রমের "সাধক কমলাকান্ত" সম্প্রতি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ৺ পূজার আগেই ছাপান কাজ শেষ হইবে। উহাতে আমার একটী ভূমিকা শীঘ্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক। * * * আমাকে ভূমিকার জন্য কিছু পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান সাধক রামপ্রসাদের আবির্ভাব সময় ও পরবর্ত্তী সাধক কমলাকান্তের জন্মকাল, জন্মস্থান প্রভৃতিও আমার বিশ্বস্তসূত্রে সংগ্রহ নাই। সাধারণের প্রচারিত কমলাকান্ত সংগীত সংগ্রহও আমার নিকট যাহা ছিল, তাহা এক্ষণে নাই। ভূমিকা সমালোচনা না হইলেও তাহাতে সমালোচনার আভাস থাকে। এক্ষণে আপনি ঐ সকল বিষয়ে আমাকে একটু সাহায্য না করিলে আমি কি করিয়া ভূমিকা লিখিব? আমার নিকট যাহা কিছু সংগ্রহ ছিল, লোকের অত্যাচারে ও নিজের অনবধানে সমস্ত অন্তর্হিত হইয়াছে এখন আমাদের কর্ম্ম জীবনের অবসর সময় উপস্থিত। পূর্ব্বের উৎসাহ এখন দিন দিন অবসাদগ্রস্ত। বাটীতে ৺ পূজার বোধন আরব্ধ হওয়ায় মানসিক কিছু চঞ্চলতাও বটে।

সাধকের প্রেম-ভক্তি-দার্ঢ্য সহকৃত সাধনার কথা তাঁহাদের পদাবলীতে প্রকাশ পাওয়া যায়। তাহা একটু দেখাইয়া দেওয়াও তো আবশ্যক। কিন্তু কমলাকান্তের কোনরূপ পদাবলী আমার হাতে নাই। উপস্থিতমত যা-তা লিখিয়া কি আমি চিরকালের জন্য অপদস্থ হইয়া মরিব?

ব্যস্ততার সহিত দুকথা লিখিলাম বলিয়া তাহা রুক্ষতা মনে করিবেন না ও প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার অনাস্থাও বিবেচনা করিবেন না। কিন্তু আপনার উৎসাহানুরূপ আপনি সত্বর সাহায্য করিলেই আমি সত্বর উহা পাঠাইয়া দিতে পারিব। ইতি—

শুভানুধ্যায়িনঃ (স্বা) শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ ।

৪

মেড়তলা,
৩০ | ৯ | ২৪

সম্মানভাজনেষু,

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনম্। আপনার 'সাধক কমলাকান্ত' গ্রন্থের ফাইল কপি ২৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িয়া পরম আনন্দিত হইলাম। শতকাজ ত্যাগ করিয়া একবার উপর উপর চক্ষু বুলাইয়া লইলাম। ইহাতে আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ও তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলেন। দেখিয়া আপনার উপর আমার প্রকৃত সম্মানবুদ্ধি বাড়িয়া গেল। যাহা আলোচ্য তাহা আপনি আলোচনা করিয়াছেন, কিছুই বাদ যায় নাই। কাগজ, ছাপা সকলই সুন্দর হইতেছে। কিন্তু এমন সুন্দরের উপর একটী ত্রুটি, বর্ণাশুদ্ধি, বিষম ত্রুটি বলিয়া মনঃ পীড়া জন্মাইয়া দিল। * * * *। এমন সামান্য ত্রুটিও এমন সুন্দর পুস্তকে হওয়া উচিত ছিলনা। × × × বাঙ্গালা দেশে মহারাষ্ট্রের মত পণ্ডিত প্রুফ্‌রিডার পাওয়া যায় না, সুতরাং ও আফ্‌শোষ ঘুচাইবার উপায় নাই।

সে যাহাহউক; আপনি কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' পুথী খানি উদ্ধার করিয়া যে কি উপকার করিয়াছেন, একমুখে আমি তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিনা। ইহাতে আপনার অতুল কীর্ত্তি চির দেদীপ্যমান থাকিবে। ইতি—

(স্বা) শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।

৫৩। ৪, গ্রে ষ্ট্রীট্।
৫ কলিকাতা।
১০। ১২। ২৪

পরমস্নেহাস্পদেষু,—

শুভাশিষঃ সন্তু। প্রিয় অতুলচন্দ্র, তুমি আপনিতে কিছু নাই। তথাপি লিখিয়াছ, তাই আপনির স্থানে তুমিই করিলাম। ২৪১ পৃঃ হইতে ২৭১ পৃষ্ঠান্বিত মুদ্রিত ফর্ম্মা সহ পত্র প্রাপ্ত হইলাম। এরূপ ছাড়পড়া আশ্চর্য্য। জগদম্বা যাহা হয় সঙ্গত করিয়া দিবেন। ছাপা অনেক দূর হইয়াছে, আর চিন্তার কারণ নাই। * * * * পত্র লিখিতে বসিয়া সকলের আগে আমি তোমার সদানন্দ সদাশিবের কথা লিখিতে ব্যস্তসমস্ত হইতেছিলাম। এমন চির-তরুণ, আনন্দের উচ্ছ্বসিত সমুদ্র, প্রসন্নতার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি আর আমি কখনও দেখি নাই। আমার পুত্রসহ আমি ঐ পুণ্য মূর্ত্তি দেখিয়া অধীর হইলাম। হাঁ, ইহা সার্থক। তুমি বিজয়ী হও, তোমার শ্রম সার্থক হউক।

আমাদের আর কর্ম্মশক্তি নাই, কেবল বচন-বাগীশ হইয়াছি। এইরূপ বাগ্‌জালে কোন ফল থাক্ আর নাই থাক্ তথাপি বলি, এইরূপ সৎকার্য্যের উদ্যম মনে যখন যাহা হইবে তখন তাহাতেই হাত দিবে। সৎকার্য্যের চিন্তাও ভাল। অনুধ্যান আর কার্য্যে বড় তফাৎ নাই। অনুধ্যান ইহজন্মে নিতান্ত কার্য্যে পরিণত না হয়, পরজন্মে হইয়া থাকে। * * *

* * * * * * *

ইতি। ১২ই বৃহস্পতিবার।

শুভানুধ্যায়িনঃ

(স্বা) শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।

১ম পত্র।

শ্রীমৎ কমলাকান্ত মহাশয় যখন গ্রাম হইতে উঠিয়া প্রথমে তালিত গ্রামে পরে তালিতগড়স্থানে + শেষ বর্দ্ধমানের মধ্যে কোটালহাট গ্রামে শেষ কান্তপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র আসন করেন। তৎকালে তিনি সমস্ত নাথ। * কাগজপত্র সঙ্গে লয়ে যান,—যাহা ছিল তাহা আমার জেঠা মহাশয় লইয়া গিয়া সাল্‌কে গঙ্গার ঘাটে আশ্রম করেন। পরে তাঁহার দেহান্তের পর আর কিছু পাওয়া গেল না। সঙ্গে যে সমস্ত লয়ে গিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার হঠাৎ সমাধির পর পরহস্তগত হইয়া যায়, কতক বর্দ্ধমানাধিপতি সংগ্রহ করেন। তাঁহার ছাপা বহি আমার জেঠা মহাশয় রাখিয়াছিলেন—আমাদের তখন জন্মই হয় নাই, সে বহুদিনের কথা। তাহার পর যাহা ছিল তাহাও অগ্নিগত হইয়া গিয়াছে। আর যাহা কিছু যদি থাকে তাহা সাধন প্রক্রিয়া শ্রুতিমুখে। ** দেশে না গেলে সে সব তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দিতে অক্ষম। *** আজ তাঁহার সে সমস্ত অমূল্য কাগজপত্র না পাওয়াতেই আমাদের সাধনের পথ এত জটিল হইয়া গিয়াছে (আজ আমরা যেন পথের ভিখারী হইয়া ঘুরিতেছি)। ***। ৺ কাশীধাম। ৭ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।

+ বর্দ্ধমানাধিপতি বর্গীদের হাঙ্গামার সময় তালিতগ্রামের দক্ষিণে(বর্ত্তমান নবাবহাট) ১০৮ শিব মন্দিরের নিকট তালিতগড় বা মহবৎগড় স্থাপন করেন। ইহা বর্দ্ধমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

* আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মজুমদার মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় পাই। ইনি সাধকের প্রদৌহিত্র। ডাকবিভাগে চাকরী করিয়া বর্ত্তমানে ৺কাশীধামে ২২নং মুন্সীঘাটে বাস করিতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐস্থানে মায়ের একখানি অতি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—ঐ মূর্ত্তিতে শ্যাম ও শ্যামাভাব পরিস্ফুট। গ্রন্থকর্ত্রী।

২য় পত্র।

মহাত্মা কমলাকান্তের আদিবাস অম্বিকা গ্রামে নাম মাত্র ছিল। জন্ম চান্না গ্রামেই হয় তবে কিন্তু তথা হইতে উঠিয়া আমাদের গ্রামে আসেন। পঞ্চকোট (পঞ্চকুলা ?) হইতে ৫টী সন্ন্যাসী আসিয়া পঞ্চ-মুণ্ডির আসন স্থাপন করেন। ঐসময় কমলাকান্ত তাঁহাদের কৃপায় আসনাদি ও শিষ্য পান। কয়েক বৎসর পরে নানা বিড়ম্বনায় তিনি চান্না মোকাম যান, তথায়ও সুবিধা না হওয়ায় তালিত গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালী স্থাপন করিয়া সাধনা করেন। তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়া গ্রামচক্রে ঐস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি তালিত গড় স্থানে আসন করেন। তথায়ও তাঁহার সুবিধা না হওয়ায় শেষ আসন বর্দ্ধমানে কোটালহাট মোকামে আসন করেন। ঐ সময় বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সাধনার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। যে সময়ে তাঁহার সমাধি হয় সেই সময়ে আমার জন্ম হয়। একথা আমার পিতার কাছে এক সময়ে শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সমাধি অবস্থার শেষ বাণী ছিল যে এই বংশের মধ্যে পরবর্ত্তী সাধক যেন কাশীধামে আমার স্মরণ চিহ্ন আসন ও মাকে স্থাপন করতঃ আমার স্বরূপ সমাধি লাভ করে। এই বাণী বশতঃ এখানে আমাকে বসিতে হইয়াছে। তাঁহার সমাধি কাশীধামে হইয়াছিল ; কিন্তু মায়ের অভিপ্রায় না হওয়ায় তৎসময়ে কোটাল-হাটে হঠাৎ সমাধি হওয়ায় নিকটে কেহ আমাদের লোক ছিল না। এ কারণে কোন কাগজ পত্র পাই নাই। তবে মহারাজা বাহাদুর অনেকটা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে,—বাকী কাগজ শিষ্যগণ স্থানান্তরে লইয়া যায়।

৺কাশীধাম।

১২ই ফাল্গুন. ১৩৩০ সন।

বগলা দেবী, বগলবাস্তে,
নিত্য চিত্তে তোষিণী ;
ভোগি-প্রহরণী, ভোগবিহারিণী,
ভোগমোক্ষদায়িনী।
মধুর মন্থ, পানে মগন
সঘন মন মাতঙ্গিনী ;
মিলিয়াছে ভাল, যেমন পাগল,
তেমনি ওই পাগলিনী।
কমলাত্মিকা, কমলবরণী,
কমল-আসনবাসিনী ;
কমলাকান্তে, ভকত শান্তে,
দাও মা চরণ দু' খানি। ২৭৭

অপ্রকাশিত পদাবলী

বাহার—আড়া।

তারা তব অগোচরে, নাহি কিছু চরাচরে।
কুকর্ম্ম-সুকর্ম্ম-জীবে, কে তোমায় লুকাতে পারে।
কর্ম্মক্ষেত্রে লয়ে' জন্ম, করেছি কত কুকর্ম্ম,
না ভজিলাম কালী-ব্রহ্ম, পারে যাব কি ব্যাপারে।
নিতান্ত পাপের দেহ, ত্রাণ পাওয়া সুসন্দেহ,
মা যদি করিয়ে স্নেহ, তারো কমলাকান্তেরে। ২৭৮ *

---

* পূজ্যপাদ গুরুদেব ভূমিকা-লেখক শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিগত ১৯শে আষাঢ় (১৩৩২ সাল) আমাকে এই গানটী লিখিয়া দিয়াছেন।
গ্রন্থকার।